BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত ৪ বছর মেয়াদি
প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের **৪র্থ পর্ব ঃ** ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, ফুড, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, টেলিকমিউনিকেশনস্, মেরিন, সার্ভেয়িং, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজি; **৫ম পর্ব ঃ** গ্লাস, এরোস্পেস, এভিওনিক্স, আইপিসিটি, মেকাট্রনিক্স ও **ষষ্ঠ পর্ব ঃ** কম্পিউটার, পাওয়ার, কম্পিউটার সাইন্স, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এবং টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সহায়ক পুস্তক হিসাবে গ্রণীত

# বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন

# Business Organization & Communication

**Subject Code : 5841**

[অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর এবং রচনামূলক প্রশ্নাবলিসহ]


## রচনায়

**ড. মোঃ আলতাফ হোসেন**

অধ্যক্ষ, কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ, গাজীপুর
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেসা ইসলামিক মহিলা কলেজ, ঢাকা
উপাধ্যক্ষ, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, লক্ষীবাজার ঢাকা
**পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রণীত বইসমূহ ঃ**
এন্টারপ্রেনিওরশিপ, বিজনেস অর্গানাইজেশন, বিজনেস কমিউনিকেশন
বুককিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-২
**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বইসমূহ ঃ**
উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)-প্রথম পত্র
উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (ব্যাংকিং ও বীমা)-দ্বিতীয় পত্র
এ ছাড়া, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বি.কম (পাস ও অনার্স) কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা
**পরীক্ষক ঃ** ঢাকা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

## সহযোগিতায়

**নঈমুল হাসান**

বি.কম. (অনার্স), এম.কম. (ম্যানেজমেন্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)
বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল



হক পাবলিকেশনস্
HAQUE PUBLICATIONS
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

**প্রকাশক ঃ হক পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে**
**হাজী জাহানারা হক**
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৮০৩৭০

[প্রকাশক কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত]

**প্রথম প্রকাশ** ঃ ১ অক্টোবর ১৯৯৬
**পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ ঃ**
**একাদশ প্রকাশ** ঃ ১ আগস্ট ২০১৫

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ** মোঃ আশরাফুল হক আলো

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ** ইঞ্জিঃ মোঃ হামিদুল হক মামুন

**বর্ণবিন্যাসে** ঃ **জি. মাওলা কম্পিউটার**

**মুদ্রণে** ঃ **জি. মাওলা প্রিন্টিং প্রেস**
৩৪ শ্রীস দাস লেন, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

**মূল্য (MRP) ঃ ১৮০.০০ টাকা মাত্র**
[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক গৃহীত]

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়লার, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে কিছু করতে হলে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা আবশ্যক। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণ যাতে স্ব-উদ্যোগে কিছু করতে পারে তার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রত্যেক টেকনোলজিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের সাথে এনটারপ্রেনিওরশিপ, বিজনেস কমিউনিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এর এ উদ্যোগকে সফল করার জন্য বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন পুস্তকটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমাদের প্রণীত অন্যান্য পুস্তকগুলো প্রশংসিত হওয়ায় এ পুস্তকটিকে আরও উন্নত মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।

পুস্তকটিতে সিলেবাসে বর্ণিত General objective অনুযায়ী অধ্যায়গুলো সাজিয়েছি। প্রত্যেক General objective-এর অধীনে প্রাপ্ত Subjectic objective-সমূহের বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা ছাড়াও প্রয়োজনে অতিরিক্ত Objective সংযোজন করেছি। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর এবং রচনামূলক প্রশ্নাবলি সংযোজন করেছি।

শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য করার মানসে পুস্তকটি চলিত ভাষায় প্রণয়নের চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীদের আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক করার জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ করেছি। আশা করি পুস্তকটি পাঠে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন।

পুস্তকটি প্রণয়নে যে সকল দেশি-বিদেশি বয়ের সহযোগিতা নিয়েছি– তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পুস্তকটি প্রণয়নে ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল) আলহাজ মো ঃ নুরুল হক সাহেবের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তকটিতে মুদ্রণজনিত ভুলত্রুটি থাকতে পারে, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। পুস্তকটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও মান উন্নয়নে আপনাদের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সবেশেষে বলতে চাই, পুস্তকটি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সামান্য কাজে লাগে তবেই আমার শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে

ড. মোঃ আলতাফ হোসেন

# উৎসর্গ

আমার স্নেহময়ী মা ও বাবাকে

— লেখক

সিলেবাস

# Business Organization & Communication

**Subject Code : 5841**

| T | P | C |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |

## AIMS

- To be able to understand the basic concepts and principles of business organization.
- To be able to understand the banking system.
- To be able to understand the trade system and stock exchange activities in Bangladesh.
- To be able to understand the basic concepts of communication and its types, methods.
- To be able to perform in writing , application for job, complain letter & tender notice.

## SHORT DESCRIPTION

Principles and objects of business organization; Formation of business organization; Banking system and its operation; Negotiable instrument; Stock Exchange; Home trade and foreign trade. Basic concepts of communication Communication model& feedback; Types of communication; Methods of communication; Formal & informal communication; Essentials of communication; Report writing; Office management; Communication through correspondence; Official and semi-official letters.

## DETAIL DESCRIPTION

1. **Understand business organization.**
   - 1.1 Define business.
   - 1.2 Mention the objects of business.
   - 1.3 Define business organization.
   - 1.4 State the function of business organization.
2. **Understand the formation of business organization.**
   - 2.1 Define sole proprietorship, partnership, joint stock company and co-operative.
   - 2.2 Describe the formation of sole proprietorship, partnership , joint stock company & co-operative.
   - 2.3 Mention the advantages and disadvantages of proprietorship, partnership and joint stock company.
   - 2.4 State the principles of co-operative & various types of co-operative.
   - 2.5 Discuss the role of co-operative society in Bangladesh.
3. **Understand the banking system and negotiable instrument.**
   - 3.1 Define bank.
   - 3.2 State the service rendered by bank.
   - 3.3 Describe the classification of bank in Bangladesh.
   - 3.4 State the functions of Bangladesh Bank in controlling money market.
   - 3.5 State the functions of commercial Bank in Bangladesh.
   - 3.6 Mention different types of account operated in a bank.
   - 3.7 Mention how different types of bank accounts are opened and operated.
   - 3.8 Define negotiable instrument.
   - 3.9 Discuss various types of negotiable instrument.
   - 3.10 Describe different types of cheque.
   - 3.11 Define letter of credit.
4. **Understand the home & foreign trade.**
   - 4.1 Define home trade & foreign trade.
   - 4.2 Describe types of home trade.
   - 4.3 Differentiate between whole sale trade and retail trade.

4.4 Define foreign trade.
4.5 Mention the advantages and disadvantages of foreign trade.
4.6 Mention the classification of foreign trade.
4.7 Discuss the import procedure & exporting procedure.
4.8 Discuss the importance of foreign trade in the economy of Bangladesh.

**5. Understand the basic concepts of communication.**
5.1 Define communication & business communication.
5.2 Describe the scope of business communication.
5.3 State the objectives of business communication.
5.4 Discuss the essential elements of communication process.

**6. Understand the communication model and feedback.**
6.1 Define communication model.
6.2 State the business functions of communication model.
6.3 Define feedback .
6.4 State the basic principles of effective feedback.
6.5 Explain the essential feedback to complete communication process.

**7. Understand the types of communication.**
7.1 Explain the different types of communication.
7.2 Distinguish between upward and downward communication.
7.3 Define two-way communication.
7.4 Describe the advantages and disadvantages of two-way communication.
7.5 Define formal & informal communication.
7.6 Describe the advantages and disadvantages of formal & informal communication.
7.7 Distinguish between formal and informal communication.

**8. Understand the methods of communication.**
8.1 Define communication method.
8.2 Discuss the various methods of communication.
8.3 Describe the advantages and disadvantages of oral communication.
8.4 Describe the advantages and disadvantages of written communication.
8.5 Distinguish between oral and written communication.

**9 .Understand the essentials of communication.**
9.1 Discuss the essential feature of good communication.
9.2 Describe the barriers of communication.
9.3 Discuss the means for overcoming barriers to good communication.

**10. Understand the report writing.**
10.1 Define report , business report & technical report.
10.2 State the essential qualities of a good report.
10.3 Describe the factors to be considered while drafting a report.
10.4 Explain the components of a technical report.
10.5 Distinguish between a technical report and general report.
10.6 Prepare a technical report.

**11. Understand the office management.**
11.1 Define office and office work.
11.2 State the characteristics of office work.
11.3 Define filing and indexing.
11.4 Discuss the methods of filing.
11.5 Discuss the methods of indexing.
11.6 Distinguish between filing and indexing.

**12. Understand the official and semi-official letters.**
12.1 State the types of correspondence.
12.2 State the different parts of a commercial letter.
12.3 Define official letter and semi-official letter.
12.4 Distinguish between official letter and semi-official letters.
12.5 Prepare the following letters: Interview letter, appointment letter, joining letter and application for recruitment. Complain letters, tender notice.

# সূচিপত্র

## অধ্যায়-১ ঃ কারবার সংগঠন


| | | |
|---|---|---|
| ১.০ | সূচনা | ১৩ |
| ১.১ | কারবারের সংজ্ঞা | ১৩ |
| ১.১.১ | কারবারের বৈশিষ্ট্য | ১৪ |
| ১.১.২ | কারবারের মৌলিক উপাদান | ১৫ |
| ১.২ | কারবারের উদ্দেশ্যাবলি | ১৬ |
| ১.২.১ | কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা | ১৮ |
| ১.৩ | কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা | ১৯ |
| ১.৩.১ | কারবার সংগঠনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা | ১৯ |
| ১.৪ | কারবার সংগঠনের কার্যাবলি | ২০ |

অনুশীলনী-১

- অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২১
- সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২৩
- রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ২৬


## অধ্যায়-২ ঃ কারবার সংগঠনের গঠন পদ্ধতি


| | | |
|---|---|---|
| ২.০ | সূচনা | ২৭ |
| ২.১ | এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের বর্ণনা | ২৭ |
| ২.১.১ | এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য | ২৮ |
| ২.১.২ | অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা | ২৮ |
| ২.১.৩ | অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য | ২৯ |
| ২.১.৪ | যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা | ৩০ |
| ২.১.৪.১ | যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য | ৩০ |
| ২.১.৫ | সমবায় সংগঠনের সংজ্ঞা | ৩১ |
| ২.১.৬ | সমবায়ের বৈশিষ্ট্য | ৩২ |
| ২.২ | এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের গঠনপ্রণালি | ৩২ |
| ২.২.১ | এক মালিকানা কারবারের গঠনপ্রণালি | ৩২ |
| ২.২.২ | অংশীদারি কারবারের গঠন প্রণালি | ৩৩ |
| ২.২.৩ | অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন | ৩৩ |
| ২.২.৪ | যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠনপ্রণালি | ৩৪ |
| ২.২.৪.১ | যৌথ মূলধনী কারবারের শ্রেণিবিভাগ | ৩৬ |
| ২.২.৫ | যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি | ৩৭ |
| ২.২.৬ | সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বা ধারাসমূহ | ৩৭ |
| ২.২.৭ | কোম্পানির সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি | ৩৮ |
| ২.২.৮ | সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির উদ্দেশ্য | ৩৮ |
| ২.২.৯ | পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু | ৩৯ |

২.২.১০ বিবরণপত্র কী ..... ৩৯
২.২.১০.১ বিবরণপত্রের উদ্দেশ্য ..... ৪০
২.২.১১ সংঘ স্মারক বা স্মারকলিপি ও সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে পার্থক্য ..... ৪০
২.২.১২ সমবায় সমিতির গঠনপ্রণালি ..... ৪১
২.৩ এক মালিকানা, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ ..... ৪২
২.৩.১ এক মালিকানা কারবারের সুবিধা ..... ৪২
২.৩.২ এক মালিকানা কারবারের অসুবিধা ..... ৪৩
২.৩.৩ অংশীদারি কারবারের সুবিধা ..... ৪৪
২.৩.৪ অংশীদারি কারবারের অসুবিধা ..... ৪৫
২.৩.৫ যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ..... ৪৬
২.৩.৬ যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা ..... ৪৭
২.৪ সমবায় সমিতির মূলনীতি ..... ৪৭
২.৫ বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা ..... ৪৮
২.৫.১ উৎপাদক সমবায় সমিতি ..... ৪৯
২.৫.২ বাংলাদেশে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা ..... ৪৯
২.৫.৩ ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি ..... ৫০
২.৫.৪ বাংলাদেশে ভোক্তা সমবায় সমিতির ভূমিকা ..... ৫১

অনুশীলনী-২

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ৫১
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ৫৫
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ৬১

## অধ্যায়-৩ ঃ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও হস্তান্তরযোগ্য দলিল

৩.০ সূচনা ..... ৬৩
৩.১ ব্যাংকের সংজ্ঞা ..... ৬৩
৩.২ ব্যাংক প্রদত্ত সেবাসমূহ ..... ৬৪
৩.৩ বাংলাদেশে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ ..... ৬৫
৩.৪ মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি ..... ৬৭
৩.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের কার্যাবলি ..... ৬৮
৩.৫.১ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ..... ৬৯
৩.৫.২ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ..... ৭০
৩.৫.৩ জনতা ব্যাংক লিমিটেড ..... ৭১
৩.৫.৪ রূপালী ব্যাংক লিঃ ..... ৭২
৩.৫.৫ উত্তরা ব্যাংক লিঃ ..... ৭২
৩.৫.৬ পূবালী ব্যাংক লিঃ ..... ৭২
৩.৫.৭ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ..... ৭৩
৩.৫.৮ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ..... ৭৩
৩.৫.৯ গ্রামীণ ব্যাংক ..... ৭৪
৩.৬ ব্যাংক হিসাব ..... ৭৫
৩.৬.১ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার হিসাব ..... ৭৫
৩.৭ বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা পদ্ধতি ..... ৭৬
৩.৭.১ চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি ..... ৭৭

৩.৭.২ ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়ার পদ্ধতি ..... ৭৮
৩.৭.৩ ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের নিয়ম বা পদ্ধতি ..... ৭৯
৩.৮ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বর্ণনা ..... ৮০
৩.৮.১ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... ৮০
৩.৯ বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল ..... ৮১
৩.১০ বিভিন্ন প্রকার চেক ..... ৮২
৩.১১ প্রত্যয়পত্র ..... ৮৪
৩.১১.১ প্রত্যয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ..... ৮৪

অনুশীলনী-৩

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ৮৫
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ৮৮
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ৯৩


## অধ্যায়-৪ ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য


৪.০ ভূমিকা ..... ৯৫
৪.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা ..... ৯৫
৪.১.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ..... ৯৫
৪.১.২ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ..... ৯৬
৪.২ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকারভেদ ..... ৯৬
৪.৩ পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য ..... ৯৭
৪.৩.১ পাইকারি ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা ..... ৯৮
৪.৪ বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ..... ৯৮
৪.৪.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পার্থক্য ..... ৯৯
৪.৫ বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ..... ৯৯
৪.৬ বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণিবিভাগ ..... ১০২
৪.৭ পণ্য আমদানি ও পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি ..... ১০৩
৪.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ..... ১০৭
৪.৮.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় ..... ১০৭

অনুশীলনী-৪

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১০৮
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১১০
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১১৪


## অধ্যায়-৫ ঃ যোগাযোগের মৌলিক ধারণা


৫.০ সূচনা ..... ১১৫
৫.১ যোগাযোগ ও কারবার যোগাযোগের সংজ্ঞা ..... ১১৫
৫.২ কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের পরিধি বা আওতা বা কার্যাবলি ..... ১১৬
৫.৩ ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি বা প্রয়োজনীয়তা ..... ১১৮
৫.৪ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানসমূহ ..... ১২০

অনুশীলনী-৫

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১২২
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১২৩
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১২৫

## অধ্যায়-৬ ঃ যোগাযোগ মডেল ও ফলাবর্তন


৬.০ সূচনা ..... ১২৬
৬.১ যোগাযোগ মডেলের সংজ্ঞা ..... ১২৬
৬.২ যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কার্যাবলি ..... ১২৬
৬.৩ ফলাবর্তনের সংজ্ঞা ..... ১২৭
৬.৪ কার্যকর ফলাবর্তনের নীতিমালা ..... ১২৮
৬.৫ সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন কি অপরিহার্য ..... ১২৯


**অনুশীলনী-৬**


▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৩০
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৩১
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১৩২


## অধ্যায়-৭ ঃ যোগাযোগের প্রকারভেদ


৭.০ সূচনা ..... ১৩৩
৭.১ যোগাযোগের প্রকারভেদ ..... ১৩৩
৭.২ ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ ও নিম্নগামী যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য ..... ১৩৬
৭.৩ 'দ্বি-মুখী যোগাযোগ'-এর অর্থ ও সংজ্ঞা ..... ১৩৬
৭.৪ দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ..... ১৩৭
৭.৪.১ সুবিধাসমূহ ..... ১৩৭
৭.৪.২ অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ ..... ১৩৮
৭.৫ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ..... ১৩৯
৭.৫.১ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ..... ১৩৯
৭.৫.২ অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ..... ১৪০
৭.৬ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ..... ১৪০
৭.৬.১ অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ ..... ১৪০
৭.৬.২ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ ..... ১৪১
৭.৬.৩ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ ..... ১৪১
৭.৬.৪ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ ..... ১৪২
৭.৭ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পার্থক্য ..... ১৪২


**অনুশীলনী-৭**


▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৪৪
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৪৬
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১৫০


## অধ্যায়-৮ ঃ যোগাযোগ পদ্ধতি


৮.০ সূচনা ..... ১৫১
৮.১ যোগাযোগ পদ্ধতির সংজ্ঞা ..... ১৫১
৮.২ বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতি ..... ১৫১
৮.৩ মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ..... ১৫৩
৮.৩.১ সুবিধাসমূহ ..... ১৫৩
৮.৩.২ মৌখিক যোগাযোগের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ ..... ১৫৫
৮.৪ লিখিত যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ..... ১৫৬

৮.৪.১ সুবিধাসমূহ ..... ১৫৬
৮.৪.২ লিখিত যোগাযোগের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ ..... ১৫৮
৮.৫ মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য ..... ১৫৯
৮.৫.১ মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে কখন কোন্‌টি অধিক গ্রহণযোগ্য? ..... ১৬১

অনুশীলনী-৮

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৬২
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৬৪
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১৬৬

## অধ্যায়-৯ ঃ যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি

৯.০ সূচনা ..... ১৬৭
৯.১ উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি ..... ১৬৭
৯.২ যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ..... ১৬৮
৯.৩ উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ..... ১৭৩

অনুশীলনী-৯

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৭৪
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৭৫
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১৭৮

## অধ্যায়-১০ ঃ প্রতিবেদন লিখন

১০.০ সূচনা ..... ১৭৯
১০.১ প্রতিবেদন, কারবার প্রতিবেদন ও কারিগরি প্রতিবেদনের সংজ্ঞা ..... ১৭৯
১০.২ উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি ..... ১৮০
১০.৩ প্রতিবেদন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ ..... ১৮১
১০.৪ কারিগরি প্রতিবেদনের প্রধান অংশসমূহ ..... ১৮২
১০.৪.১ একটি নমুনা প্রতিবেদনের উপাদানসমূহ ..... ১৮৪
১০.৫ কারিগরি প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্য ..... ১৮৫
১০.৬ কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ..... ১৮৬

অনুশীলনী-১০

▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৮৭
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ১৮৮
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ১৯২

## অধ্যায়-১১ ঃ অফিস ব্যবস্থাপনা

১১.০ সূচনা ..... ১৯৩
১১.১ অফিস ও অফিস কার্যের সংজ্ঞা ..... ১৯৩
১১.১.১ অফিস কার্যের প্রকৃতি ..... ১৯৪
১১.২ অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্য ..... ১৯৪
১১.২.১ আধুনিক অফিসের কার্যাবলি ..... ১৯৫
১১.৩ নথিবদ্ধকরণ ও সূচিকরণের সংজ্ঞা ..... ১৯৭

১১.৩.১ নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব ..... ১৯৮
১১.৪ নথিকরণের পদ্ধতি ..... ১৯৯
১১.৫ সূচিকরণ পদ্ধতি ..... ২০০
১১.৬ নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে পার্থক্য ..... ২০১
অনুশীলনী-১১
▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২০২
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২০৩
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ২০৪

## অধ্যায়-১২ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

১২.০ সূচনা ..... ২০৫
১২.১ পত্র যোগাযোগের প্রকারভেদ ..... ২০৫
১২.২ বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশ ..... ২০৬
১২.২.১ বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি ..... ২০৮
১২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের সংজ্ঞা ..... ২১৩
১২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য ..... ২১৩
১২.৫ সাক্ষাৎকার, নিয়োগ, চাকরিতে যোগদান ও চাকরির জন্য আবেদন পত্র, অভিযোগ পত্র এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ..... ২১৪
১২.৫.১ সাক্ষাৎকার পত্র কাকে বলে ..... ২১৪
১২.৫.২ সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্য ..... ২১৫
১২.৫.৩ সাক্ষাৎকার পত্রের কতিপয় নমুনা ..... ২১৫
১২.৫.৪ নিয়োগপত্র কী ..... ২১৬
১২.৫.৫ নিয়োগপত্রের বিষয়বস্তু ..... ২১৭
১২.৫.৬ নিয়োগপত্রের বিবেচ্য বিষয় ..... ২১৭
১২.৫.৭ নিয়োগপত্রের কয়েকটি নমুনা ..... ২১৮
১২.৫.৮ চাকরিতে যোগদান পত্র বলতে কী বুঝায় ..... ২২১
১২.৫.৯ চাকরিতে যোগদান পত্রের প্রয়োজনীয়তা ..... ২২১
১২.৫.১০ চাকরিতে যোগদান পত্রের কতিপয় নমুনা ..... ২২১
১২.৫.১১ চাকরির জন্য আবেদনপত্র ..... ২২৩
১২.৫.১২ চাকরির আবেদনপত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ..... ২২৩
১২.৫.১৩ চাকরির আবেদনপত্রের কতিপয় নমুনা ..... ২২৪
১২.৫.১৩ অভিযোগ পত্রের কতিপয় নমুনা ..... ২২৭
১২.৫.১৪ টেন্ডার বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির নমুনা ..... ২২৯
অনুশীলনী-১২
▸▸ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২৩০
▸▸ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ..... ২৩২
▸▸ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ..... ২৩৫
✪ সুপার সাজেশনস্ ..... ২৩৭
বাকাশিবো প্রশ্নাবলি ..... ২৫৯ – ২৮৮

# অধ্যায়-১

# কারবার সংগঠন
# (Business Organization)



*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*১.০ সূচনা; ১.১ কারবারের সংজ্ঞা; ১.২ কারবারের উদ্দেশ্যাবলি; ১.৩ কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা; ১.৪ কারবার সংগঠনের কার্যাবলি*

## ১.০ সূচনা (Introduction) ঃ

মানুষ তার অভাবের তাড়নায় ও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। মানুষের এ সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপই কারবারের পর্যায়ভুক্ত। আমরা যদি আমাদের চারদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে দেখতে পাই যে, সমাজবাসী মানুষের মধ্যে কেউ কৃষিজীবী, কেউ শিল্পপতি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ মৎস্যজীবী, কেউ কুম্ভকার, কেউ তাঁতী, কেউ শিক্ষক, কেউ আইনবিদ, কেউ ডাক্তার এবং এ রকম আরও বহু পেশায় নিয়োজিত থেকে সবাই নিজ নিজ গণ্ডিতে স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে অর্থপার্জন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। আবার এটাও লক্ষ করা যায় যে, এই সমাজেরই কিছু কিছু লোক অবৈধ উপায়ে অর্থপার্জন করে তাদের চাহিদা মেটাচ্ছে; যেমন– কেউ চুরি করে, কেউ ডাকাতি করে, কেউ অন্যকে ঠকিয়ে, কেউ চোরাচালানী করে, আবার কেউবা কালোবাজারির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই বলে জীবিকার তাগিদে অর্থপ্রার্জনের নিমিত্তে মানুষের সকল কাজকেই কারবার বলা যাবে না। কেবল মানুষের বৈধ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপই কারবারের অন্তভুক্ত।

মূলত মানুষের অভাব বোধ ও অভাব পূরণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক কাজ কর্মের সূত্র হতেই কারবারের উৎপত্তি। তবে মানুষের সকল কার্য অভাবপ্রসূত হলেও কারবার বা সেবাকর্ম উৎপাদন করে এবং তা সমাজবাসী মানুষের নিকট সরবরাহ করে তাদের অভাব মোচন করে থাকে। সুতরাং, মানুষের অভাব পূরণের নিমিত্তে উৎপাদন, বণ্টন ও এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলি কারবারের আওতাভুক্ত। বর্তমানে কারবারের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত এবং সমাজবাসী মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

## ১.১ কারবারের সংজ্ঞা (Definition of Business) ঃ

সাধারণ অর্থে কারবার বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। কারবারের ইংরেজি শব্দ "Business" যার পুঁথিগত অর্থ হল 'কোন কাজে ব্যস্ত থাকা' (The state of being busily engaged in anything) । এ অর্থে কারবার বলতে মানুষের কোন কাজে ব্যস্ত থাকার ব্যবস্থাকে বুঝায়। কিন্তু কারবারের এ অর্থের মানে এই নয় যে, সব কাজে ব্যস্ত থাকলেই তাকে কারবারি বলা যাবে। কারণ কেউ হয়তো লেখাপড়া নিয়ে, কেউবা গানবাজনা নিয়ে অথবা কেউ খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু এসব কাজে ব্যস্ত থাকাকে কারবার বলা যায় না। কারবার হলো সেই কাজ, যার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জনের লক্ষে কারবারিকে ঝুঁকিও বহন করতে হয়। সুতরাং কারবার বলতে এমন কাজকে বুঝায় যার মধ্যে ঝুঁকি ও মুনাফা দুই-ই আছে।

প্রকৃতপক্ষে, কারবারের অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে কারবার হচ্ছে জীবিকা অর্জনের নিমিত্তে পণ্যদ্রব্য আহরণ থেকে শুরু করে তা ভোগ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা বা কার্যাবলি। মানুষ তার অভাব পূরণের জন্য ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করে তাই কারবার হিসেবে পরিগণিত হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, কারবার হচ্ছে নিম্নোক্ত তিন ধরণের কাজের সমষ্টি। কাজগুলো হল—

(ক) পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন;

(খ) পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন;

(গ) পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়ক অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য।

সুতরাং, বলা যায় যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকেই কারবার বলে।

বিভিন্ন মনীষী ও গ্রন্থকার কারবারের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে কতিপয় প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

**১। এল.এইচ. হ্যানি (L.H. Haney)**— এর মতে, "পণ্যসামগ্রী ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন অথবা সংগ্রহের জন্য মানুষের কার্যকলাপকে কারবার বলে।" (Business may be defined as human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling goods.)

**২। বি.বি. ঘোষ (B.B. Ghosh)**— বলেন, "পণ্যসামগ্রী উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত মানুষের যাবতীয় কার্যাবলিই হচ্ছে কারবার।" (Business denotes human activities which produce or acquire wealth through buying or selling goods.)

**৩। বি.ও. হুইলার (B. O. Wheeler)**— এর মতে, "লাভের অনুপ্রেরণায় সমাজে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম প্রদানের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালিত হয় তাই কারবার।" (Business is an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive or private gain.)

**৪। গ্লস ও বেকার (Gloss & Baker)**— এর মতে, "দেশের প্রয়োজনে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন অথবা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির একক বা যৌথ প্রচেষ্টাকে মূলত কারবার বলে।"

**৫। আর.এম. হজগেট্স (R. M Hodgetts)**– বলেন, "কারবার হল ব্যক্তির সংগঠিত প্রচেষ্টা যা মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে মানব সমাজকে পণ্য ও সেবাকর্ম সরবরাহ করে।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, কারবার হচ্ছে মানুষের ঐ সকল প্রচেষ্টা বা কার্যকলাপ যা পণ্যসামগ্রী সেবাকর্ম ও মতাদর্শ উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টনের সাথে জড়িত থেকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

## ১.১.১ কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Business) ঃ

অর্থপার্জনের উদ্দেশ্যে তথা জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে মানুষ বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সব ধরনের কার্যকলাপই কারবার নয়; কারবার হতে হলে তা কতিপয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। নিম্নে কারবারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হল ঃ

**১। মুনাফা অর্জন (Earning profit) ঃ** কারবারের প্রাথমিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মুনাফা অর্জন। কারবারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সাধিত হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কারবার পরিচালিত হতে পারে না।

**২। মূলধন সরবরাহ (Capital supply) ঃ** কারবারের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, কারবার করতে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করতে হয়। কারণ মূলধন ব্যতীত কারবার স্থাপন ও পরিচালনা করা তথা কারবারের অস্তিত্বই আশা করা যায় না।

**৩। পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন (Production of goods & services) ঃ** কারবার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে ভোক্তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে তাদের ব্যবহারপযোগী করে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে থাকে।

**৪। বণ্টন (Trade) ঃ** সকল প্রকার কারবারি লেনদেন মূল্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদির বণ্টনের সাথে সম্পৃক্ত। পণ্যদ্রব্যের বিনিময় বা বন্টনের সাথে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

**৫। ঝুঁকি বহন (Carring risk) ঃ** সকল প্রকার কারবারেরই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। কারবার করতে গেলে শুধু যে লাভ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, লোকসানের সম্ভাবনাও রয়েছে।

**৬। উপযোগ সৃষ্টি (Create utility) ঃ** কারবার উপযোগ সৃষ্টির বিনিময়ে মূল্য পেয়ে থাকে। এই উপযোগ স্বত্বাগত, আকৃতিগত, স্থানগত, কালগত, ঝুঁকিগত অর্থগত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

**৭। ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা (Continuity of purchase & sale) ঃ** ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা কারবারের শর্ত। কারবারি লেনদেনের বেলায় কোন নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ধারাবাহিকতা (Continuity) থাকতে হবে। হঠাৎ করে কোন একটি লেনদেন কারবার হিসেবে বিবেচ্য হবে না।

**৮। সেবামূলক মনোভাব (Service motive) ঃ** শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করলেই কারবার হয় না। প্রকৃত কারবারিকে অর্জনের সাথে সাথে দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি সেবার মনোভাবও থাকতে হবে।

**৯। মিতব্যয়িতা (Economy) ঃ** মিতব্যয়িতা কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়াসে কারবারির সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হয়।

১০। **পূর্বানুমান (Forecasting) ঃ** কারবারির ভবিষ্যৎ বাজারের পূর্বানুমানের সঠিকতার উপর মুনাফা অর্জনের সফলতা নির্ভর করে। তাই তাকে ক্রেতাদের প্রয়োজন, অভিরুচি, পছন্দ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বাজার সম্পর্কে অনুমান করে সেই অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, আহরণ ও মজুত করতে হয়।

১১। **আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্যতা (Financially measure) ঃ** অর্থের মাপকাঠিতে যা নিরূপণ করা যায় না তা কারবারের পর্যায়ভুক্ত নয়। মানুষের যে সমস্ত লেনদেন ও কর্মপ্রবাহ অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য তা কারবার হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং এটি কারবারের বৈশিষ্ট্য।

১২। **স্বাধীন কর্মপ্রবাহ (Independent work) ঃ** স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন সকল কারবারেরই একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারবারি ব্যক্তি অফিসের মত কারও নির্দেশে চলেন না। তিনি যা ভাল বুঝেন তাই করেন।

১৩। **গতিশীলতা (Speed) ঃ** সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে কারবারের কার্যাবলিও উত্তরোত্তর গতিশীল হচ্ছে। ফলে সম্ভব হচ্ছে নতুন নতুন পণ্য দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণ।

১৪। **উদ্যোগ (Entrepreneur) ঃ** এটি কারবারের একটি সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। কারবার গঠন করতে হলে সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোক্তা ছাড়া কোন কারবার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে না।

১৫। **সংগঠন (Organisation) ঃ** কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দক্ষ সংগঠন। এই সংগঠন উৎপাদনের তিনটি উপকরণ, যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একসূত্রে গ্রথিত করে কারবারের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কারবারকে মানুষের অন্যান্য কার্যাবলি থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা এনে দিয়েছে।

## ১.১.২ কারবারের মৌলিক উপাদান (Basic Elements of Business) ঃ

কারবারের আকৃতি ও প্রকৃতি যে রকমই থাকুক না কেন, কারবারের কতিপয় মৌলিক উপাদান রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| ১। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ | ৬। পণ্যদ্রব্য ও সেবা |
| ২। নির্দিষ্ট স্থান | ৭। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি |
| ৩। মূলধন | ৮। আর্থিক মূল্যে লেনদেন |
| ৪। শ্রমশক্তি | ৯। সহায়ক উপকরণ |
| ৫। সংগঠন | ১০। আইনগত বৈধতা। |

নিম্নে কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১। **প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (Organisational structure) ঃ** কারবারের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। কারবারের আয়তন যাই হোক না কেন এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থাকবে এবং তা এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনি, সমবায়, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি যে কোন প্রকার হতে পারে।

২। **নির্দিষ্ট স্থান (Particular place) ঃ** কারবারি কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে। এ স্থানটি কোন গৃহ বা উন্মুক্ত স্থান হতে পারে, যেখান থেকে অনায়াসে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।

৩। **মূলধন (Capital) ঃ** মূলধন ব্যবসায়ের একটি অন্যতম উপাদান। মূলধন ছাড়া কারবার কারবারি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অথবা প্রয়োজনবোধে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে।

৪। **শ্রমশক্তি (Manpower) ঃ** কারবারি কার্যকলাপ সম্পাদানের জন্য প্রয়োজন শ্রমশক্তি। শ্রমিক-কর্মীই কারবারের সকল স্তরে নিয়োজিত থেকে কারবার পরিচালিত করে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। শ্রমিক-কর্মীই কারবারের মূল শক্তি বিধায় কারবারের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে শ্রমশক্তিকে বিবেচনা করা হয়।

৫। **সংগঠন (Organisation) ঃ** যে কোন কারবারেই সংগঠন অপরিহার্য। সংগঠন ব্যতীত কারবার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। উৎপাদনের উপকরণ, যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলা হয়।

৬। **পণ্যদ্রব্য ও সেবা (Product & service) ঃ** পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বন্টনের উপর ভিত্তি করেই মূলত কারবারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুতরাং, পণ্যদ্রব্য ও সেবাকে কারবারের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭। **অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি (Uncertainity & risk) ঃ** অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি কারবারের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। কারবারিকে ভবিষ্যৎ অনুমানের উপর নির্ভরশীল হয়ে কার্যক্রম স্থির করতে হয়। অনুমান সঠিক হলে লাভের সম্ভাবনা থাকে, আর অনুমান সঠিক না হলে কারবারিকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়।

**৮। আর্থিক মূল্যে লেনদেন (Financial transaction) ঃ** কারবারের আর একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে প্রতিটি কারবারি লেনদেনই আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হতে হবে। যে সমস্ত লেনদেন ও কর্মপ্রবাহ অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণ করা যায় না, তা কারবারি লেনদেনের পর্যায়ভুক্ত নয়।

**৯। সহায়ক উপকরণ (Aiding elements) ঃ** কারবারি কার্যক্রমকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে গেলে কতিপয় সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হল– কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও কলকজা, অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বীমা ইত্যাদি।

**১০। আইনগত বৈধতা (Legal entity) ঃ** আইনগত বৈধতাও কারবারের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান। কারবার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যকলাপই আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে। আইনের চোখে অবৈধ কোন মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হলেও তাকে কারবার হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

উপরে আলোচিত উপাদানসমূহকে কারবারের মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং, এসব উপাদানের অনুপস্থিতিতে কারবার হতে পারে না।

## ১.২ কারবারের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Business) ঃ

অর্থ বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বণ্টন কার্যে মূলত কারবার নিয়োজিত থাকে। আধুনিক কারবার কেবল মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে আরও বহুবিধ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয়। কারবারের এ উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

(ক) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য।
(খ) সামাজিক উদ্দেশ্য।
(গ) মানবিক উদ্দেশ্য।
(ঘ) জাতীয় উদ্দেশ্য।

নিম্নোক্ত ছকে কারবারের এ সকল উদ্দেশ্যসমূহ সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরা হল ঃ

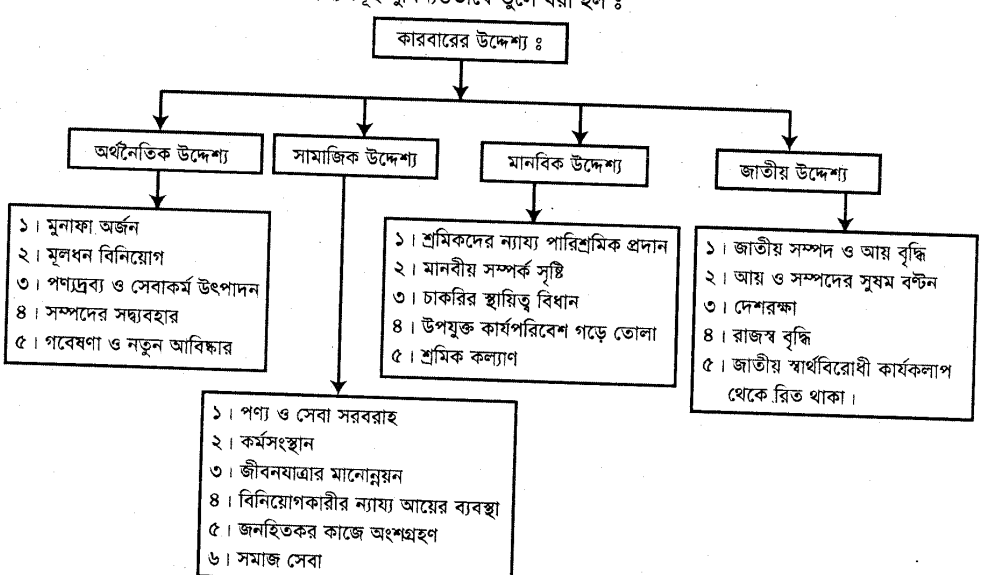




**(ক) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য (Economic objectives) ঃ** কারবারে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

**১। মুনাফা অর্জন (Earning profit) ঃ** কারবারের প্রাথমিক ও মূল্য উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। মুনাফার উদ্দেশ্যেই কারবারি তার মূলধন, শ্রম ও বুদ্ধি ব্যবসায়ে খাটায় এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে। এ মুনাফাই কারবারে উৎসাহ যোগায়।

**২। মূলধন বিনিয়োগ (Capital Investment) ঃ** মূলধন বিনিয়োগ কারবারের অন্যতম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। সঞ্চিত অর্থ মূলধন হিসেবে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

**৩। পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন (Producing goods & services) ঃ** মানুষের দৈহিক ও মানসিক সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত এবং কারবারির স্বীয় সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায় নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে থাকে।

**৪। সম্পদের সদ্ব্যবহার (Proper utilization of resources) ঃ** প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করে এদের রূপান্তর ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার উপযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্নমুখী অভাব পূরণ করাও কারবারের অন্যতম লক্ষ্য।

**৫। গবেষণা ও নতুন আবিষ্কার (Research & new invention) ঃ** গবেষণার দ্বারা ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

**(খ) সামাজিক উদ্দেশ্য (Social objectives) ঃ** শুধু মুনাফা অর্জনই কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কারবারের কতিপয় সামাজিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। কারবারের সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

**১। পণ্য ও সেবা সরবরাহ (Supply of goods & service) ঃ** সমাজের মানুষের নানাবিধ অভাব ও চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম সরবরাহ করা কারবারের মৌলিক সামাজিক উদ্দেশ্য।

**২। কর্মসংস্থান (Employment) ঃ** সমাজের লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ব্যবসায়ের একটি উদ্দেশ্য। কারবারি পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের বিভিন্ন ধাপে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

**৩। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Development of living standard) ঃ** সমাজে বসবাসরত মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের যোগান দিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলা কারবারের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য।

**৪। বিনিয়োগকারীদের ন্যায্য আয়ের ব্যবস্থা (Scope of actual income for investor) ঃ** বিনিয়োগকারী অর্থ বিনিয়োগ করে মূলত আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশায়। বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের উপর ন্যায্য হারে আয় প্রাপ্তির দিকে লক্ষ রাখা কারবারের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য।

**৫। জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ (Participate welfare activities) ঃ** সামাজিক বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর ও সাংস্কৃতির কার্য, যেমন– শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদিতে আর্থিক সহায়তা ও অংশগ্রহণ করা আধুনিক কারবারের উদ্দেশ্য।

**৬। সমাজ সেবা (Social services) ঃ** সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের জনগণের প্রভূত সেবা তথা সার্বিক কল্যাণ সাধন কারবারের উদ্দেশ্য।

**(গ) মানবিক উদ্দেশ্য (Human objectives) ঃ** কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

**১। শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান (Fair wages to employee) ঃ** উপযুক্ত মজুরি না পেলে একজন শ্রমিক ঠিকভাবে কাজ করবে না। তাই একজন কারবারীর একটি অন্যতম দায়িত্ব হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা। এটি কারবারের একটি মানবিক উদ্দেশ্য।

**২। মানবীয় সম্পর্ক সৃষ্টি (Create human relationship) ঃ** সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তে কারবারের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি কারবারের একটি উদ্দেশ্য।

**৩। চাকরির স্থায়িত্ব বিধান (Safety of the job) ঃ** কর্মীর চাকরির স্থায়িত্ব বিধানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় মনোবল উন্নত হয়। তাই চাকরির স্থায়িত্ব বিধানকে কারবারের একটি মানবিক উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

**৪। শ্রমিক কল্যাণ (Employec welfare) ঃ** শ্রমিক-কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ তথা স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবি ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

**৫। কার্যের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা (Sound environment of work) ঃ** কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ তথা কারবারি পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। এতে কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষা পায়।

**(ঘ) জাতীয় উদ্দেশ্য (National objective) ঃ** কারবারের স্বার্থ দেশের স্বার্থের সাথে জড়িত। কারবারিদের জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে তৎপর হতে হয় ঃ

**১। জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি (Develop national resources & income) ঃ** কারবারের একটি উদ্দেশ্য হল পণ্য দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি করে দেশের সার্বিক আয় বৃদ্ধি করা।

**২। আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন (Proper distribution of Income & resources) ঃ** কারবারি তার ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। অতএব বলা যায়, জাতীয় আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা কারবারের একটি জাতীয় উদ্দেশ্য।

৩। **দেশরক্ষা (To protect country) ঃ** কারবার সামরিক ও বেসামরিক পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত করে তোলে।

৪। **রাজস্ব বৃদ্ধি (Increasing revenue) ঃ** কারবার বিভিন্ন প্রকার শুল্ক ও কর প্রদানের মাধ্যমে সরকারি আয় তথা দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করে।

৫। **জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা (Work for national lnterest) ঃ** কারবারের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ, যেমন– কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, চোরাচালানী এবং দেশের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের মাধ্যমে কারবার ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে চলেছে।

## ১.২.১ কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Importance and Necessity of Business) ঃ

বর্তমান বিশ্বে কারবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা "মানব সভ্যতার সেতু বন্ধনস্বরূপ"। আধুনিক অর্থনীতিতে বাজারের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, বৃহদাকার উৎপাদন, মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি, ইত্যাদির কারণে কারবারের গুরুত্ব প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিম্নে কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে আলোচনা করা হল ঃ

১। **সম্পদের সদ্ব্যবহার (Proper ulilization of resources) ঃ** কারবার জনগণের অফুরন্ত অভাব পূরণের জন্য সম্পদ আহরণ করে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, মানুষের প্রয়োজন মেটে এবং তাদের জীবন প্রণালি সুন্দর ও সহজ হয়।

২। **পণ্যদ্রব্য ও সেবার যোগান (Supply of goods & services) ঃ** কারবার মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও সেবার যোগান দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুখময় করে তোলে।

৩। **পুঁজি গঠন (Capital formation) ঃ** কারবার ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এতে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশ ঘটে।

৪। **পুঁজি বিনিয়োগ (Capital lnvestment) ঃ** কারবার পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। সমাজের সঞ্চিত ও অলস অর্থ সংগ্রহ করে মূলধন হিসেবে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ কারবারের পক্ষেই সম্ভব। এতে জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

৫। **কর্মসংস্থান (Employment) ঃ** কারবার সম্প্রসারণের সাথে সাথে সমাজের বেকার লোকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মীদের ক্রয় ক্ষমতা ও পণ্যের চাহিদা বাড়ে যা অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে।

৬। **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Development living standard) ঃ** নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম সরবরাহ করে এবং মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে কারবার তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সাহায্য করে।

৭। **রাজস্ব বৃদ্ধি (Increasing revenue) ঃ** কারবারিদের কাছ থেকে সরকার বিভিন্ন প্রকার কর বাবদ প্রচুর রাজস্ব পেয়ে থাকে এবং এ অর্থ দিয়েই সরকার মানুষের জন্য বহুমুখী কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

৮। **গবেষণা ও নতুন আবিষ্কার (Research & new invention) ঃ** কারবার গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য ও সেবার উপকরণ তৈরি করে সমাজের কল্যাণ সাধন করছে এবং বিশ্ব সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধান করছে।

৯। **সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান (Exchange civilization & culture) ঃ** পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক গতিশীলতার ফলে এটি বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

১০। **শ্রমবিভাগের সুফল (Benifits of diversification of labour) ঃ** কারবার শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের পথ সুগম করেছে। যার ফলে কম সময়ে, কম ব্যয়ে, অধিক দক্ষতার সাথে প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন সহজ হচ্ছে। এতে পণ্যমূল্য কম পড়ছে এবং ভোক্তা বা কম দামে পণ্য ভোগ করতে পারছে।

১১। **যোগাযোগ ও পরিবহণের উন্নয়ন (Develop communication & transport) ঃ** কারবারের তথা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

১২। **জনবসতির বিকাশ (Development of civilization) ঃ** জনসংখ্যা বণ্টন ও জনবসতি বিস্তারে কারবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে জনগণও স্থানান্তরিত হয় এবং তাই গড়ে ওঠে নতুন জনবসতি।

**১৩। জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি (Increase national income & resources) ঃ** সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যক্তিসম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কারবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটে।

**১৪। উদ্যোগী হওয়া (Creating entrepreneur) ঃ** কারবারের মাধ্যমে সহজে ধন-সম্পদ অর্জন করা যায় বলে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কারবারি হতে উদ্যোগী হয়।

**১৫। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার (Develop Industry & commerce) ঃ** কারবার পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বণ্টন করে। কারবারের উন্নতি হলে শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান বিশ্বে মানবগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে এবং মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে কারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## ১.৩ কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা (Definition of Business Organization) ঃ

কারবার বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বা আহরণ থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে বুঝায়। বস্তুত কারবার কতগুলো ক্রিয়াকলাপের জটিল সমাহার। কারবারি কার্যকলাপ তথা পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন কার্য সম্পন্ন করতে হলে ভূমি, শ্রম, পুঁজি ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। আবার এদের একত্রীকরণ ব্যতীত পণ্যসমাগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হয় না। যে প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের একত্রীকরণ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকেই সংগঠন বলে। অতএব, কারবারি কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়ায় কারবারের উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং এদের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয় তাকেই বলা হয় কারবার সংগঠন।

নিম্নে কারবার সংগঠনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল ঃ

**১। অধ্যাপক এল.এইচ হ্যানি (L.H. Haney)-** এর মতে, "সংগঠন বলতে বিশেষায়িত উৎপাদনের উপকরণসমূহের কাঙ্ক্ষিত ও সুষ্ঠু সংযোগ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের প্রচেষ্ঠাসমূহের সমষ্টিকে বুঝায়।" (Organizaition is a harmonious adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose or purposes.)

**২। জে. ডব্লিউ শুল্জ (J. W. Schulg)** বলেন, "সংগঠন কতগুলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথা- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কার্যস্থান ও আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহের একটি নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকর সহ সম্পর্কের সমষ্টিকে বুঝায়।" (A business organization is a combination of necessary beings, materials, tools, equipments, working space and appurtenance brought together in a systemetic and effective correlation to accomplish some desired object.)

**৩। হেনরি ফেয়ল (Henry Fayol)-**এর মতে, "কারবার সংগঠনের অর্থ হল তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, পুঁজি ও কর্মী এসবকিছুর ব্যবস্থা করা।"

**৪। ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের ভাষায়,** "কারবার সংগঠন বলতে উৎপাদনের জন্য এর বিভিন্ন উপাদানের সুসন্নিবেশ ও একত্রীকরণের কার্যসমূহকে বুঝায়।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কারবার বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে প্রক্রিয়ায় কারবারের বিভিন্ন উপকরণগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয়, তাকে কারবার সংগঠন বলে।

### ১.৩.১ কারবার সংগঠনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance or Necessity of Business Organization) ঃ

পণ্যসামগ্রী উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, অর্থসংস্থান, বিজ্ঞাপন, বীমা প্রভৃতি কারবারের মৌলিক কার্য। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসব কাজের সুসন্নিবেশ ও একত্রীকরণ প্রয়োজন। সংগঠনই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক কারবারি জগতে জটিল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় তাই কারবার সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

নিম্নে কারবার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১। সংগঠনকে কারবারের মেরুদণ্ড বলা যায়। সংগঠনের উপর ভর করেই কারবারি তার যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মপ্রচেষ্টা তথা কার্যকলাপ পরিচালনা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে। কেননা, সংগঠনের মাধ্যমেই কারবারের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকে সন্নিবেশিত করা হয়।

২। সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারবারি কাজে ব্যবহৃত ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ ও পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এদেরকে উৎপাদনশীল করে তোলে।

৩। কারবার সংগঠন কারবারের বিভিন্ন বিভাগ বা শাখা, উপবিভাগ ও সকল কর্মীর মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধান করে থাকে।

৪। কারবার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংগঠন কর্মচারীদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলে, যা কারবারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

৫। সংগঠনের মাধ্যমে কারবারের উন্নতমানের শ্রমিক-কর্মী, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, প্রযুক্তি ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৬। সংগঠন কারবারের যে কোন কাজে বিলম্ব, বিশৃঙ্খলা ও ভুল বুঝাবুঝি নিরূপণ করে কারবারের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭। সংগঠনের মাধ্যমে কারবার প্রতিষ্ঠানে আদেশ নির্দেশের ঐক্য বজায় রাখা যায়। ফলে কর্মীরা স্ব স্ব কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

৮। কারবারের সংগঠন এমন একটি কাঠামোর সৃষ্টি করে যে কাঠামোর মধ্যে থেকে কারবার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, নির্দেশনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যগুলো সাফল্যের সাথে সম্পাদন করা যায়।

৯। কারবারের উদ্যোক্তা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিনিধিকে সুসংবদ্ধ করে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। এতে কারবারের সাফল্য নিশ্চিত হয়।

## ১.৪ কারবার সংগঠনের কার্যাবলি (Functions of Business Organization) ঃ

মানুষের অভাব পূরণের নিমিত্তে যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কারবারের অন্তর্গত। কারবারের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| ১। উৎপাদন | ৭। ঝুঁকিগ্রহণ ও বীমা |
| ২। ক্রয় | ৮। বিজ্ঞাপন ও প্রচার |
| ৩। বিক্রয় | ৯। হিসাবরক্ষণ |
| ৪। অর্থসংস্থান | ১০। কর্মী সংক্রান্ত কাজ |
| ৫। পরিবহণ | ১১। বাজার গবেষণা |
| ৬। গুদামজাতকরণ | ১২। ব্যবস্থাপনা |

**কারবারে উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ**

**১। উৎপাদন (Production) ঃ** উৎপাদন হল কারবারের প্রাথমিক ও মুখ্য কাজ। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এদের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন– পাট থেকে চট, তুলা থেকে সুতা এবং সুতা থেকে কাপড় তৈরি ইত্যাদি। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, শোধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নির্মাণ, প্রজনন ইত্যাদি উৎপাদন কার্যাবলির অন্তর্গত।

**২। ক্রয় (Purchase) ঃ** কারবারের উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখতে কিংবা ভোগকারী জনগণের নিকট পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচামাল ও নানাবিধ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। এরূপ ক্রয় কার্য কারবারেরই অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

**৩। বিক্রয় (Sell) ঃ** বিক্রয় কারবারি সংগঠনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য। অর্থের বিনিময়ে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাকে বিক্রয় বলে। এর মাধ্যমে কারবারের স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। কারবারের এই বিক্রয় কার্য কেবল পণ্যের স্বত্ব বা মালিকানা হস্তান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ভোক্তার প্রয়োজন নির্ধারণ, চাহিদা সৃষ্টি ক্রেতা অনুসন্ধান পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে উপদেশ দান এবং বিক্রয় সংক্রান্ত শর্তাদি নির্ধারণ ইত্যাদি এর অন্তভুক্ত।

**৪। অর্থসংস্থান (Financing) ঃ** কারবার সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে অর্থসংস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ছাড়া কোন কারবার চলতে পারে না। কারবার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত এই অর্থকে কারবারের পুঁজি বা মূলধন বলা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত তহবিল, ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কারবারের অর্থসংস্থানের উৎস।

**৫। পরিবহণ (Transport) ঃ** উৎপাদন স্থল থেকে ভোগ বা বিক্রয় স্থানে পণ্য আনয়ন করার পন্থাকেই পরিবহণ বলে। পরিবহণ কারবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবহণের মাধ্যমে কারবারের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃতব্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম শিল্প-কারখানায় আনয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন স্থল হতে ভোগকারী বিক্রেতাদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

**৬। গুদামজাতকরণ (Warehousing) ঃ** পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথেই তা ভোগকারীদের নিকট সব সময় পৌঁছে দেয়া যায় না। তাছাড়া কোন একটি পণ্য বছরের একটি বিশেষ মৌসুমে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই উৎপাদনের সময় হতে ভোগের সময় পর্যন্ত পণ্য সংরক্ষণ করতে হয়। কারবার প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুদামজাতকরণ কার্যের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সময় থেকে ভোগের সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে। এতে ভোগকারীর চাহিদামাফিক পণ্য সরবরাহও নিশ্চিত হয়।

**৭। ঝুঁকিগ্রহণ ও বীমা (Risk taking & Insurance) ঃ** কারবার পরিচালনায় তথা ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনে বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। ব্যবসায়ের এ সমস্ত ঝুঁকি বীমার দ্বারা হ্রাস করা যায়।

**৮। বিজ্ঞাপন ও প্রচার (Advertisement & publicity) ঃ** কারবার প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্য চালাতে হয়। প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানই তার উৎপাদিত বা সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের সংবাদ সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য সম্পাদন করে থাকে।

**৯। হিসাবরক্ষণ (Book keeping) ঃ** কারবার সংগঠনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ। প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানকেই তার দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। সঠিক হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে কারবারের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

**১০। কর্মী সংক্রান্ত কাজ (Staffing function) ঃ** ব্যবাসায় বা কারবারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ দান, অনুপ্রাণিতকরণ ও সঠিক কর্মীকে সঠিক কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হয় এবং সেই সাথে তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হয়।

**১১। বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন (Market research & product development) ঃ** আধুনিক কারবারি প্রতিষ্ঠানকে পণ্য বা সেবার বিভিন্নমুখী উপযোগ সৃষ্টি এবং পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য বাজার গবেষণা করতে হয়। বাজার গবেষণার মাধ্যমে বাজারের গতি, চাহিদা ও সরবরাহের পরিস্থিতি, ভোক্তার রুচি ও পছন্দ, প্রতিযোগিতার ধরন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহ করে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

**১২। ব্যবস্থাপনা (Management) ঃ** আধুনিক কারবার সংগঠনের আর একটি গুরুত্বপূণ কাজ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। এখানে ব্যবস্থাপনা বলতে দক্ষভাবে এতদসংক্রান্ত কার্যাবলির সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকে বুঝায়। মোট কথা, কারবারের সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হল ব্যবস্থাপনা।

উপরালোচিত কার্যাবলি ছাড়াও আধুনিক কারবার সংগঠনকে আর বহুবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন– প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ, মজুত সংরক্ষণ, মোড়কিকরণ, যোগাযোগ রক্ষা, প্রত্যক্ষ সেবাদান ও বিশেষজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

## অনুশীলনী-১

### ▶▶ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **কারবার কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩(T)]
**অথবা, কারবারের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ঃ** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয় বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে কারবার বলে।

২। **ইংরেজি 'Business' শব্দটির পুঁথিগত অর্থ কী?**

**উত্তর ঃ** ইংরেজি 'Business' শব্দটির পুঁথিগত অর্থ হচ্ছে The state of being busily engaged in anything অর্থাৎ কোন কাজে ব্যস্ত থাকা।

৩। **কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে কী কারবার বলা যায়?**

**উত্তর ঃ** কোন কাজে ব্যস্ত থাকাকে কারবার বলা যায় না। কারবার বলতে এমন কাজকে বুঝায় যার মধ্যে ঝুঁকি ও মুনাফা দুই-ই থাকবে।

৪। **কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ১১, ১২]
**অথবা, ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য কী?**

**উত্তর :** কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।

৫। **কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?**

**উত্তর :** কারবারের প্রাথমিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মুনাফা অর্জন। কারবারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সাধিত হয়।

৬। **কারবার কী কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?**

**উত্তর :** কারবার স্বত্বগত, আকৃতিগত, স্থানগত, কালগত, ঝুঁকিগত, অর্থগত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ সৃষ্টি করে।

৭। **কারবারের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেগুলো কী কী?**

**উত্তর :** কারবারের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য
২। সামাজিক উদ্দেশ্য
৩। মানবিক উদ্দেশ্য এবং
৪। জাতীয় উদ্দেশ্য।

৮। **কারবারের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ বলতে কোন্‌গুলোকে বুঝায়?**

**উত্তর :** কারবারের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ বলতে কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালানী ইত্যাদিকে বুঝায়।

৯। **কারবার কীভাবে পুঁজি গঠন করে?**

**উত্তর :** কারবার ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্র করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

১০। **কারবার সংগঠন কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪(T)]
**অথবা, কারবার সংগঠন বলতে কী বুঝায়?**
**অথবা, কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** কারবারি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে প্রক্রিয়ায় কারবারের বিভিন্ন উপকরণসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয় তাকে কারবার সংগঠন বলে।

১১। **সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারবারের কোন্ কোন্ উপকরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়?**

**উত্তর :** সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারবারি কাজে ব্যবহৃত ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ ও পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়।

১২। **উদ্যোক্তার কাজ কী?**

**উত্তর :** উদ্যোক্তা কারবার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, কারবারের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করে কারবারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন এবং কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান পরিচলনা করে যান।

১৩। **জনসংখ্যা কীভাবে কারবার সংগঠন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে?**

**উত্তর :** কারবারের জন্য শ্রমশক্তি এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজন হয়। কাজেই বলা যায় জনসংখ্যা কারবার সংগঠন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৪। **উৎপাদন কী?**

**উত্তর :** উৎপাদন হল কারবারের প্রাথমিক ও মুখ্য কাজ। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এদের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

১৫। **বিক্রয় কাকে বলে?**

**উত্তর :** অর্থের বিনিময়ে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাকে বিক্রয় বলে। এর মাধ্যমে কারবারের স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

১৬। **কারবারে গুদামজাতকরণের কাজ কী?**

**উত্তর :** কারবার প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুদামজাতকরণ কার্যের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন সময় থেকে ভোগের সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে।

**১৭। কারবারের ঝুঁকি কীভাবে হ্রাস করা যায়?**

**উত্তর** কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি বীমার দ্বারা হ্রাস করা যায়।

**১৮। মালিকানার ভিত্তিতে কারবার সংগঠনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ১৩(T)]

**উত্তর** মালিকানার ভিত্তিতে কারবার সংগঠনকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– একমালিকানা কারবার, অংশীদারি কারবার, যৌথমূলধনী কারবার, সমবায় কারবার, কারবারি জোট ও রাষ্ট্রীয় কারবার।

**১৯। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য কী?**

**উত্তর** ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হল ব্যবসায়ের থেকে মুনাফা অর্জন করে নিজের আর্থিক উন্নয়ন করা।

**২০। একজন ব্যবসায়ী পণ্যের কী কী উপযোগ সৃষ্টি করে?**

**উত্তর** একজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপায়ে পণ্যের স্থানগত, রূপগত ও স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

**২১। অধ্যাপক হেনির মতে ব্যবসায় সংগঠন কী?**

**উত্তর** অধ্যাপক হেনির মতে, "কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য ব্যবসায়ের বিশেষ বিশেষ অংশ বা উপাদানসমূহকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় সংগঠন বলে।

**২২। কারবারি জোট কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** সমধর্মী একাধিক কারবার মিলে যে সমিতি বা জোট গঠন করে, তাকে কারবারি জোট বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। কারবারের সংজ্ঞা দাও।** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর** সাধারণ অর্থে কারবার বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারবারের অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে কারবার হচ্ছে— পণ্যদ্রব্য আহরণ থেকে শুরু করে ভোগকারীদের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা বা কার্যাবলি। মানুষের অভাব পূরণের নিমিত্তে ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলিই কারবার হিসেবে পরিগণিত হয়। অধ্যাপক L. H. Haney- র মতে, "পণ্যসামগ্রী ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন অথবা সংগ্রহের জন্য মানুষের কার্যকলাপকে কারবার বলে।"

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোগকারীদের নিকট বণ্টন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে কারবার বলে।

**২। কারবার প্রধানত কয় ধরনের কাজের সমষ্টি? কাজগুলো কী কী?**

**উত্তর** কারবার প্রধানত তিন ধরনের কাজের সমষ্টি। কাজগুলো হল–

১। পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন।
২। পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন।
৩। পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য।

**৩। কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৩, ১৩, ১৪(T)]
**অথবা, কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

**উত্তর** কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। মুনাফা অর্জন
২। মূলধন সরবরাহ
৩। পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন
৪। পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের বণ্টন
৫। ঝুঁকি বহন
৬। উপযোগ সৃষ্টি
৭। ক্রয়-বিক্রয়ের পৌনঃপুনিকতা
৮। সেবামূলক মনোভাব
৯। স্বাধীন কর্মপ্রবাহ
১০। উদ্যোগ।

**৪। কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো কী?**

**উত্তর** কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো হল–

১। প্রতিষ্ঠানিক রূপ
২। নির্দিষ্ট স্থান।
৩। মূলধন
৪। শ্রমশক্তি
৫। সংগঠন
৬। পণ্যদ্রব্য ও সেবা
৭। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি
৮। আর্থিক মূল্যে লেনদেন
৯। সহায়ক উপকরণ
১০। আইনগত বৈধতা।

**৫। কারবারের প্রধান দুটি মৌলিক উপাদানের ব্যাখ্যা দাও।**

**উত্তর** নিম্নে কারবারের প্রধান দুটি মৌলিক উপাদানের ব্যাখ্যা প্রদান করা হল ঃ

১। **মূলধন ঃ** মূলধন ব্যবসায়ের একটি অন্যতম উপাদান। মূলধন ছাড়া কারবার কারবারি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অথবা প্রয়োজনবোধে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে।

২। **শ্রমশক্তি ঃ** কারবারি কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রমশক্তি। শ্রমিক-কর্মীই কারবারের সকল স্তরে নিয়োজিত থেকে কারবার পরিচালিত করে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। শ্রমিক-কর্মীই কারবারের মূল শক্তি বিধায় কারবারের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে শ্রমশক্তিকে বিবেচনা করা হয়।

**৬। কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে লেখ।** [বাকাশিবো-২০০৯, ১১, ১২]

**উত্তর** নিম্নে কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **মুনাফা অর্জন ঃ** মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেই কারবারি তার মূলধন, শ্রম ও বুদ্ধি কারবারে খাটায়।

২। **মূলধন বিনিয়োগ ঃ** সঞ্চিত অর্থ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে সম্পদ বৃদ্ধিকরণ কারবারের মূল উদ্দেশ্য।

৩। **পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ঃ** মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করা কারবারের আর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

৪। **সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ** সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারবারের একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য।

৫। **গবেষণা ও নতুন আবিষ্কার ঃ** গবেষণা দ্বারা ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা কারবারের উদ্দেশ্য।

**৭। কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যাবলি কী?**

**উত্তর** কারবারের মানবিক উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

১। শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান।
২। মানবীয় সম্পর্ক সৃষ্টি।
৩। চাকরির স্থায়িত্ব বিধান।
৪। উপযুক্ত কার্যপরিবেশ গড়ে তোলা।
৫। শ্রমিক কল্যাণ সাধন করা।

**৮। সংক্ষেপে কারবারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।**

**উত্তর** নিম্নে সংক্ষেপে কারবারের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলা ঃ

১। কারবার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।
২। কারবার মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য পণ্যদ্রব্য ও সেবার যোগান দেয়।
৩। কারবার দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলস সঞ্চয়কে একত্রিত করে দেশের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।
৪। কারবার মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।
৫। কারবার মানুষের ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে।
৬। কারবার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিত্যনতুন খাদ্য ও সেচকার্য আবিষ্কার ও সরবরাহ করে মানব সমাজের সঠিক কল্যাণ সাধন করছে।

**৯। কারবার সংগঠন বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর** উৎপাদনের উপকরণ, যথা ঃ ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে। উৎপাদন কারবারেরই কার্য বিশেষ। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তা ভোগকারীদের নিকট পৌছানোর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাই কারবারের উদ্দেশ্য। কারবারের এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। এদের একত্রীকরণ ও সমন্বয় ব্যতীত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন সম্ভব নয়। সুতরাং, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে যে প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলোকে সংগ্রহ করে এদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন করা হয়, তাকে কারবার সংগঠন বলা হয়।

**১০। আদেশের ঐক্য ও নির্দেশনার ঐক্য নীতি ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর** **আদেশের ঐক্য ঃ** এই নীতি অনুসারে একজন কর্মীর মাত্র একজন নির্দেশ প্রদানকারী মনিব থাকবে। একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট থেকে নির্দেশ পেলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর পক্ষে সে নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয় না।

**নির্দেশনার ঐক্য ঃ** এ নীতির মূলকথা হল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশের মধ্যে মিল থাকতে হবে নির্দেশনার মধ্যে অমিল থাকলে অধস্তন কর্মীর পক্ষে সেগুলো পালন করা সম্ভব হয় না।

**১১। কারবার সংগঠনের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০১১, ১৩(T)]

**উত্তর** কারবার সংগঠনের প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| ১। পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন | ২। ক্রয় |
| ৩। বিক্রয় | ৪। অর্থসংস্থান |
| ৫। পরিবহণ | ৬। গুদামজাতকরণ |
| ৭। ঝুঁকি গ্রহণ ও বীমা | ৮। বিজ্ঞাপন ও প্রচার |
| ৯। হিসাবরক্ষণ | ১০। কর্মী সংক্রান্ত কাজ |
| ১১। বাজার গবেষণা | ১২। ব্যবস্থাপনা। |

**১২। কারবার সংগঠনের পরিবহণ কাজটি ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর** উৎপাদন স্থল থেকে ভোগ বা বিক্রয় স্থানে পণ্য আনয়ন করার পন্থাকেই পরিবহণ বলে। পরিবহণ কারবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবহণের মাধ্যমে কারবারের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃতব্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম শিল্প-কারখানায় আনয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন স্থল হতে ভোগকারী বিক্রেতাদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

**১৩। কারবার সংগঠন কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর** কারবার সংগঠনের গঠনপ্রণালি, কার্যাবলি, মালিকানা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভিন্নতার কারণে কারবার সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে মালিকানার প্রকারভেদ অনুসারে কারবার সংগঠনকে প্রধানত ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। একমালিকানা কারবার;
২। অংশীদারি কারবার;
৩। যৌথ মূলধনী কারবার;
৪। সমবায় কারবার;
৫। রাষ্ট্রীয় কারবার;
৬। কারবারি জোট।

**১৪। কারবারি জোট কী?**

**উত্তর** পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা পরিহার ও অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যখন কতকগুলো সমজাতীয় পৃথক কারবার প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয় তখন তাকে কারবারি জোট বলে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে আর্থিক সংহতি বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অর্জন; বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে বাজারে বিস্তৃতি লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েই মূলত কারবারি জোট গঠিত হয়ে থাকে।

**১৫। রাষ্ট্রীয় কারবার বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** রাষ্ট্র বা দেশের সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কারবারকে রাষ্ট্রীয় কারবার বলে। সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এ কারবার গঠিত হতে পারে অথবা জাতীয় স্বার্থে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কারবারে রূপান্তর করা যেতে পারে। সাধারণত জনস্বার্থ ও জনকল্যাণকর কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কারবার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে থাকে।

**১৬। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** কোন প্রকল্প বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান যখন সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীনে গঠিত বা পরিচালিত হয় তখন তাকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বলে। এই প্রকার প্রকল্প বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ পরিচালনা লাভ-লোকসান বণ্টন, বিলোপ সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ অনেক দেশে পিপিপি পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে।

**১৭। কারবার সংগঠনকে একটি সামাজিক আন্দোলন বলা হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** মানুষের অভাববোধ ও অভাব পূরণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সূত্র ধরেই কারবার সংগঠনের উৎপত্তি। এরূপ সংগঠন মানুষের জন্য পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করে এবং তা সমাজবাসী মানুষের নিকট সরবরাহ করে তাদের অভাবমোচন করে। তাই কারবার সংগঠনকে একটি সামাজিক আন্দোলন বলা হয়।

**১৮। কারবার সংগঠনের মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** কারবার সংগঠনের মূলনীতিগুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

১। সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও কাঠামো এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

২। সাংগঠনিক পদ্ধতি সরল ও সহজবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৩। কার্যাদির ধারাবাহিকতা ও নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রেখে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে।

৪। শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হতে হবে।

৫। আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো অবশ্যই নমনীয় বা পরিবর্তনশীল হবে।

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

**১। কারবারের সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।**

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.১ ও ১.১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**২। কারবার বলতে কী বুঝ? কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা কর।**

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.১ ও ১.১.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**৩। কারবারের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।**

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**৪। কারবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।**

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.২ নং অনুচ্ছেদ এর (ক) ও (খ) অংশ দ্রষ্টব্য।

**৫। আধুনিক অর্থনীতিতে কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.২.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**৬। কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও। কারবার সংগঠন পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে কী?**

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.৩ ও ১.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**৭। কারবার সংগঠন কাকে বলে? কারবার সংগঠনের কার্যাবলি আলোচনা কর।** [বাকাশিবো ২০১০, ১১, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১.৩ ও ১.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

*******

# অধ্যায়-২

# কারবার সংগঠনের গঠন পদ্ধতি
# (Formation of Business Organization)



*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*২.০ সূচনা; ২.১ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের বর্ণনা; ২.২ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের গঠনপ্রণালী; ২.৩ এক মালিকানা, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ; ২.৪ সমবায় সমিতির মূলনীতি; ২.৫ বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা*

## ২.০ সূচনা (Introduction) ঃ

ব্যবসায়িক কার্যকলাপ তথা পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় সংগঠন একটি অপরিহার্য উপাদান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন কার্যও জটিল হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান হিসেবে সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। আগেরকার দিনে উৎপাদন ব্যবস্থা যখন সীমিত ছিল তখন উৎপাদন কার্য পরিচালনা করাও সহজ ছিল। যে কারণে পৃথক উপাদান হিসেবে সংগঠনের কোন প্রয়োজন হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন পদ্ধতিতে জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এই জটিল ও বৃহদায়তন উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে সংগঠন একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

কারবারের সাফল্যের জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে অধিক। একটি কারবার প্রতিষ্ঠান জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অর্থ এবং ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত। সংগঠন কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সকল উপকরণ সমূহের একত্রীকরণ তথা সমন্বয় সাধন করে থাকে। সংগঠনের উপর ভর করেই কারবার তার ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে থাকে। আধুনিক কারবারী জগতে কারবার সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, পরিচালনা ও মালিকানা ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন প্রকার কারবার সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রতিটি কারবার সংগঠনই স্বীয় গণ্ডির মধ্য থেকে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

## ২.১ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের বর্ণনা (Define Sole Proprietorship, Partnership, Joint Stock Company and Co-Operative) ঃ

❑ **এক মালিকানা কারবারের সংজ্ঞা (Definition of sole tradership business) ঃ** একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কারবার প্রতিষ্ঠানকে এক মালিকানা কারবার বলে। এ কারবারের মালিক নিজেই পুঁজি বিনিয়োগ করে। সমুদয় ঝুঁকিও কারবার পরিচালনার দায়িত্ব একাই গ্রহণ করে। প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজন বা বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। মালিক কারবারের সর্বেসর্বা। কারবারের সমুদয় লাভ সে একাই ভোগ করে। লোকসান হলে তার দায় গ্রহণ করে। এরূপ কারবারের পৃথক সত্তা থাকে না। কারবার ও কারবারি অভিন্ন সত্তার অধিকারী। কারবার সংগঠনগুলোর মধ্যে এটি প্রাচীনতম কারবার।

নিচে এক মালিকানা কারবারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

১। **জেমস স্টিফেনসনের (Jams Stephenson) মতে,** "একক মালিক সে ব্যক্তি যে কেবল নিজে এবং নিজের জন্য কারবার পরিচালনা করে।" (A sole trader is a person who carries on business exclusively by and for himself.)

২। **কুন্ত ও ফুলমার (Koonts & Fulmer) এর মতে,** "একজন ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত কারবারকে এক মালিকানা কারবার বলে।" (A sole proprietership is a business owned and controlled by one person.)

৩। **গ্লস ও বেকার (Gloss & Baker) বলেন,** "মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একক ব্যক্তির মালিকানাধীন কারবারই এক মালিকানা কারবার।" (A sole proprietership is a buisness owned by one person and operated for his profit.)

৪। **এম. সি. শুকলা বলেন,** "এক মালিকানা কারবার এমন এক প্রকার সংগঠন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাঁর পুঁজি, দক্ষতা ও বুদ্ধি খাটিয়ে উৎপাদন করে, সমুদয় মুনাফার অধিকারী হয় এবং কারবারের সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, একজন মাত্র ব্যক্তির মালিকানাধীনে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কারবারকেই এক মালিকানা কারবার বলে।

### ২.১.১ এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Sole Tradership Business) ঃ

এক মালিকানা কারবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

**১। গঠন (Formation) ঃ** এক মালিকানা কারবার করতে বিশেষ কোন নিয়মকানুন অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে এ ধরনের কারবার গঠন করতে পারে।

**২। মালিকানা (Ownership) ঃ** এ কারবারের মালিক মাত্র একজন ব্যক্তি। তিনিই কারবারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ইচ্ছানুযায়ী কারবার গঠন ও পরিচালনা করেন।

**৩। মূলধন (Capital) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই মূলধন সরবরাহ করে থাকে। প্রয়োজনে সে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কিংবা ব্যাংক থেকে বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিতে পারে।

**৪। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management & administration) ঃ** এ জাতীয় কারবারে মালিক নিজেই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে বেতনভোগী কর্মচারীর সাহায্য নিতে পারে।

**৫। নিয়ন্ত্রণ (Controlling) ঃ** এক মালিকানা কারবারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ভার এর মালিকের উপর ন্যস্ত থাকে। সে স্বয়ং ক্রয়-বিক্রয় উৎপাদন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে এবং এদের বাস্তবায়ন করে থাকে।

**৬। ঝুঁকি ও মুনাফা বণ্টন (Distribution risk & profit) ঃ** এরূপ কারবারের লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ ঝুঁকি মালিকের। 'He risks all, gains all' কোন কর্মচারী বা অন্য কেউ এর লাভ লোকসানের জন্য দায়ী থাকে না। লাভ হলে মালিক একাই ভোগ করে। লোকসান হলে দায় তাঁকেই বহন করতে হয়।

**৭। দায় (Liabilities) ঃ** এরূপ কারবারের দায় মালিক একাই বহন করে। এর দায়-দায়িত্ব সার্বিক ও সীমাহীন। কারবারের দায় মেটাতে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও টান পড়তে পারে।

**৮। সত্তা (Entity) ঃ** আইনের দৃষ্টিতে এরূপ কারবারের পৃথক কোন সত্তা নেই। কারবার ও মালিক এক ও অভিন্ন সত্তার অধিকারী।

**৯। স্থায়িত্ব (Stability) ঃ** কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের কর্মক্ষমতা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করলে যে কোন সময় কারবার গুটিয়ে ফেলতে পারে।

**১০। কারবারের আয়তন (Area) ঃ** সীমাহীন দায় এবং এক ব্যক্তির সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলে এ কারবার সাধারণ ক্ষুদ্র আকারেই হয়ে থাকে।

**১১। নমনীয়তা (Flexibillity) ঃ** এক মালিকানা কারবারের মালিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নীতি ও কর্মপন্থার দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে।

**১২। সরকারি বিধিনিষেধ মুক্ত (Free from Govt. restriction) ঃ** গঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক মালিকানা কারবার সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

**১৩। প্রাচীনতম রূপ (Primitiveness) ঃ** এ কারবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম রূপ। প্রাচীন কাল থেকেই এটি খুব জনপ্রিয়।

**১৪। হিসাবনিকাশ (Accounts maintaining) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক তার ইচ্ছামাফিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এতে সরকারি বিধি-নিষেধ নেই।

**১৫। সার্বজনীনতা (Univcrsality) ঃ** অন্যান্য কারবার সংগঠনের চেয়ে এ কারবারের জনপ্রিয়তা সব দেশেই সর্বাধিক।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো একমালিকানা কারবারকে অন্য সকল কারবার থেকে আলাদা করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

### ২.১.২ অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা (Definition of Partnership Business) ঃ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কারবার গঠন করে তার লাভ-ক্ষতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বলতে ন্যূনপক্ষে দুই জন এবং সর্বাধিক দেশের সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যাকে বুঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ সংখ্যা সাধারণ ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ২০জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ১০জনের অধিক হতে পারে না। অংশীদারি কারবার গঠনেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজেরা কারবারে মূলধনের যোগান দেয় এবং চুক্তি অনুসারে লাভ-লোকসান নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। অংশীদারি কারবারের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। এ কারবারের অংশীদারিদের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অসীম থাকে। সকল অংশীদার বা সকলের পক্ষে যে কোন এক বা দুজন কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

নিচে অংশীদারি কারবারের কতিপয় প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ

১। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, "মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট কোন কারবার সকলে বা সকলের পক্ষে যে কোন একজন পরিচালনা করলে তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়।" (Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.)

২। **প্রফেসর এম.আই. থমাস বলেন,** "কতিপয় ব্যক্তিবর্গের যে সংঘ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে কারবার পরিচালনা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়।" (A partnership is who association of people who carry on business together for the purpose of making profit.)

৩। **মিত্র ও বসু বলেন,** "মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে কোন কারবার গঠন করলে তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়।"

৪। **আমেরিকার দি ইউনিফরম অংশীদারি আইনে বলা হয়েছে,** "অংশীদারি কারবার হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এমন একটি সংঘ যেখানে তারা সহমালিক হিসেবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কারবার পরিচালনা করে।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, দেশে প্রচলিত অংশীদারি আইন অনুযায়ী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

## ২.১.৩ অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Partnership Business) ঃ

অংশীদারি কারবারের কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে অংশীদারি কারবারের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

**১। গঠন (Formation) ঃ** অংশীদারি কারবার গঠনে আইনগত ঝামেলা নেই। একাধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করতে পারে।

**২। চুক্তি (Deed) ঃ** চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি। চুক্তি ছাড়া এ কারবার গঠন করা যায় না। চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে।

**২। সদস্য সংখ্যা (Number of member) ঃ** সাধারণ অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ২০ জন, তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

**৪। মূলধন (Capital) ঃ** এর মূলধন অংশীদাররাই যোগান দেয়। তারা মূলধন সমপরিমাণ বা কমবেশি পরিমাণেও সরবরাহ করতে পারে। এমনকি আদৌ কোন মূলধন না দিয়েও কেউ অংশীদার হতে পারে।

**৫। সদস্যদের যোগ্যতা (Qualification of the member) ঃ** সাধারণত নাবালক, পাগল, দেউলিয়া প্রভৃতি ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ অংশীদারি কারবারের সদস্য হতে পারে।

**৬। ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (Management & controlling) ঃ** কারবার পরিচালনার ক্ষমতা সকল অংশীদারদের থাকে। তবে কার্যত তারা এ ভার কোন একজন বা দুজন অংশীদারদের উপর ন্যাস্ত করে থাকে।

**৭। মুনাফা বণ্টন (Distribution profit) ঃ** চুক্তি অনুযায়ী কারবারের মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কিছু না থাকলে অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা সমপরিমাণে অথবা মূলধন অনুপাতে বণ্টন করা হয়ে থাকে।

**৮। সত্তা (Entity) ঃ** আইনের দৃষ্টিতে অংশীদারি কারবারের আলাদা কোন সত্তা নেই। অংশীদারদের ব্যক্তিগত সত্তা দিয়েই এটা পরিচিত।

**৯। অসীম দায় (Unlimited liability) ঃ** অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের দায় অসীম। অর্থাৎ কারবারের দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে।

**১০। অন্যকে দায়ী করার ক্ষমতা (Ability to charge others) ঃ** কারবার পরিচালনায় প্রত্যেক অংশীদারই তার কাজের জন্য অপরাপর অংশীদারকে দায়ী করতে পারে।

**১১। নিবন্ধন (Registration) ঃ** অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এর নিবন্ধন অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

**১২। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান (Voluntary organization) ঃ** এটি একটি স্বেচ্ছামূলক কারবারী প্রতিষ্ঠান। এ কারবারে সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে।

**১৩। শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of share) ঃ** অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার তার শেয়ার বা অংশ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারে না। তবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে তা সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে নতুন অংশীদারকে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

**১৪। কারবারের আয়তন (Size of business) ঃ** মূলধনের স্বল্পতা ও অসীম দায়ের জন্য এরূপ কারবারের আয়তন সাধারণত ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

**১৫। আইনের নিয়ন্ত্রণ (Control by law) ঃ** বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন দ্বারা অংশীদারি কারবার নিয়ন্ত্রিত হয়।

**১৬। কর প্রদান (Paid tax) ঃ** অংশীদারি কারবারকে অন্যান্য কারবারের ন্যায় আয়কর ও অন্যান্য কর প্রদান করতে হয়।

**১৭। সদ্বিশ্বাস (Mutual trust) ঃ** এ কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অংশীদারদের মধ্যে পরস্পর চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস স্থাপন করা। বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিলে যে কোন মুহূর্তে এ কারবার ভেঙ্গে যেতে পারে।

**১৮। বিলোপ সাধন (Dissolation) ঃ** অংশীদারগণ যে কোন সময় এ কারবারের বিলোপ সাধন করতে পারে। কোন অংশীদার অবসর নিলে বা দেউলিয়াপ্রাপ্ত হলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হলে কারবারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

## ২.১.৪ যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা (Definition of Joint Stock Company) ঃ

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এবং যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে কারবার গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে এ কারবার গঠিত ও পরিচালিত হয়। এটি কৃত্রিম সত্তার অধিকারী এবং নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত। এর মালিকানা ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারবারের মূলধন কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। মূলধনের এই অংশগুলোকে বলা হয় শেয়ার। যে কোন ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারে। শেয়ার ক্রেতাকে 'শেয়ারহোল্ডার' বলে। শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য এবং শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। যৌথ মূলধনী কারবার নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের যৌথ মূলধনী কারবার ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নিচে যৌথ মূলধনী কারবারের কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

১। **অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ বলেন,** "মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত, স্বশাসিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থাকে কোম্পানি বলে।"

২। **বিচারপতি মার্শাল-এর মতে,** "কোম্পানি হল এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা, যা দেখা বা ছোঁয়া যায় না এবং আইনের বিধান অনুসারে টিকে থাকে।"

৩। বিচারপতি লিন্ডলে (Lindley) **বলেন,** "কোম্পানি হল একটি স্বেচ্ছামূলক সংঘ বা কতিপয় ব্যক্তির সংগঠন। যেখানে তারা অর্থ অথবা আর্থিক মূল্যের সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি যৌথ তহবিল গঠন করে এবং সে তহবিল লোক কারবার বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে তা হতে অর্জিত মুনাফা বা লোকসান ভোগ করে।"

৪। ১৯৯৪ সালের **কোম্পানি আইনের ২.১ (ঘ)** ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানি' বলতে এই আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিকৃত কোন কোম্পানি বা কোন বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝাবে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে কতিপয় ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তাবিশিষ্ট স্বেচ্ছামূলক সংস্থাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

### ২.১.৪.১ যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Joint Stock Company) ঃ

**১। কৃত্রিম সত্তা (Artificial personality) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার কোম্পানি আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা। এটা নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত। কোম্পানির নামে এর দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি চলতে পারে।

**২। স্বেচ্ছামূলক সংস্থা (Voluntary association) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার স্বেচ্ছামূলক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে আইনের ভিত্তিতে এ কারবার গঠন করে থাকে।

**৩। মূলধন (Capital) ঃ** এর মূলধন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত এবং যে কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক শেয়ার ক্রয় করে উক্ত কারবারের মালিক হতে পারে।

**৪। সদস্য সংখ্যা (Number of members) ঃ** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাতজন ও সর্বোচ্চ শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট এবং প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুইজন ও সর্বাধিক পঞ্চাশজন সদস্য থাকতে পারে।

**৫। দায় (Liability) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডারদের দায় ক্রীত শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। তাই কোম্পানির দায়ের জন্য সদস্যদের এবং সদস্যদের দায়ের জন্য কোম্পানিকে দায়ী করা যায় না।

**৬। পরিচালনা (Administration) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

**৭। মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক (Independency of management from ownership) ঃ** শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক। কিন্তু এর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণভার শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত অল্প কয়েকজন পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকে।

**৮। নিবন্ধন (Registration) ঃ** কোম্পানির আইন মোতাবেক যৌথ মূলধনী কারবারকে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হয়।

**৯। সাধারণ সীলমোহর (Common seal) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের নিজস্ব সীলমোহর থাকে। কারবারের বিভিন্ন কাজ-কর্মে ও দলিলপত্রে এ সীলমোহর কৃত্রিম ব্যক্তির পরিচয় লাভ করে।

**১০। চিরস্থায়িত্ব (Perpetual succession) ঃ** পৃথক সত্তা থাকায় কারবার লাভজনকভাবে পরিচালিত হলে চির অস্তিত্ব লাভ করে। এর কোন মালিক বদল হলে বা মারা গেলে কারবারি সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না বা কারবারের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

**১১। শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতা (Transferability of share) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ার হস্তান্তরের সাথে সাথে মালিকানাও রদবদল হয়। এর শেয়ার বেচা-কেনার জন্য সংগঠিত শেয়ার বাজার থাকে।

**১২। বিবরণপত্র (Prospectus) ঃ** পাবলিক লিঃ কোম্পানিগুলো শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য বিবরণপত্র প্রচার করে জনগণকে এর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায়।

**১৩। স্বায়ত্তশাসন (Self-possessed) ঃ** যদিও কোম্পানি আইন দ্বারা এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ হয়, তবুও ব্যবস্থাপনায় এটি যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে।

**১৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic management) ঃ** কারবার সংগঠনের পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত হন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের উপর কারবার পরিচালিত হয়।

**১৫। মুনাফা বণ্টন (Distribution of profit) ঃ** এ কারবারের লভ্যাংশ পরিচালকদের সুপারিশ অনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। তারপর তা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

**১৬। বার্ষিক হিসাবনিকাশ (Annual accounts & audit) ঃ** এর বার্ষিক হিসাবনিকাশ একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মালিকদের জানাতে হয়। এ হিসাব-নিকাশ সনদপ্রাপ্ত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাতে হয়।

**১৭। মূলধনের প্রাচুর্যতা (Vast capital) ঃ** মূলধনের প্রাচুর্যতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে এ কারবারের বেগ পেতে হয় না।

**১৮। কর প্রদান (Tax paid) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারকে অন্যান্য কারবার অপেক্ষা অধিক হারে কর প্রদান করতে হয়।

**১৯। মোকদ্দমার অধিকার (Rights to case) ঃ** কোম্পানি নিজ নামেই তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে এবং তৃতীয় পক্ষও কোম্পানির নামে মামলা দায়ের করতে পারে।

**২০। বিলোপ সাধন (Dissolution) ঃ** এ কারবার আইনের বিধান অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়। ফলে সদস্যগণ ইচ্ছা করলেই এ কারবারের বিলোপ ঘটাতে পারে না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যৌথমূলধনী কারবারকে কারবারিজগতে পৃথক সত্ত্বা দান করেছে এবং বৃহদাকার কারবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## ২.১.৫ সমবায় সংগঠনের সংজ্ঞা (Definition of Co-operative Society) ঃ

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মিলন বা সহযোগিতা। শাব্দিক অর্থে সমবায় সম্মিলিত বা যৌথ প্রচেষ্টায় কোন কাজ করাকে বুঝায়। নিজেদের পারস্পরিক মঙ্গল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের বিত্তহীন ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং একই শ্রেণি বা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি বলে। মুনাফা অর্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণ সাধনই এর মূল লক্ষ্য।

**বিশিষ্ট মনীষী হেনরী কালভার্ট (Henry Calvert)** সমবায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সমবায় হল এমন একটি সংগঠন, যাতে কয়েকজন ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সমঅধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিলিত হয়ে থাকে।"

সমবায় প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। তাদের মতে, "সম-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, সম-অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে, সমাজের নিম্ন আয়ের ব্যক্তিবর্গ যে সংঘ গড়ে তোলে তাই সমবায় সমিতি।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজের কতিপয় দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পারস্পরিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃত সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি বলে। সমবায় সমিতি মূলত সমাজের কৃষক, শ্রমিক, মজদুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি শ্রেণীর সংগঠন।



### ২.১.৬ সমবায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of Co-Operative Society) ঃ

সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

**১। স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংগঠন (Voluntary organization) ঃ** সমবায় সমিতি স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংঘ বা প্রতিষ্ঠান। সমভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

**২। সদস্য সংখ্যা (Number of members) ঃ** সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য নূন্যতম ১০ জন সদস্যের প্রয়োজন। এর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা অনির্দিষ্ট।

**৩। গঠন (Formation) ঃ** ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় সমিতি নিয়মাবলির মাধ্যমে অন্তত ২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি গঠনের জন্য ১০ (দশ) জন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য প্রয়োজন হয়।

**৪। নিবন্ধন (Registration) ঃ** সমবায় আইন অনুযায়ী এরূপ সংগঠন নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

**৫। পুঁজি সরবরাহ (Capital supply) ঃ** সমিতির সদস্যরা শেয়ার ক্রয় করে এবং মূলধনের যোগান দেয়। তবে একজন সদস্য মোট শেয়ার মূলধনের এর পঞ্চমাংশের অধিক মূল্যের শেয়ার ক্রয় করতে পারে না।

**৬। পৃথক সত্তা (Separate entity) ঃ** সমবায় সমিতি সমবায় আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে পৃথক সত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্ব লাভ করে।

**৭। শেয়ার হস্তান্তর (Transferability of shares) ঃ** সমবায় সংগঠনের শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।

**৮। উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ** মুনাফা অর্জন সমবায়ের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। সদস্যদের পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণ সাধনই এর মূল লক্ষ্য।

**৯। মুনাফা বন্টন (Distribution profit) ঃ** সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন না হলেও উদ্বৃত্ত মুনাফার ১৫% সঞ্চিতি তহবিলে এবং ৫% সমবায় উন্নয়ন তহবিলের জন্য জমা রেখে বাকি অংশ উপবিধি অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

**১০। দায় (Liability) ঃ** সমবায় সমিতির দায় অসীম ও সীমাবদ্ধ উভয় প্রকারের হতে পারে।

**১১। গণতন্ত্র (Democracy) ঃ** গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত পরিচালকদের নিয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির উপর এর পরিচালনার ভার ব্যস্ত থাকে।

**১২। সম-ভোটাধিকার (Equal right of votes) ঃ** ক্রীত শেয়ারের সংখ্যার উপর সমবায়ের সদস্যস্যদের ভোট দান নির্ভর করে না। সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোটদানের অধিকার থাকে।

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সমবায় সংগঠনের চরিত্র অন্যান্য যে কোন কারবার সংগঠন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।

## ২.২ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী ও সমবায় কারবারের গঠনপ্রণালি (Formation of Sole Proprietorship, Partnership, Joint Stock Company & Co-operative) ঃ

### ২.২.১ এক মালিকানা কারবারের গঠনপ্রণালি (Formation of Sole Tradership Business) ঃ

এক মালিকানা কারবার গঠন করা খুবই সহজ। যে কোন ব্যক্তি ইহা করলে স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কোন সময় এ কারবার গঠন করতে পারে। এরূপ কারবার গঠন করতে বিশেষ কোন আইনগত বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুন অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগই কারবার আরম্ভ করার জন্য যথেষ্ট।

গ্রামে-গঞ্জে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই স্বল্প কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একক মালিকানার ভিত্তিতে হাটে-বাজারে বা রাস্তার পাশে ছোট-খাট ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে শহর এলাকায় এরূপ কারবার করতে হলে উদ্যোক্তাকে পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র বা ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপরই ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

## ২.২.২ অংশীদারি কারবারের গঠন প্রণালি (Formation of Partnership Business) ঃ

অংশীদারি কারবার গঠন করা সহজ। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মূলধন সরবরাহ করে এ কারবার গঠন করতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ কারবার গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অংশীদারি কারবার গঠন করতে হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় ঃ

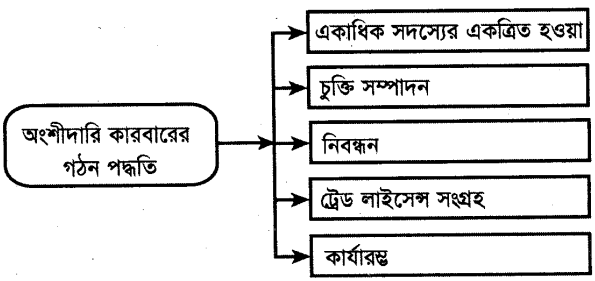


**১। একাধিক সদস্যের একত্রিত হওয়া (More persons as co-owners) ঃ** অংশীদারি কারবার গঠনের জন্য প্রথমেই কমপক্ষে দুজন এবং বেশির পক্ষে বিশজন কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবসায়ে দশজনের অধিক নয় এরূপ সমমনা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় বৈধ ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হতে হয়।

**২। চুক্তি সম্পাদন (Agreement deed) ঃ** কারবার গঠনে ইচ্ছুক সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি ব্যবসায়ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেই অংশীদারি কারবারের সৃষ্টি হয়। চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি। ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এ চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত উভয়ই হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

**৩। নিবন্ধন (Registration) ঃ** অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। নিবন্ধন ছাড়াই এরূপ কারবার সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। তবে অংশীদাররা কারবার ও নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছা করলে তা নিবন্ধিত করতে পারে। অংশীদারি কারবার নিবন্ধিত করতে হলে নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত ফিসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রে ফার্মের নাম, ব্যবসায়ের স্থান, অংশীদারদের নাম- ঠিকানা, তাদের যোগদানের তারিখ, ফার্মের মেয়াদ প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়। আবেদন পত্রটি সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। আবেদনপত্রের বিবৃতি পরীক্ষা করে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে ফার্মটিকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করেন।

**৪। ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ (Collect trade license) ঃ** এ পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে অংশীদারি ফার্মকে স্থানীয় পৌরসভা অথবা সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগ হতে ট্রেড লাইসেন্স বা ব্যবসায় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

**৫। কার্যারম্ভ (Commencement) ঃ** উপরোল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের পর অংশীদারি ফার্ম ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি কারবার গঠনের ক্ষেত্রে আইনের তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে খুব সহজেই এরূপ কারবার গঠন করা যায়।

## ২.২.৩ অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন (Registration of Partnership Firm) ঃ

সাধারণভাবে অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বলতে অংশীদারি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ে অংশীদারি কারবারের নাম তালিকা ভুক্তকরণকে বুঝায়। অন্য কথায়, অংশীদারি চুক্তিপত্রের নিবন্ধনকেই অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বলা হয়ে থাকে। কেননা, অংশীদারি কারবার সৃষ্টি হয় চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তি মৌখিক, লিখিত এবং লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। লিখিত চুক্তিপত্র যখন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিবন্ধন করানো হয় তখন তাকে চুক্তিপত্রের নিবন্ধন বলা হয়। চুক্তিপত্রটি নিবন্ধিত হলেই সংশ্লিষ্ট কারবারের নাম-ঠিকানা নিবন্ধকের রেজিস্টার বইতে তালিকাভুক্ত হয়ে যায় এবং একেই অংশীদারি। কারবারের নিবন্ধন বলা হয় অংশীদারি চুক্তিপত্র নিবন্ধনের ফলে তা আইনসঙ্গত দলিলরূপে স্বীকৃতি পায় এবং এর দ্বারা অংশীদারি কারবার তার বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে।

অংশীদারি কারবার নিবন্ধনের জন্য যে কোন দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে অংশীদারি আইনে উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী অংশীদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রারের নিকট নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট ফিসহ আবেদন করতে হয়। উক্ত আবেদনপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে।

১। কারবার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা;
২। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য;
৩। ব্যবসায়ের প্রধান কার্যস্থল এবং অন্যান্য স্থানে কারবারের শাখা থাকলে সেসব স্থানের ঠিকানা;
৪। কারবার প্রতিষ্ঠার তারিখ;
৫। অংশীদারগণের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৬। প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে যোগদানের তারিখ;
৭। কারবারের মেয়াদ বা কার্যকাল।

উপরোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত আবেদনপত্রে কারবারের প্রত্যেক অংশীদারকে অথবা তাদের কক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে স্বাক্ষর করতে হয়। নিবন্ধক আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়াদি বিচার বিবেচনা করে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অংশীদারি কারবার সংগঠনের যাবতীয় নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালিত হয়েছে তখনই তিনি নিবন্ধন বইতে কারবারটির নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নেন। এভাবে একটি অংশীদারি কারবার নিবন্ধিত হয়ে থাকে।



## ২.২.৪ যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠনপ্রণালি (Formation of Joint Stock Company) ঃ

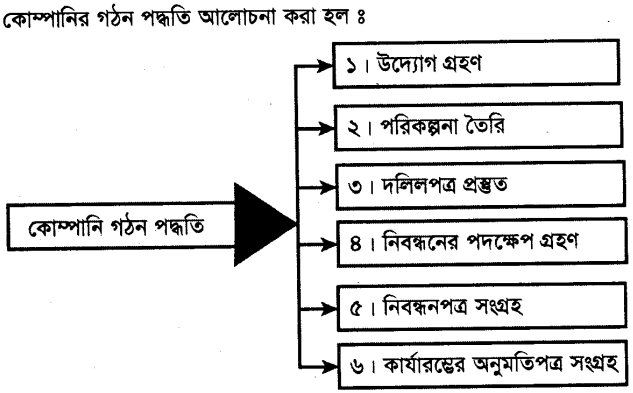

কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত হয়। এর গঠনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিচে কোম্পানির গঠন পদ্ধতি আলোচনা করা হল ঃ




**১। উদ্যোগ গ্রহণ (Initiation) ঃ** কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তিকে উদ্যোগী হয়ে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে কোম্পানি সংস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন তাদেরকে উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলা হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়।

**২। পরিকল্পনা তৈরি (Preparing plan) ঃ** উদ্যোগ গ্রহণের পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির জন্য একটি বাস্তবানুগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন, সম্ভাব্য প্রাথমিক খরচ, প্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা, শেয়ারের সংখ্যা, শেয়ারের মূল্য, সম্ভাব্য লভ্যাংশের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

**৩। দলিলপত্র প্রস্তুত (Preparing documents) ঃ** এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র যথা– (ক) সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ এবং (খ) সংঘ-বিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি প্রস্তুত করতে হয়।

**(ক) সংঘ স্মারক বা পরিমেল বন্ধ (Memorandum) ঃ** সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ কোম্পানির মূল দলিল। এতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন দায় ইত্যাদির বর্ণনা থাকে।

**(খ) সংঘ-বিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles) ঃ** এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানির দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির বিবরণ থাকে। অর্থাৎ কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হবে তা এই দলিলে উল্লেখ থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সংঘ-বিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি থাকা বাধ্যতামূলক নয়; এক্ষেত্রে কোম্পানি আইনে বর্ণিত 'তফসিল-১'-এ বিধৃত প্রবিধানসমূহ গ্রহণ করলেই চলে।

**৪। নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ (Taking initiative of incorporation) ঃ** প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুতের পর উদ্যোক্তাগণকে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের দপ্তর হতে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ তা কোম্পানির নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলগুলো দাখিল করতে হয় ঃ

(ক) কোম্পানির সংঘ-স্মারক ১ কপি।

(খ) কোম্পানির সংঘ-বিধি ১ কপি। তবে কোম্পানি আইনের 'তফসিল ১'-এ বর্ণিত প্রবিধানসমূহকে কোম্পানির সংঘবিধি হিসেবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র উদ্যোক্তাগণকে দাখিল করতে হবে।

(গ) কোম্পানির পরিচালক হবার জন্য সম্মতি প্রদানকারী ব্যক্তিগণের একটি তালিকা ।

(ঘ) পরিচালক হিসেবে কাজ করার জন্য একটি লিখিত সম্মতিপত্রে নিজের স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র অথবা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

(ঙ) পরিচালক হিসেবে কোম্পানির নিকট হতে যোগ্যতাসূচক শেয়ার গ্রহণ এবং তার মূল্য পরিশোধ করার নিমিত্ত একটি লিখিত চুক্তিপত্র।

(চ) পরিচালক কর্তৃক তার যোগ্যতাসূচক শেয়ারের কম নয় এমন সংখ্যক শেয়ার তার নামে নিবন্ধীকৃত করা হয়েছে এই মর্মে একটি এফিডেবিট।

(ছ) কোম্পানি আইনের যাবতীয় শর্ত বা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে– এই মর্মে হাইকোর্টের একজন এডভোকেট বা কোম্পানির সংঘ-বিধিতে কোম্পানির পরিচালক, ম্যানেজার বা সচিব হিসেবে যার নাম উল্লিখিত আছে এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

**৫। নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ (To collect certificate of Incorporation) ঃ** উল্লিখিত দলিলপত্রসমূহ নিবন্ধকের নিকট দাখিল করার পর এদের সম্পর্কে নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাতে কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালিত হয়েছে, তাহলে তিনি তা সংরক্ষণ করবেন এবং এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন যে, উক্ত কোম্পানি নিগমিতকরণ (Incorporated) হয়েছে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিগমিতকরণের প্রত্যয়নপত্র বা নিবন্ধন পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের কারবার কার্য শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ব্যবসায় আরম্ভ করতে হলে কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট হতে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

**৬। কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ (To collect certificate of commencement) ঃ** কোম্পানিকে কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত বিধানগুলো পালন করতে হয় ঃ

(ক) কোম্পানির পরিচালকগণকে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রির নিমিত্তে বিবরণপত্র তৈরি ও প্রচার করতে হবে।

(খ) কোম্পানিকে দেখাতে হবে যে–

(i) ন্যূনতম মূলধন গৃহীত হয়েছে;

(ii) প্রত্যেক পরিচালক তাঁর ক্রীত শেয়ারের অর্থ প্রদান করেছেন।

(গ) সব শর্ত পালিত হয়েছে এ মর্মে পরিচালকের সত্যায়নসহ ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঘ) কোম্পানি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র বা প্রসপেক্টাস প্রচার না করে থাকলে এর পরিবর্তে বিবৃতি বা প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।

উপরোক্ত বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করা হলে নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রার এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন যে, উক্ত কোম্পানি এর কার্যাবলি আরম্ভ করার অধিকার। নিবন্ধকের নিকট হতে ব্যবসায় আরম্ভের অনুমতিপত্র লাভের পর হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পূর্ণভাবে কাজ-কারবার আরম্ভ করতে পারে।

## ২.২.৪.১ যৌথ মূলধনী কারবারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Joint Stock Company) ঃ

মালিকানা, দায়, গঠন, প্রকৃতি প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে যৌথমূলধনী কারবারকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায় ঃ

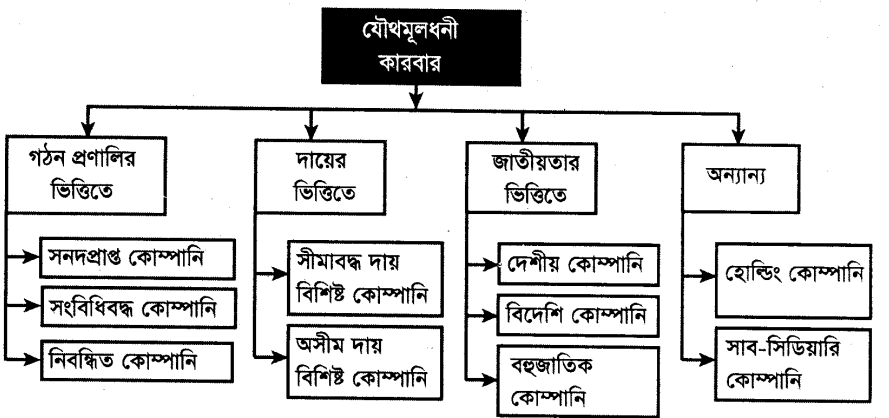


**(ক) গঠনপ্রণালির ভিত্তিতে (Company on the basis of Formation) ঃ**

**১। সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি (Chartered company) ঃ** দেশের সরকার প্রধান বা রাজকীয় সনদ বলে সৃষ্ট কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে।

**২। সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি (Statutory company) ঃ** জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে সরকারের আইন প্রণয়নকারী পরিষদের বা সংসদে বিশেষ আইন পাস করিয়ে যে কোম্পানি গঠন ও পরিচালনা করা হয় তাকে সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

**৩। নিবন্ধিত কোম্পানি (Registered company) ঃ** কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানিকে বলা হয় নিবন্ধিত কোম্পানি।

**(খ) দায়ের ভিত্তিতে কোম্পানি (Company on the basis of liability) ঃ**

**১। সীমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানি (Company with limited liability) ঃ** এ ধরনের কোম্পানির সদস্যদের দায় নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

**২। অসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি (Company with unlimited liability) ঃ** যে কোম্পানির সদস্যদের দায়ে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, তাকে অসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি বলে।

**(গ) সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে কোম্পানি (Company on the basis of number of members) ঃ**

**১। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private limited company) ঃ** যে কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য আহবান নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ৫০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

**২। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public limited company) ঃ** যে কোম্পানির শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য ও সদস্য সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

**(ঘ) মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি (Company on the basis of ownership) ঃ**

**১। সরকারি কোম্পানি (Government company) ঃ** যে কোম্পানির শেয়ার মালিকানার ৫১% বা তার বেশি সরকারের থাকে তাকে সরকারি কোম্পানি বলে।

**২। বেসরকারি কোম্পানি (Non-Government company) ঃ** যে কোম্পানির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোনো অংশগ্রহণ থাকে না তাকে বেসরকারি কোম্পানি বলে।

**(ঙ) জাতীয়তার ভিত্তিতে কোম্পানি (Company based on nationality) ঃ**

**১। দেশিয় কোম্পানি (Domestic company) ঃ** দেশে প্রচলিত কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোনো কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হলে তাকে দেশিয় কোম্পানি বলে।

**২। বিদেশি কোম্পানি (Foreign company) ঃ** এক দেশের গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানি অন্য কোনো দেশে ব্যবসা করলে তাকে বিদেশি কোম্পানি বলে।

**৩। বহুজাতিক কোম্পানি (Multinational company) ঃ** এক বা একাধিক দেশের মালিকানায় কোনো কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হলে তাকে বহুজাতিক কোম্পানি বলে।

**(চ) অন্যান্য কোম্পানি (Miscellanceous company) ঃ** উল্লিখিত কোম্পানিগুলো ছাড়াও আরও কিছু কোম্পানি রয়েছে। যথা– হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ইত্যাদি।

## ২.২.৫ যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি (Memorandum of Association of Joint Stock Company) ঃ

যে দলিলে যৌথ মূলধনী কারবারের নাম-ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, ক্ষমতা, মূলধন ও মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে তাকে সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি বলা হয়। এটি যৌথ মূলধনী কারবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সংঘ-স্মারক ছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হতে পারে না। এর মাধ্যমে কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই একে কোম্পানির গঠনতন্ত্র বলা হয়। এতে কোম্পানি নিবন্ধনের শর্তাবলী উল্লেখ থাকে এবং এটি কোম্পানির গণ্ডি নির্ধারণ করে। এ গণ্ডির বাইরে কোম্পানি কোন কার্য সম্পাদন করতে পারে না।

**১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২.১(ফ)** ধারায় বলা হয়েছে, সংঘ-স্মারক বলতে এই আইনের বিধানানুসারে প্রণীত কোম্পানির মূল সংঘ-স্মারক বা পরবর্তীতে এর সংশোধিত রূপকে বুঝাবে।

ইংল্যান্ডের একটি প্রখ্যাত মামলা Ashbury Railway Carriage Co. Vs. Riche-এর রায়ে বলা হয়েছে যে, স্মারকলিপি হল কোম্পানির সনদস্বরূপ এবং এতে এর কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট থাকে"।

**চার্লস ওয়ার্থের (Charles worth)—** মতে, "সংঘ-স্মারক হচ্ছে নিবন্ধিত কোম্পানির সনদ, যা কোম্পানির ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে।"

সুতরাং, সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি হচ্ছে কোম্পানির মূল ভিত্তিস্বরূপ। এরই ওপর ভিত্তি করে যৌথ মূলধনী কারবারের সামগ্রিক কাঠামো তৈরি হয়। স্মারকলিপিতে বর্ণিত ক্ষমতার বাইরে কোম্পানি কোন কাজ করলে তা বেআইনী হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই এ দলিল প্রণয়নকালে কোম্পানির প্রবর্তকগণকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কোম্পানি আইনানুসারে ঘরোয়া যৌথ মূলধনী কারবার বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই জন এবং সাধারণ সসীমদায় যৌথ মূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বেলায় কমপক্ষে সাত জন প্রবর্তককে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করতে হয়। স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বা ধারাগুলো বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে এবং এটি ছাপানো হয়।

## ২.২.৬ সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বা ধারাসমূহ (Contents of Memorandum of Association) ঃ

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে সংঘ স্মারকে নিম্নলিখিত ধারা বা বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে ঃ

১। কোম্পানির নাম,
২। কারবারের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান ও ঠিকানা,
৩। কারবারের উদ্দেশ্য,
৪। দায়,
৫। মূলধনের পরিমাণ,
৬। প্রবর্তকগণের সম্মতি।

**১। নাম ধারা (Name Clause) ঃ** সংঘ স্মারকে প্রথমেই কোম্পানির নাম উল্লেখ করতে হয়। কোম্পানির দায় সীমিত হলে নামের 'লিমিটেড' আর কোম্পানিটি প্রাইভেট হলে নামের শেষে 'প্রাইভেট লিঃ' শব্দগুলো যোগ করতে হয়। কোম্পানি কার্যরত কোন কোম্পানির নাম ব্যবহার করতে পারবে না। সরকারী অনুমোদন ছাড়া রাজা, রাণি, সম্রাট, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী অথবা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বুঝায় এমন কোন শব্দ কোম্পানির নামে ব্যবহার করা যাবে না।

**২। অবস্থান ও ঠিকানা ধারা (Situation and address clause) ঃ** কোম্পানির নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা এবং কোন্ এলাকায় তা অবস্থিত থাকবে তার উল্লেখ এ ধারায় বর্ণিত থাকবে।

**৩। উদ্দেশ্য ধারা (Object clause) ঃ** স্মারকলিপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল উদ্দেশ্য ধারা। এতে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যাবলি বর্ণিত থাকে। এ ধারার কার্যক্ষেত্রের বাইরের কোন কাজ কোম্পানি করতে পারে না। স্মারকলিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। তাই প্রবর্তকরা অতি সাবধানতার সাথে ভবিষ্যতেও যে যে সম্ভাব্য ব্যবসায়ে এর কার্যক্ষেত্র বিস্তার লাভ করতে পারে এমন সব উদ্দেশ্যাবলীও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

**৪। দায় ধারা (Liability clause) ঃ** এ ধারায় শেয়ার হোল্ডারদের দায়-দায়িত্বের প্রকৃতি উল্লেখ থাকে। শেয়ারহোল্ডারদের দায় ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে, না প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে তার স্পষ্ট উল্লেখ করতে হয়।

**৫। মূলধন ধারা (Capital clause) ঃ** স্মারকলিপির এ ধারায় কোম্পনির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয় এবং তা কত প্রকার শেয়ারে বিভক্ত হবে। প্রতি শেয়ারের মূল্য কত হবে তারও উল্লেখ থাকে।

**৬। সম্মতি ধারা (Consent clause) ঃ** কোম্পানির প্রাথমিক পরিচালকগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করে পরিচালক হিসেবে কাজ করার সম্মতির উল্লেখ এ ধারায় থাকে। এটি স্মারকলিপির সর্বশেষ ধারা। এ ক্ষেত্রে স্মারকলিপির শেষ অংশে কোম্পানির প্রবর্তকগণ এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করে যে, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির পরিচালক হতে এবং কোম্পানি গঠন করতে সম্মত আছে। প্রত্যেক প্রবর্তক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে সম্মত হয় তা তাদের প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করতে হয়।

## ২.২.৭ কোম্পানির সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association of Joint Stock Company) ঃ

যে দলিলের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে তাকে কোম্পানির সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি বলে। এতে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, ক্ষমতা এবং পরিচালকের অধিকার, ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়সহ কারবারের কাজ-কর্মের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। এটি স্মারকলিপির অধীন একটি দলিল। সাধারণত স্মারকলিপিতে যে সব উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকে সে সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কীরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তাই লিপিবদ্ধ থাকে।

**১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২.১(প) ধারায়** বলা হয়েছে, "সংঘ-বিধি (Articles) বলতে তফসিল ১-এ বিধৃত যতটুকু কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ততটুকুসহ এ কোম্পানির সংঘবিধিকে বুঝাবে।"

**বিচারপতি লর্ড কেয়ার্ন (Lord cairns)**-এর মতে, "পরিমেল নিয়মাবলি হল কোম্পানির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যাতে পরিচালকদের ক্ষমতা, অধিকার কর্তব্য বর্ণিত থাকে; কারবার পরিচালনার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়মাবলি, পরিবর্তনের নীতি পদ্ধতি বর্ণিত হয়।"

কোম্পানি আইন অনুসারে সাধারণ সসীমদায় কোম্পানি ছাড়া সীমাহীন দায়বদ্ধ কোম্পানি, জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি এবং শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রাইভেট কোম্পানিকে পরিমেল নিয়মাবলি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করে অবশ্যই নিবন্ধিত করতে হয়। সাধারণ সসীমদায় বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কোম্পানি আইনে বর্ণিত 'তফসিল-১' গ্রহণ করলেই চলে।

সংঘবিধি মুদ্রিত হতে হয় এবং তা কতগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। কোম্পানির সংঘ-স্মারকে বা স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক এটি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

## ২.২.৮ সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির উদ্দেশ্য (Objects of Articles of Association) ঃ

সংঘ-স্মারকে সন্নিবেশিত যৌথ মূলধনী কারবারের উদ্দেশ্যাবলি কী উপায়ে অর্জন করা যায় তার নির্দেশনা প্রদানই সংঘবিধির মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সংঘ বিধি তৈরি করা হয় ঃ

১। সুষ্ঠুভাবে কোম্পানির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা,
২। অভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত রীতি ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা,
৩। শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ করে কোম্পানির মূলধনের বিন্যাস,
৪। সংঘ স্মারক বা স্মারকলিপির ধারাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
৫। পরিচালকদের ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব, অধিকার ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ব্যাখ্যা,
৬। কোম্পানির কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পারিশ্রমিক, ক্ষমতা ও কর্তব্য নিরূপণ,
৭। কোম্পানির সভা সংক্রান্ত বিষয়াদির নিয়মকানুন লিপিবদ্ধকরণ,
৮। কোম্পানির সীলমোহর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধকরণ,
৯। লভ্যাংশ প্রদানের নিয়ম-কানুন স্থির ও উল্লেখ,
১০। কোম্পানির বিলোপ সাধনের জন্য অনুসৃত পদ্ধতির উল্লেখ, ইত্যাদি।

## ২.২.৯ পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু (Contents of Articles of Association) ঃ

যৌথ মূলধনী কারবারের অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সকল বিষয় পরিমেল নিয়মাবলিতে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণত যে সকল বিষয় পরিমেল নিয়মাবলিতে উল্লেখ করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১। কোম্পানির নাম, ঠিকানা ও অবস্থান।
২। কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার নিয়মকানুন ও পদ্ধতি।
৩। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা ও পেশা।
৪। পরিচালকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা।
৫। পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ারের সংখ্যা ও এর মূল্য।
৬। পরিচালক নির্বাচনের পদ্ধতি তাদের কার্যকাল পারিশ্রমিক
৭। ব্যবস্থাপক ও সচিব নিয়োগের পদ্ধতি।
৮। কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ।
৯। মূলধনের শ্রেণিবিভাগ ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ।
১০। মোট শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ।
১১। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য শেয়ার বিলি-বণ্টন পদ্ধতি।
১২। শেয়ারের মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি।
১৩। শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম-পদ্ধতি।
১৪। শেয়ার তলবের নিয়ম এবং বিভিন্ন কিস্তিতে প্রদেয় টাকার পরিমাণ।
১৫। শেয়ারের হস্তান্তর ও আইনানুগ স্বত্বান্তরের নিয়মাবলি।
১৬। মূলধন পরিবর্তনের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন।
১৭। শেয়ার মালিকদের অধিকার ও ক্ষমতা।
১৮। লভ্যাংশ ঘোষণা ও তার বণ্টনের পদ্ধতি।
১৯। হিসাব রক্ষণ ও হিসাবপত্র নিরীক্ষণ পদ্ধতি।
২০। হিসাব নিরীক্ষকদের নাম ও ঠিকানা।
২১। কোম্পানির বিভিন্ন সভা আহবান ও পরিচালনার নিয়মাবলি।
২২। সভানুষ্ঠানের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা বা কোরাম।
২৩। সভায় ভোট গ্রহণ পদ্ধতি ও সদস্যদের ভোটাধিকার।
২৪। কোম্পানির সীলমোহর সংরক্ষণ ও তা ব্যবহারের নিয়ম।
২৫। কোম্পানির ব্যাংকের নাম - ঠিকানা।
২৬। কোম্পানির সলিসিটর, দালাল ও ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিদের নাম ও ঠিকানা।
২৭। কোম্পানির বিলোপ সাধন পদ্ধতি, ইত্যাদি।

## ২.২.১০ বিবরণপত্র কী (What is Prospectus) ঃ

সাধারণ সসীমদায় যৌথমূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রবর্তকগণ মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে পত্রের মাধ্যমে জণগণকে শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আহবান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র লাভের নিমিত্ত শেয়ার বিক্রির জন্য বিবরণপত্র প্রচার করা বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশে প্রবর্তিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে বিবরণপত্রের সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। কোম্পানি আইনের ১৪২ ধারানুসারে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত দলিল প্রষ্টাস বলে গণ্য।

**১৯১৩ সালে কোম্পানির আইনের ২.১ (১৪) ধারায়** বিবরণপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বিবরণপত্র বলতে যে কোন প্রকারের বিবরণপত্র, বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র অথবা অন্য কোন আহ্বানকে বুঝায়, যা দ্বারা জনসাধারণের নিকট চাঁদা প্রদানের অথবা অন্য কোন কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করা হয়ে থাকে।"

বিবরণপত্র সাধারণত বিজ্ঞপ্তির আকারে সংবাদপত্রের প্রকাশ করতে হয় এবং এতে কোম্পানির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়সমূহের সঠিক বর্ণনা থাকে। এটি প্রচারের পূর্বে এর একটি অনুলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। এটি কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হয়।

### ২.২.১০.১ বিবরণপত্রের উদ্দেশ্য (Objectives of Prospectus) ঃ

সাধারণত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করা হয়ে থাকে, যথা ঃ

১। নব প্রতিষ্ঠিত কারবার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করানো,

২। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণকে জ্ঞাত করানো,

৩। জনসাধারণের নিকট হতে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো,

৪। জনগণকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ,

৫। কোম্পানির পরিচালনায় সুদক্ষ পরিচালকবৃন্দের বর্ণনা দিয়ে কোম্পানির প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন,

৬। বিবরণপত্রে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে পরিচালকদের দায়িত্ব সম্বন্ধীয় স্বীকৃতি তাদের কাছ থেকে আদায় করা,

৭। কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করে এর কপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা।

### ২.২.১১ সংঘ স্মারক বা স্মারকলিপি ও সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Memorandum of Association and Articles of Association) ঃ

সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি ও সংঘবিধি উভয়ই যৌথ মূলধনী কারবারের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এদের মধ্যে নিম্নলিখত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি | সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি |
|---|---|---|
| ১। প্রকৃতি | সংঘ স্মারক স্মারকলিপি কোম্পানির এমন একটি দলিল যাতে এর গঠন-সংক্রান্ত মৌলিক বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। | সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি এমন একটি দলিল যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়ম-নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। |
| ২। মর্যাদাগত অবস্থান | স্মারকলিপি যৌথমূলধনী কারবারের মূখ্য দলিল। | পরিমেল নিয়মাবলি যৌথমূলধনী কারবারের গৌণ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল। |
| ৩। বিষয়বস্তু | এতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, অবস্থান, উদ্দেশ্য, মূলধন, দায় ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। | এতে কোম্পানির পরিচালকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, পরিচালনের নীতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। |
| ৪। বিষয়বস্তুর বর্ণনা | স্মারকলিপিতে কারবারের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়। | পরিমেল নিয়মাবলিতে স্মারকলিপিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকে। |
| ৫। প্রণয়নের ভিত্তি | স্মারকলিপি কোম্পানির আইন অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হয়। | পরিমেল নিয়মাবলি কোম্পানি আইন ও স্মারকলিপি অনুযায়ী তৈরি করতে হয়। |
| ৬। নিবন্ধন | স্মারকলিপি প্রস্তুতের পর এর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। | পরিমেল নিয়মাবলির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। |
| ৭। সম্পর্ক | এর দ্বারা কোম্পানির সাথে তৃতীয়পক্ষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। | এর দ্বারা কোম্পানির অভ্যন্তরের পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। |
| ৮। বহির্ভূত বিষয় | পরিমেল নিয়মাবলির বহির্ভূত বিষয় স্মারকলিপিতে থাকতে পারে। | স্মারকলিপির বহির্ভূত কোন বিষয় পরিমেল নিয়মাবলিতে থাকতে পারে না। |
| ৯। পরিবর্তন | স্মারকলিপি পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়, এটি পরিবর্তনে আইনের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। এর পরিবর্তনের জন্য বিশেষ প্রস্তাব। ও আদালতের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। | পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন সহজসাধ্য। এটি পরিবর্তনে আইনের তেমন কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। কেবল বিশেষ প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই এর পরিবর্তন করা যায়। |
| ১০। গৃহীত শর্ত | কোন কারণে স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়বাবলীর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে স্মারকলিপির শর্তই গৃহীত হবে। | এক্ষেত্রে পরিমেল নিয়মাবলির শর্ত গৃহীত হয় না। |
| ১১। অপরিহার্যতা | প্রত্যেক কোম্পানির জন্য স্মারকলিপি থাকা বাধ্যতামূলক। | সব ধরনের কোম্পানির জন্য পরিমেল নিয়মাবলি থাকা বাধ্যতামূলক নয়। |

| পার্থক্যের বিষয় | সংঘ-স্মারক বা স্মারকলিপি | সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি |
|---|---|---|
| ১২। দলিলের বিকল্প | এ দলিলের কোন বিকল্প নেই। | শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ যৌথ মূলধনী কারবার এ দলিলের বিকল্প হিসেবে কোম্পানির আইনে বর্ণিত 'তফসিল-১' গ্রহণ করতে পারে। |
| ১৩। কার্যক্ষেত্রের বৈধতা | এতে উল্লিখিত ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কোনক্রমেই বৈধ করা যাবে না। | এর আওতা বহির্ভূত কাজ সংঘ স্মারকের বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হলে বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে সংশোধনী এনে তাকে বৈধ করা যায়। |
| ১৪। সম্মতি ধারা | সংঘ-স্মারকের শেষ অংশে একটি সম্মতি ধারা সংযুক্ত থাকে। | পরিমেল নিয়মাবলিতে এরূপ কোন ধারা সংযোজন করা হয় না। |
| ১৫। সংবিধান | একে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। | একে সংবিধানের বিধান বলে গণ্য করা যেতে পারে। |

## ২.২.১২ সমবায় সমিতির গঠনপ্রণালি (Formation of Co-Operative Society) ঃ

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় সমিতি বিধি বা নিয়মাবলি দ্বারা গঠিত, পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিম্নে সমবায় সংগঠনের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল ঃ

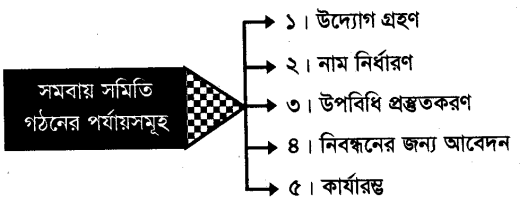


**১। উদ্যোগ গ্রহণ (Taking Initiative) ঃ** সমবায় সমিতি গঠনকল্পে প্রথমেই সমমনা সমস্বার্থ বিশিষ্ট কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে স্বেচ্ছায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।

**২। নাম নির্ধারণ (Fix-up name) ঃ** এ পর্যায়ে সমিতির জন্য উদ্যোক্তাগণ একটি নাম নির্ধারণ করবে। তবে বর্তমানে আছে এমন কোন নাম রাখা যাবে না। সীমিত দায় সমিতির ক্ষেত্রে এর নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দটি সংযোগ করতে হবে।

**৩। উপ-বিধি প্রস্তুতকরণ (Preparing by laws) ঃ** সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদেরকে সমিতির নিজস্ব উপবিধি (By-Laws) তৈরি করতে হয়। উপ-বিধিতে সমিতির সম্ভাব্য কার্যক্ষেত্র ঠিকানা, উদ্দেশ্যাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে। তাছাড়া, এতে সদস্য গ্রহণের শর্ত, সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, সভা সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন, হিসাবনিকাশ পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের অফিসে সমবায় সমিতির মুদ্রিত উপবিধি পাওয়া যায়। যে কোন নতুন সমবায় সমিতি উক্ত উপবিধি গ্রহণ করতে পারে অথবা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে।

**৪। নিবন্ধনের জন্য আবেদন (Applied for registration) ঃ** সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এজন্য নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রে উদ্যোক্তাদের নাম ও দস্তখত অবশ্যই থাকতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয় ঃ

(ক) প্রস্তাবিত সমিতির নিজস্ব উপবিধি - ২ কপি;

(খ) সমিতির নিজস্ব সীলমোহরের নমুনা এবং

(গ) সচিব ও উদ্যোক্তাদের সইকৃত প্রতিশ্রুতি-এ মর্মে যে, আবেদনপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে।

(ঘ) নিবন্ধক আবেদন পত্রটি এবং সংযুক্ত কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলে সমিতিটিকে নথিভুক্ত করেন এবং তাঁর স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল দিয়ে নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন।

**৫। কার্যারম্ভ (Commencement) ঃ** নিবন্ধকের কাছ থেকে নিবন্ধনপত্র লাভের সাথে সাথে সমিতি আইনগত সত্তা লাভ করে এবং তখন থেকেই তার নিজ নাম, সীলমোহর ব্যবহার করে ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে সমবায় সমিতি গঠন করতে হয়।

## ২.৩ এক মালিকানা, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of Sole Tradership, Partnership and Joint Stock Company) ঃ

### ২.৩.১ এক মালিকানা কারবারের সুবিধা (Advantages of Sole-Tradership Business) ঃ

এক মালিকানা কারবারের বিশেষ কতগুলো সুবিধা রয়েছে যা অন্য কোন কারবার প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় না। নিম্নে এক মালিকানা কারবারে সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

**১। গঠনের সরলতা (Easy formation) ঃ** এক মালিকানা কারবার গঠন কার্য খুব সহজ। এরূপ কারবার গঠনে কোন আইনগত জটিলতা নেই। মালিকের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলেই এরূপ কারবার স্থাপন করা যায়।

**২। সুষ্ঠু পরিচালনা (Efficiency in administration) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক স্বয়ং এর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে বলে কাজ শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

**৩। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও উদ্যম (Personal inspire & initiative) ঃ** এক মালিকানা কারবারে লাভ হলে মালিক একাই সমুদয় মুনাফা ভোগ করে। ফলে কারবার পরিচালনায় তার উদ্যম ও যত্নের শেষ থাকে না। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় কারবারের শ্রীবৃদ্ধি পায়।

**৪। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Promt decision making) ঃ** মালিক নিজে এ কারবারের সর্বেসর্বা এবং হর্তাকর্তা বলে কারবার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

**৫। মালিকের স্বাধীনতা (Freedom of owner) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনা করে নিজের এবং পরিবারবর্গের জীবিকার সংস্থান করতে সক্ষম হয়।

**৬। ব্যয় সংকোচ (Reduction cost) ঃ** অধিক মুনাফার জন্যে কারবারের মালিক সর্বদাই মিতব্যয়িতার সাথে তার কারবার পরিচালনায় সচেষ্ট হয়। ফলে কারবারে ব্যয় সংকোচ অর্জিত হয়।

**৭। নমনীয়তা (Flexibility) ঃ** এরূপ কারবারে মালিক ও নিয়ন্ত্রক এক ব্যক্তি হওয়ায় পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে কারবারের নীতি বা প্রকৃতি রদবদল করতে পারে।

**৮। গোপনীয়তা রক্ষা (Maintaining secrecy) ঃ** কারবারের উন্নতির জন্য অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। এক মালিকানা কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে বলে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুব সহজ।

**৯। ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal relation) ঃ** এরূপ কারবারে মালিকের সঙ্গে কর্মচারীদের, ভোক্তাদের এবং সরবরাহকারীদের একটি ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

**১০। ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ (Opporturities to get credit) ঃ** এরূপ কারবারের দায় অসীম বলে এবং মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ঋণের জন্য দায়ী থাকে বলে কারবারের পক্ষে ঋণ পাওয়া সহজ হয়।

**১১। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন (Showing personal creativity) ঃ** কোন জিনিস উৎপাদনে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের এটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের এটাই একমাত্র ক্ষেত্র।

**১২। স্বল্প খরচে হিসাবরক্ষণ (Maintaining accounts with little cost) ঃ** এরূপ কারবারের হিসাবরক্ষণে আইনের কড়াকড়ি নেই বিধায় মালিক স্বল্প ব্যয়ে ইচ্ছামত হিসাবপত্র রাখতে পারে।

**১৩। সুনাম অর্জনের সুবিধা (Opportunities to get reknown) ঃ** কারবার ও মালিকের সত্তা অভিন্ন বিধায় মালিককে খুব সাবধানে কাজ করতে হয়। তার নিষ্ঠা, কর্মশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সহজেই কারবারের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে এরূপ কারবারে সুনাম অর্জন ও বজায় রাখা সহজ।

**১৪। সামাজিক সুবিধা (Social facility) ঃ** ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট এ কারবার মহানগরী থেকে সুদুর পল্লী পর্যন্ত যে কোন স্থানে গড়ে উঠতে পারে। ফলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজে সংগ্রহ করতে পারে।

**১৫। কর্মসংস্থান (Enployment) ঃ** এরূপ কারবারে শুধু মালিকেরই কর্মসংস্থান হয় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

**১৬। বৃহৎ কারবারের গোড়াপত্তন (Based of large business) ঃ** এক মালিকানা কারবার ক্ষুদ্র আকারে শুরু হলেও এর সাফল্য দেখা দিলে মালিক এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বৃহদাকার কারবারে পরিণত করতে পারে।

**১৭। করের সুবিধা (Tax facilities) ঃ** এ কারবারের মালিক ব্যক্তিগতভাবে কর প্রদান করে বলে কারবারকে পৃথকভাবে কোন কর দিতে হয় না।

**১৮। মালিকানা হস্তান্তর (Transferability of ownership) ঃ** প্রয়োজনবোধে মালিক সামান্য আইন আনুষ্ঠানিকতা পালনের দ্বারা কারবারের মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে।

**১৯। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি (Increase personal & social assets) ঃ** এরূপ কারবার ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের উৎসাহ দিয়ে পুঁজি সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তিগত তথা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

**২০। সহজ বিলোপ সাধন (Easy dissolution) ঃ** মালিক সহজেই ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এরূপ কারবারের বিলোপ ঘটাতে পারে। এর জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয় না।

ক্ষুদ্রায়াতন সংগঠন হিসেবে পৃথিবীর সকল স্থানে অন্যান্য কারবারের তুলনায় অজস্র এক মালিকানা কারবার গড়ে উঠার অন্যতম কারণসমূহ হচ্ছে এর সুবিধাসমূহ এবং এ সকল সুবিধার জন্যই এ কারবার আজ বিশ্বে জনপ্রিয়তার শিখরে অবস্থিত।

## ২.৩.২ এক মালিকানা কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Sole-Tradership Business) ঃ

সুবিধাসমূহের পাশাপাশি এক মালিকানা কারবারের কতগুলো সুবিধাও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

**১। সীমিত মূলধন (Limited capital) ঃ** এক মালিকানা কারবারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল মূলধনের সীমাবদ্ধতা। বহু লোকের তুলনায় এক ব্যক্তির ক্ষমতা সীমিত। এক মালিকের পক্ষে অধিক মূলধন যোগানো কঠিন।

**২। সীমিত কর্মশক্তি (Limited working ability) ঃ** ব্যক্তি বিশেষের কর্মশক্তি সব সময়ই সীমাবদ্ধ। কর্মশক্তি ও কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতাহেতু এক মালিকানা কারবার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

**৩। সীমাহীন দায় (Unlimited liability) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিকের দায়-দায়িত্বের কোন সীমারেখা নেই। কারবারের দেনার দায়ে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিলামে চড়তে পারে।

**৪। স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা (Lack of stability)) ঃ** এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। মালিক হঠাৎ মারা গেলে কারবারেরও বিলুপ্তি ঘটে।

**৫। বিশেষায়নের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ (Limited scope for expansion) ঃ** কারবার পরিচালনায় যে বহুমুখী প্রতিভা প্রয়োজন তা এক ব্যক্তির মধ্যে সমাবেশ ঘটান কঠিন। অতএব বিশেষায়নের ক্ষেত্র এতে সীমাবদ্ধ।

**৬। বৃহৎ কারবারের অনুপযুক্ত (Limited scope for large business) ঃ** কারবার বৃহৎ হলে এক ব্যক্তির পক্ষে সঠিকভাবে চালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এরূপ কারবারে সুযোগ থাকলেও এর সম্প্রসারণ এগুতে পারে না।

**৭। মালিকের খামখেয়ালীপনা (Whims mentality of the owner) ঃ** মালিক যেমন সুদক্ষ হলে কারবারের উন্নতি হয়, তেমনি তার খামখেয়ালীপনার জন্য এ ধরনের কারবারের অবনতি ঘটে।

**৮। সীমিত আয়তন (Little size) ঃ** পুঁজি কম বলে এ কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র হয়। ফলে এ কারবার বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

**৯। সম্প্রসারণের অসুবিধা (Lack of expansion) ঃ** পুঁজি ও পরিচালন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দরুন এ কারবারের সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

**১০। অধিক ব্যক্তিগত ঝুঁকি (Unlimited sole risk) ঃ** কারবারের সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও দেনা মালিক নিজেই বহন করে। ভুল-ত্রুটি হলে তাকেই সম্পূর্ণ মাশুল দিতে হয়।

**১১। ব্যবস্থাপনার সমস্যা (Problems in management) ঃ** মালিক একাই ব্যবস্থাপনার বিবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এদিক থেকে কারবারকে প্রায়ই বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হয়।

**১২। কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব (Lack of opportunities to the staff) ঃ** ক্ষুদ্র আকারের কারবার প্রতিষ্ঠান বলে কর্মীরা বৃহৎ কারবারের সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের পদোন্নতির সুযোগও থাকে না।

**১৩। সামাজিক মর্যাদার অভাব (Lack of social status) ঃ** আইনগত সত্তার অভাবে এ কারবার সামাজিক মর্যাদা পায় না। ফলে মানুষ একে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

**১৪। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র (Limited scope) ঃ** বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্র ছাড়া এ কারবার সুবিধা করতে পারে না।

**১৫। বিপর্যয় (Disaster) ঃ** একই মালিকের একাধিক কারবার থাকলে কোন একটির বিপর্যয় ঘটলে অন্যগুলোর উপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

## ২.৩.৩ অংশীদারি কারবারের সুবিধা (Advantages of Partnership Business) ঃ

অংশীদারি কারবারের কতকগুলো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

**১। সহজ গঠন (Easy formation) ঃ** অংশীদারি কারবার সহজেই গঠন করা যায়। এ কারবার গঠনে আইনগত কোন ঝামেলা নেই। কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ ধরনের কারবার গঠন করতে পারে।

**২। অধিক মূলধন (Huge capital) ঃ** এক মালিকানা কারবারের তুলনায় অংশীদারি কারবারের মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা বেশি। অংশীদারিতে একাধিক সদস্য থাকে বলেই এটা সম্ভব। প্রয়োজনে নতুন অংশীদার গ্রহণ করে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

**৩। ঋণ গ্রহণের সুবিধা (Facilities of loan) ঃ** কারবারের দায়ের জন্য অংশীদাররা একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকে। এ অবস্থা পাওনাদারদের জন্য সুবিধাজনক। তারা ফার্ম থেকে পাওনা আদায় না করতে পারলেও যে কোন অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করতে পারবে। তাই অংশীদারি কারবারের পক্ষে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করা সহজ।

**৪। ঝুঁকি বন্টন (Sharing risk) ঃ** এরূপ কারবারের ঝুঁকি সকল অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত হয়। মুনাফা হলে যেমন তারা সকলে ভোগ করে তেমনি লোকসান হলেও তা সকলের মধ্যে বন্টন হয়।

**৫। দক্ষ পরিচালনা (Efficient management) ঃ** এরূপ কারবারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের সমাবেশ ঘটে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে অংশীদাররা সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে। ফলে কারবারের উন্নতি হয়।

**৬। প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা (Direct motivation) ঃ** অংশীদারগণ কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং এর মুনাফা বাড়লে তারাই অংশ পায়। ফলে তারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয় যা কারবারের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক।

**৭। অসীম দায়ের পরোক্ষ ফল (Indirect facilities of unlimited liabilities) ঃ** অংশীদারি কারবারের দায় অসীম বলে অংশীদারগণ কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ফলে কারবারের সফলতা অর্জিত হয়।

**৮। যৌথ সিদ্ধান্ত (Combined decision) ঃ** কথায় বলে, দু'টি মাথা একটি মাথার চেয়ে ভাল (Two heads is better than one) অংশীদারি কারবারে দক্ষ ব্যক্তিরা সমবেত হয় এবং আলাপ-আলোচনা করে যৌথভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছে। যৌথ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই একক সিদ্ধান্তের চেয়ে শ্রেয়।

**৯। মিতব্যয়িতা (Economy) ঃ** অংশীদাররা নিজেরাই কারবারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তারা মিতব্যয়িতা অর্জনের লক্ষ্যে অতীব যত্ন সহকারে কারবার পরিচালনা করে। ফলে কারবারের আয় বৃদ্ধি পায়।

**১০। নব উদ্দীপনা সংযোগ (Add new creativity) ঃ** অংশীদাররা একমত হয়ে নতুন অংশীদার নিয়ে কারবারে নতুন উদ্যম ও দক্ষতা সংযোগ করে কারবারের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে।

**১১। সুনাম বৃদ্ধি (Increase of good will) ঃ** অংশীদারগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কারবারের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারে।

**১২। উত্তোলনের সুযোগ (Withdrawn facilites) ঃ** এ কারবারের বিশেষ সুবিধা হল প্রয়োজনে অংশীদাররা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে কারবার থেকে মূলধন বা মুনাফা উত্তোলন করার সুযোগ পায়।

**১৩। নমনীয়তা (Flexibility) ঃ** অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের সকলের সম্মতিক্রমে কারবার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিলোপ সাধন সবই অনায়াস সাধ্য।

**১৪। গোপনীয়তা রক্ষা (Lack of secrecy) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের তুলনায় অংশীদারি কারবারে অধিক গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

**১৫। করের সুবিধা (Tax facilities) ঃ** অংশীদারি কারবার আয়কর ও অন্যান্য করের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। কারণ অংশীদাররা ব্যক্তিগতভাবে নিজের আয়ের উপর কর প্রদান করে বলে প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ কম পড়ে।

**১৬। বিশেষায়নের সুবিধা (Facilities of diversification) ঃ** মালিকের সংখ্যা একাধিক বলে সমস্ত কাজকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বিভিন্ন জন দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে।

**১৭। দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ (Appoint efficient employee) ঃ** এরূপ কারবারের আর্থিক অবস্থা কিছুটা উন্নত বলে এটিতে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করে কার্যের মান বৃদ্ধি করতে পারে।

**১৮। অধিক প্রচার (Huge advertisement) ঃ** সভ্যসংখ্যা অধিক এবং জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কারণে অংশীদারি কারবার অধিক প্রচারের সুবিধা ভোগ করে থাকে।

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, একটি মধ্যম মানের কারবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশীদারি কারবার যথেষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে।

## ২.৩.৪ অংশীদারি কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Partnership Business) ঃ

অংশীদারি কারবারের সুবিধাগুলোর পাশাপাশি অনেকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। অসুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচিত হল ঃ

**১। অসীম দায় (Unlimited liability) ঃ** অংশীদারি কারবারের দায় অসীম। কারবারের দেনার জন্য সকল অংশীদাররাই দায়ী, একজনের ভুল চুক্তির জন্য সকল অংশীদরকে ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং কারবারের দেনার জন্য অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়বদ্ধ থাকে।

**২। অনিশ্চিত স্থায়িত্ব (Unstability) ঃ** মতানৈক্য, দেউলিয়াত্ব, অসাধুতা, মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদির কারণে অংশীদারি কারবারের অবসান ঘটতে পারে। ফলে এ ধরনের কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিতের কুয়াশায় নিমজ্জিত থাকে।

**৩। বিশ্বাসের অভাব (Lack of trust) ঃ** অংশীদারি কারবারের জন্য যে সততা, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রয়োজন তা বর্তমান সমাজে বিরল। চরম বিশ্বাসের অভাবেই মূলত এরূপ কারবারের অকাল পতন ঘটে।

**৪। ঝুঁকির মাত্রা বেশি (Unlimited liability) ঃ** অসীম দায়ের কারণে অংশীদারি কারবার গঠনে ঝুঁকির মাত্রা অধিক বলে কম লোকই তা বহন করতে চায়।

**৫। বিশেষজ্ঞ নিয়োগে অক্ষম (Failure to appoint specialist) ঃ** এরূপ কারবারে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ কম পুঁজি ও ক্ষুদ্রায়তনের বলে তাদের বেতন দেবার সঙ্গতি এর থাকে না।

**৬। ব্যবস্থাপনায় যোগ্যতার অভাব (Lack of efficiency in management) ঃ** অংশীদারগণ নিজেরাই কারবারের ব্যবস্থাপনার ভার নেয়। কিন্তু তাদের সকলের যোগ্যতা বা দক্ষতা সমান নয়। ফলে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে অসাম্য দেখা দিতে পারে।

**৭। শেয়ার হস্তান্তরে বাধা (Restrictions on transfer of shares) ঃ** সাধারণত অংশীদাররা তাদের অংশ অন্যের কাছে হস্তান্ত র করতে পারে না। এটা বিনিয়োগকারীর পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক। ফলে অনেকে অংশীদারি কারবারে অংশ নিতে চায় না।

**৮। বৃহৎ কারবারের অনুপযুক্ত (Limited scope for large business) ঃ** কারবার গঠন ও পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান অংশীদারদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফলে অংশীদারি কারবার হিসেবে বৃহৎ কারবারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

**৯। জনগণের আস্থার অভাব (Lack of trust for public) ঃ** অংশীদারি কারবারের আইনগত সত্তা না থাকায় এবং এদের আর্থিক অবস্থা, গতিবিধি ইত্যাদি জনগণের গোচরীভূত না হবার দরুন এরূপ কারবারে তাদের আস্থা জন্মায় না।

**১০। কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের অভাব (Lack of centralized authority) ঃ** অংশীদারি কারবারের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ক্ষমতা প্রত্যেক অংশীদারের সমান। এর ফলে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠে না। অধিক সন্যাসীতে যেমন গাজন নষ্ট হয়, তেমনি খাপছাড়া পরিচালনার দরুন অনেক অংশীদারি কারবারের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

**১১। দ্রুত সিদ্ধান্তের অভাব (Lack of promt decision) ঃ** যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সকল অংশীদারদের সম্মতি প্রয়োজন। কথায় আছে, নানা মুনির নানা মত। সকলের একই সিদ্ধান্তে পৌছা সময় সাপেক্ষ। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্তের অভাবে কারবারের সাফল্য ব্যাহত হয়।

**১২। অসম মুনাফা বন্টন (Distribution unequal profit) ঃ** এ কারবারের বিশেষ একটা অসুবিধা হল অসম মুনাফা বন্টন। অনেক অংশীদার মূলধনের যোগান না দিয়েও লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

**১৩। অসৎ অংশীদার (Dishonest partner) ঃ** কোন অংশীদার অসৎ বা অদক্ষ হলে তার কুফল অন্য অংশীদারদেরকে ভোগ করতে হয় এবং তা কারবারের পতন ডেকে আনতে পারে।

**১৪। অপচয় বৃদ্ধি (Increase wastage) ঃ** ব্যক্তিগত তদারকি ও তত্ত্বাবধানের অভাবে অংশীদারি কারবারে সম্পদের অপচয় ঘটে থাকে।

**১৫। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অসুবিধা (Problem of usage modern technology) ঃ** স্বল্প মূলধন নিয়ে অংশীদারি কারবারে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব নয়।

**১৬। বিলোপ সাধনে ক্ষতি (Loss of dissolution) ঃ** অংশীদারি কারবার যে কোন সময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এতে অংশীদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কর্মচারীরা বেকারত্ব লাভ করে এবং ভোগকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে অর্থনীতিতে প্রতিকূল হাওয়া বয়।

## ২.৩.৫ যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Company) ঃ

যৌথমূলধনী কারবারের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। নিম্নে এর সুবিধাগুলো বর্ণিত হল ঃ

**১। মূলধনের প্রাচুর্য (Vast capital) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মূলধনের প্রাচুর্যতা। বহুলোকের মধ্যে এ কারবারের শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা থাকায় এটা সহজে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

**২। সীমিত দায় (Limited liability) ঃ** যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে শেয়ার-বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ সহজ হয়।

**৩। চিরস্থায়িত্ব (Perpetual succession) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার চিরস্থায়ী সংগঠন। কারবারের মালিকানা বা সদস্যপদের পরিবর্তনের ফলে কারবারি সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না বা কারবারের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

**৪। কম ঝুঁকি (Limited risk) ঃ** শেয়ার হোল্ডারদের দায় পরিমিত থাকায় তাদের ব্যক্তিগত ঝুঁকি কম।

**৫। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of shares) ঃ** এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বিধায় যে কেহ ইচ্ছা করলে নিজের সুবিধামত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

**৬। পুঁজি ও নিপুণতার সমন্বয় (Combination of capital & tacties) ঃ** পুঁজি ও ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা উভয়ের সমাবেশ এরূপ কারবারে সম্ভব। যাদের অর্থ আছে অথচ দক্ষতা নেই তারা এ কারবারে অর্থ খাটাতে পারে। আর যাদের অর্থ নেই অথচ দক্ষতা আছে তারা কারবার পরিচালনার সুযোগ নিতে পারে।

**৭। বিভিন্ন প্রকার শেয়ার (Different types of share) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রয় হয়ে থাকে বলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে।

**৮। আইনগত সত্তা (Legal entity) ঃ** এর আইনগত পৃথক সত্তা থাকায় এটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে সকলেই কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে সুবিধা পায়।

**৯। জনসাধারণের আস্থা (Public confidence) ঃ** আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম সত্তা বলে যৌথ মূলধনী কারবারের উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস থাকে।

**১০। গণতান্ত্রিক পরিচালনা (Democratic administration) ঃ** এরূপ কারবার পরিচালনা গণতান্ত্রিক বলে নতুন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ অনায়াসে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

**১১। সম্প্রসারণের সুযোগ (Scope for expansion) ঃ** অধিক মূলধন ও নিপুণ ব্যবস্থাপনার কারণে এ কারবার দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারে।

**১২। বৃহৎ কারবারের সুবিধা (Facilities of large business) ঃ** অধিক মূলধন, দক্ষ পরিচালনা ইত্যাদি কারণে এ কারবার বৃহদায়তন কারবারের প্রায় সকল সুবিধা ভোগ করে।

**১৩। কর্মসংস্থান (Employment) ঃ** এ কারবারের আয়তন বিশাল বলে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

**১৪। প্রতিযোগিতা (Competition) ঃ** বর্তমান বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। যৌথ কারবার যে কোন প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে পারে।

**১৫। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ (Invest foreign capital) ঃ** বিদেশী ব্যবসায়ীরা একমাত্র যৌথ মূলধনী কারবারেই তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।

**১৬। ঝুঁকি বণ্টন (Diversification of risk) ঃ** এরূপ কারবারের ঝুঁকি শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন হয়। ফলে এতে কাউকে এককভাবে অধিক দায় বহন করতে হয় না।

**১৭। সঞ্চয় (Saving) ঃ** এ ধরনের কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করে মালিক হওয়া যায় ও লভ্যাংশ পাওয়া যায়, যা মানুষের সঞ্চয়স্পৃহা বৃদ্ধি করে।

**১৮। গবেষণা (Research) ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার খুলে থাকে। এতে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণ উপকৃত হয়ে থাকে।

**১৯। উন্নয়ন (Development) ঃ** এ কারবার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প, বাণিজ্য গড়ে উঠে। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ মানবসেবায় নিয়োজিত হয়।

## ২.৩.৬ যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Joint Stock Company) ঃ

যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **জটিল গঠন (Complicated formation)** ঃ এর গঠনপ্রণালি অত্যন্ত জটিল। কোম্পানি আইনের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পালন করে এরূপ কারবার গঠন করতে হয়।

২। **একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি (Monopoly business)** ঃ বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই এ কারবারকে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই এ সংস্থা চড়াদামে পণ্য বিক্রয় করে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ায়।

৩। **মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন (Ownership is separate from controlling)** ঃ প্রকৃতপক্ষে এ কারবারের মালিক হচ্ছে শেয়ার হোল্ডাররা। কিন্তু, এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণভার থাকে কতিপয় পরিচালকের হাতে। অসাধু পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ ব্যবহার করে থাকে।

৪। **ধনতন্ত্র (Capitalism)** ঃ যদিও যৌথ মূলধনী কারবার আইনত গণতান্ত্রিক, কিন্তু বাস্তবে এটা ধনতন্ত্রের পরিচায়ক। গোটা কয়েক ব্যক্তির হাতেই পরিচালন ভার থেকে যায় এবং তাদের স্বার্থের কাছে সাধারণ শেয়ার ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

৫। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব (Delay in decision making)** ঃ এ কারবারকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় বিধায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় এবং দ্রুততার সাথে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না।

৬। **স্বজন পোষণ (Nepotism)** ঃ সুদক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তি নিয়োগ এ সমস্ত কারবারে কমই দেখা যায়, বরং পরিচালকদের স্বজন পোষণ নীতিই এরূপ কারবারে দেখতে পাওয়া যায়।

৭। **বিবাদ (Conflict)** ঃ মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় এসব কারবারে বিবাদ, বিসম্বাদ ও ধর্মঘট প্রায়ই লেগে থাকে।

৮। **আইনের কড়াকড়ি (Difficulties by law)** ঃ একে গোড়াপত্তন থেকে শুরু করেই নানাবিধ বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। ফলে সুষ্ঠু পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়।

৯। **গোপনীয়তার অভাব (Lack of secrecy)** ঃ যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালকদের বার্ষিক বিবরণীতে এর অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করতে হয়। এতে কারবারে গোপনীয়তা ব্যাহত হয়।

১০। **মালিক কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between owncr & stuff)** ঃ মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় কারবার পরিচালনায় অপচয়ের মাত্রা বেড়ে যায় এবং সস্তায় পণ্য উৎপাদন করা কল্পনামাত্র।

১১। **ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব (Lack of personal incentives)** ঃ মালিকানা থেকে নিয়ন্ত্রণ আলাদা থাকায় এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব দেখা যায়।

১২। **পরিচালন ব্যয় অধিক (Excess of administrative expenses)** ঃ বৃহদায়তন কারবার ও বৃহৎ সাংগঠনিক কাঠামোর কারণে এ কারবারের পরিচালন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেশি।

১৩। **অধিক করভার (Excessive of tax)** ঃ অন্যান্য কারবার প্রতিষ্ঠানের তুলনায় যৌথ মূলধনী কারবারকে অধিক হারে কর প্রদান করতে হয়।

১৪। **দূষিত পরিবেশ (Polluted environment)** ঃ বড় বড় কারবার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়ই দূষিত কারখানা পরিবেশ দৃষ্ট হয়। এখানে অনেক সময় অন্যায়, অনাচার, অনিয়মের প্রমাণ দেখা যায়।

১৫। **ফটকাবাজী (Speculation)** ঃ অনেক কারবারের পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুনাফার প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন ঘটায়। এতে সাধারণ লোকে শেয়ার ক্রয় করে প্রতারিত হয়।

## ২.৪ সমবায় সমিতির মূলনীতি (Principles of Co-Operative Society ) ঃ

কতগুলো বিশেষ ও অপরিহার্য নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলোকে সমবায়ের নীতি বলে। নিম্নে সমবায়ের মৌলিক নীতিসমূহ বর্ণনা করা হল ঃ

১। **একতা (Unity)** ঃ সমবায় সমিতি একতার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। কারণ এককভাবে যা করা সম্ভব হয় না একতাবদ্ধভাবে তা করা সম্ভব।

২। **সাম্য (Equality)** ঃ সাম্য সমবায়ের একটি মূলনীতি। সমবায় সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সমান।

**৩। সহযোগিতা (Co-operation) ঃ** সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যদের সকলের সহযোগিতা না পেলে এর অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

**৪। সততা (Honesty) ঃ** সমবায় সমিতিতে সততা একান্ত প্রয়োজন। সদস্যদের সততা ও ন্যায়নীতির উপরই সমবায়ের কৃতকার্যতা নির্ভর করে।

**৫। সেবার মনোভাব (Service motive) ঃ** সমবায় সংগঠন জনগণ ও গরীব সদস্যদের সেবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।

**৬। নৈকট্য (Proximity) ঃ** সমবায়ের সদস্যরা সাধারণত একই পেশা বা একই এলাকার অধিবাসী হলে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, যা সমিতির সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।

**৭। মিতব্যয়িতা (Economy) ঃ** এ প্রতিষ্ঠান দরিদ্র মানুষের অর্থে গঠিত হয় বলে সমিতির যাবতীয় অর্থ সম্পদ মিতব্যয়িতার সাথে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

**৮। বন্ধুত্ব (Friendship) ঃ** সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সমবায়ের বিশেষ মূলনীতি।

**৯। গণতন্ত্র (Democracy) ঃ** সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

**১০। ত্যাগ (Sacrifice) ঃ** সমবায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি হল পারস্পরিক সমঝোতা ও একে অন্যের জন্য ত্যাগের মনোভাব বজায় রাখা।

উপরোল্লিখিত নীতিগুলো পালনের মাধ্যমেই সমবায় সমিতি সাফল্যের দার গোড়ায় পৌছতে পারে।

**সমবায় সমিতির প্রকারভেদ (Types of Co-operative Society) ঃ** সমবায় সমিতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং তা নিম্নরূপ -

**(ক) সাধারণ শ্রেণিবিভাগ (General classification) ঃ** তিন প্রকার, যথা ঃ

১। উৎপাদক সমবায় সমিতি;

২। ক্রেতা বা ভোক্তা সমবায় সমিতি;

৩। ঋণদান সমবায় সমিতি।

**(খ) কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Work-based classification) ঃ** ছয় প্রকার, যথা ঃ

১। বিক্রয় সমবায় সমিতি

২। ক্রয় সমবায় সমিতি

৩। গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি

৪। সমবায় ব্যাংক

৫। বীমা সমবায় সমিতি

৬। বহুমুখী সমবায় সমিতি।

## ২.৫ বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা (Role of Co-Operative Society in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। এদেশের প্রায় শতকরা ৮০জন লোকই গ্রামে বাস করে এবং ন্যূনতম জীবনযাত্রা মানের নিচে অবস্থান করে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রাম্য জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করে গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিচে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ও ভূমিকা তুলে ধরা হল ঃ

**১। কৃষি উন্নয়ন (Development in agriculture) ঃ** সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকেরা যৌথভাবে চাষাবাদ করে, স্বল্প সুদে ঋণ সংগ্রহ করে, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

**২। সম্পদের সুষম বণ্টন (Proper distribution of resources) ঃ** সমবায় সমিতি সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত না করে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে তা সুষমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করে সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়তা করে।

**৩। স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহ (Supplying lower price) ঃ** সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তন ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করা যায় বিধায় কমমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

**৪। পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি (Insuring legal price) ঃ** সর্বাধিক শ্রম ও যত্নের সাথে সমবায়ের সদস্যগণ কাজ করে বলে উৎপাদন ও বণ্টন কার্যে ব্যয় সংকোচ অর্জিত হয়। ফলে কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় যা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়ক।

**৫। কর্মসংস্থান (Employment) ঃ** সমবায় সমিতি এর সদস্যবৃন্দ এবং বেকার লোকদের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

**৬। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন (Development small & cottage industry) ঃ** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে সমবায় সমিতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ সকল শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সমবায়ের মাধ্যমে মহাজন শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রেহাই পায়।

**৭। গৃহায়ন সমস্যা লাঘব (Solve housing problem) ঃ** শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকের আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পে সমবায় সমিতি স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করে, আবার কখনো বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ করে মানুষের বেঁচে থাকার নিরাপত্তার চাহিদা মেটায়।

**৮। পুঁজি গঠন (Capital formation) ঃ** সমবায় সমিতিতে গরিব জনগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিনিয়োগ সুবিধা থাকায় তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগে, যা দেশের পুঁজি গঠনে সাহায্য করে।

**৯। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Development of living standard) ঃ** সমবায় সমিতি সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের আর্থিক আয়ের সংস্থান করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

**১০। সহযোগিতা স্থাপন (Establish co-operation) ঃ** সমবায় সমিতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

**১১। সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Social peace & advance in economics) ঃ** সমবায় মানুষকে সততা, ত্যাগ বিশ্বাস ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। এতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মে না। ফলে জনগণ শান্তিতে কাজকর্ম করে আর্থিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ বিধানের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে থাকে। বিশেষ করে আমাদের মত দেশের দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং অর্থনৈতিক দূরবস্থা থেকে সমাজ তথা দেশকে রক্ষা করতে সমবায় একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম।

## ২.৫.১ উৎপাদক সমবায় সমিতি (Produceres Co-Operative Society) ঃ

স্বল্প বিত্তশালী ব্যক্তিগণ কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে যে সমিতি গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বা Producers Co-Operative Society বলে। এ ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যরা নিজেরাই মূলধনের যোগান দেয়, কাজ-কর্ম পরিচালনা করে, পণ্য তৈরি করে এবং লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। পণ্য সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয়ে মধ্যস্থ কারবারীর কোন প্রভাব খাটে না এ সমিতিতে। সাধারণত নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের এবং সমাজের জনগণের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের নিমিত্তে এ প্রকার সমিতি গঠন করে থাকে। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমিতি অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারে।

আমাদের দেশে কৃষি সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি উৎপাদক সমবায় সমিতির উদাহরণ।

## ২.৫.২ বাংলাদেশে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা (Role of Producers Co-Operative Society in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশ একটি দারিদ্রপীড়িত দেশ। এদেশের প্রায় শতকরা ৮০ জন লোকই গ্রামে বাস করে। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দরিদ্র কৃষকদের তথা স্বল্প বিত্তশালী শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যোন্নয়নে উৎপাদক সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিম্নে সংক্ষেপে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

**১। মধ্যস্থ কারবারীদের উচ্ছেদ (Removal of middlemen) ঃ** উৎপাদক সমবায় সমিতির সদস্যরা নিজেদের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী নিজেরাই উৎপন্ন করে। এজন্য কোন মধ্যস্থ কারবারীর প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, এ সমিতি সরাসরি ক্রেতাদের নিকট তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করে থাকে।

**২। পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণ (Marketing products) ঃ** উৎপাদক সমবায় সমিতি পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ জাতীয় সমিতির সদস্যারা নিজেরাই উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতা থাকে বলে কিংবা এ সমবায় ব্যবস্থায় সরাসরি ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ থাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতে হয় না।

**৩। কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ (Supply of goods at lower price) ঃ** উৎপাদক সমবায় সমিতির মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভ করা যায়। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং কম মূল্যে পণ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়।

**৪। ব্যয় সংকোচ (Deduction cost) ঃ** উৎপাদন ও বণ্টন কার্যে সমিতি বিবিধভাবে ব্যয় সংকোচ অর্জন করতে পারে। সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ জড়িত থাকায় এবং সমিতির কার্যাবলীতে সদস্যগণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে বা স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে থাকে। ফলে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনকার্যের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য ব্যয় সংকোচ অর্জিত হয়।

**৫। বেকার সমস্যার সমাধান (Solve unemployment problem) ঃ** বাংলাদেশে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এ বেকার সমস্যার সমাধানে উৎপাদক সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সমবায়ের সদস্যবৃন্দ এবং দেশের অগণিত বেকার লোকদের জন্য সমিতি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে উৎপাদক সমবায় সমিতি দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

**৬। পুঁজি গঠন (Capital formation) ঃ** উৎপাদক সমবায় সমিতিতে জনগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিনিয়োগের সুবিধা থাকায় তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা জন্মায়, যা দেশের সার্বিক পুঁজি গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে থাকে।

**৭। উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন (Production of standard goods) ঃ** এ সমিতির সদস্যরা সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বলে সর্বদাই তারা অতিশয় যত্ন ও সতর্কতার সাথে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে। ফলে তাদের পক্ষে উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

**৮। শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি (Increase income of the labour) ঃ** এ জাতীয় সমিতিতে শ্রমিকদের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকে বিধায় তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার প্রয়াস পায়।

**৯। জাতীয় আয় বৃদ্ধি (Increase national Income) ঃ** উৎপাদক সমবায় সমিতির প্রসার দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ সমিতির মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের ব্যক্তিগত আয় তথা পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয় আয়ও বাড়ে।

**১০। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা (Equalization of supply & demand) ঃ** এরূপ সমবায় সমিতি সদস্য ও ভোক্তাদের পছন্দমাফিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে সদস্য ও ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। ফলে সব সময় চাহিদা ও যোগানোর মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

**১১। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি (Economical & social development) ঃ** দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদক সমবায় সমিতি ব্যাপকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমিতির মাধ্যমে দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা সহজতর হয়। ফলে সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের মত দেশে শহর ও গ্রামে-গঞ্জে কৃষি, অকৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা অপরিসীম।

## ২.৫.৩ ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি (Consumers Co-Operative Society) ঃ

কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভোক্তারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী স্বল্পমূল্যে ও সহজে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি বলে। মূলত মধ্যস্থ কারবারীদের মুনাফার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং কম মূল্যে পণ্য সামগ্রী পাবার উদ্দেশ্যেই ভোক্তা বা সম্ভোগকারিগণ এরূপ সমিতি গড়ে তোলে। এ সমিতির মাধ্যমে তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে থাকে। ভোক্তা সমবায় সমিতি উৎপাদক বা পাইকারদের নিকট থেকে সরাসরি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা যতটুকু সম্ভব স্বল্পমূল্যে সমিতির সদস্যদের নিকট বিক্রয় করে থাকে। সমিতির সদস্যগণ শেয়ার ক্রয় করে সমিতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দেয় এবং তারা বছর শেষে ক্রয়ের অনুপাতের ভিত্তিতে সমিতির মুনাফা থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

## ২.৫.৪ বাংলাদেশে ভোক্তা সমবায় সমিতির ভূমিকা (Role of Consumers Co-Operative Society in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতাও অত্যন্ত কম। কিন্তু জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি থাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অনেক বেশি। মধ্যস্থ কারবারীদের দৌরাত্ম্যর কারণে এখানকার ভোক্তা সাধারণ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয় বলে প্রায়শই হিমসিম খেতে হয়। এ অবস্থায় ভোক্তা সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিম্নে বাংলাদেশে ভোক্তা সমবায় সমিতির ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল ঃ

১। **ন্যায্যমূল্য বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহ (Supply with actual price) ঃ** ভোক্তা সমবায় সমিতি এর সদস্যদেরকে ন্যায্যমূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। ফলে ভোক্তাগণকে পণ্য ক্রয়ে অধিক মূল্য দিতে হয় না।

২। **মধ্যস্থ কারবারিদের উচ্ছেদ (Removal middle men) ঃ** পণ্যদ্রব্যের বন্টন ব্যবস্থা থেকে মধ্যস্থ কারবারীদের উচ্ছেদ করে এ জাতীয় সমিতির মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা সম্ভবপর হয়। ফলে মধ্যস্থ কারবারীরা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ পায় না।

৩। **রুচি মোতাবেক পণ্য সরবরাহ (Supply of demanded products) ঃ** ভোক্তা সমবায় সমিতি এর সদস্যদের পছন্দ ও রুচির দিকে খেয়াল রেখে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করে থাকে। এতে ভোক্তাগণ তাদের পছন্দমত জিনিস ক্রয়ের সুযোগ পায়।

৪। **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা (Equalization of supply & demand) ঃ** এ সমবায় সমিতি ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে বিধায় সব সময়ই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৫। **নিয়মিত পণ্যের যোগান (Supply products regularly) ঃ** ভোক্তা সমবায় সমিতির একটি বিশেষ সুবিধা হল এরূপ সমিতি সমগ্র বছর জুড়ে একই গতিতে ক্রেতাদেরকে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করে থাকে।

৬। **সু-সম্পর্ক আনয়ন (Create good relation) ঃ** এরূপ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী ভোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

৭। **বেকার সমস্যার সমাধান (Solve unemployment problem) ঃ** সমবায়ের সদস্যবৃন্দ এবং দেশের অগণিত বেকার লোকদের জন্য সমিতি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে ভোক্তা সমবায় সমিতি দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে।

৮। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি (Economic & Social development) ঃ** ভোক্তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ আয়ের সংস্থান করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে পণ্যসামগ্রী ভোগের সুবিধাদি পেয়ে থাকে। এটি সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে।

সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, স্বীয় সদস্যদের পারস্পরিক মঙ্গল সাধন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে ভোক্তা সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## অনুশীলনী-২

### ▶▶ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **এক মালিকানা কারবার কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** একজন মাত্র ব্যক্তি দ্বারা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কারবারকে এক মালিকানা কারবার বলে।

২। **এক মালিকানা কারবারের গঠন কীরূপ?** [বাকাশিবো-২০০০, ০৬]

**উত্তর ঃ** এক মালিকানা কারবারের গঠন অত্যন্ত সহজ। এরূপ কারবার গঠনে বিশেষ কোন নিয়ম-কানুন অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কোন সময় এ কারবার গঠন করতে পারে।

৩। **এক মালিকানা কারবারে মূলধন কে সরবরাহ করে?**

**উত্তর ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই মূলধন সরবরাহ করে থাকে। প্রয়োজনে তিনি আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধব কিংবা ব্যাংক থেকে বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিতে পারেন।

৪। **"এক মালিকানা কারবারের দায় অসীম"– এ কথাটির অর্থ কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** এক মালিকানা কারবারে মালিকের দায় অসীম, এ কথাটির অর্থ হল– মালিককে একাই যাবতীয় দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়।

৫। **এক মালিকানা কারবারের পৃথক কোন সত্তা আছে কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]
অথবা, **একমালিকানা কারবারের পৃথক সত্তা নেই কেন?**

**উত্তর** এক মালিকানা কারবারের পৃথক কোন সত্তা নেই। কারবার ও মালিক এক ও অভিন্ন সত্তার অধিকারী।

৬। **বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কারবার সংগঠন কোন্‌টি?**

**উত্তর** এক মালিকানা কারবার বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম কারবার সংগঠন। প্রাচীন কাল থেকে এ কারবার চলে আসছে।

৭। **এক মালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব কী রকম?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** এক মালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। মালিকের কর্মক্ষমতা বা ইচ্ছার এর স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মালিক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় কারবার গুটিয়ে ফেলতে পারে।

৮। **অংশীদারি কারবার কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১১]

**উত্তর** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি বদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

৯। **অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কী?** [বাকাশিবো-২০০৩, ১২]
অথবা, **অংশীদারি কারবার কী ভিত্তিতে গড়ে ওঠে?**

**উত্তর** চুক্তি অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি। চুক্তি ছাড়া এ কারবার গঠন করা যায় না।

১০। **অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা কতজন হতে পারে?** [বাকাশিবো-২০১২, ১৩(T), ১৪(T)]
**অথবা, অংশীদারি কারবারের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কতজন হওয়া প্রয়োজন?**

**উত্তর** সাধারণ অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ২০ জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তা ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১১। **অংশীদারি কারবারের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা কী?** [বাকাশিবো-২০০৪, ২০১০]

**উত্তর** সাধারণত নাবালক, পাগল, দেউলিয়া প্রভৃতি ব্যক্তি ছাড়া চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য অন্য যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ অংশীদারি কারবারের সদস্য হতে পারে।

১২। **অংশীদারি কারবারের মুনাফা কীভাবে বণ্টিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কিছু না থাকলে কারবারের মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে সম পরিমাণে বা মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়ে থাকে।

১৩। **অংশীদারি কারবার কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের পরিচালনার ক্ষমতা সকল অংশীদারেই আছে। তবে কার্যত তারা এ ভার কোন একজন বা দু'জনের উপর অর্পণ করে থাকে।

১৪। **অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন কাকে বলে?**

**উত্তর** অংশীদারি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধনের কার্যালয়ে অংশীদারি কারবারের নাম তালিকাভুক্তকরণকে অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বলে।

১৫। **অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এর নিবন্ধন অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

১৬। **বাংলাদেশে অংশীদারি কারবার কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?**

**উত্তর** বাংলাদেশে অংশীদারি কারবারসমূহ ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

**১৭। অংশীদারি চুক্তি কী লিখিত হতে হয়?**

**উত্তর** অংশীদারি চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। তবে কারবারের এবং অংশীদারদের নিজেদের স্বার্থে তা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

**১৮। অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার কী তার শেয়ার বা অংশ হস্তান্তর করতে পারে?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার তার শেয়ার বা অংশ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারে না। তবে সকল অংশীদারদের সম্মতিক্রমে তা সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে নতুন অংশীদারকে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

**১৯। যৌথ মূলধনী কারবার কী?** [বাকাশিবো-২০০৫]

অথবা, **যৌথমূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এবং যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে কারবার গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

**২০। যৌথ মূলধনী কারবারের সদস্য সংখ্যা কতজন হতে পারে?** [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর** সাধারণ সসীম দায় যৌথমূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট এবং ঘরোয়া সসীম দায় যৌথ কারবার বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২জন এবং সর্বাধিক ৫০ জন সদস্য থাকতে পারে।

**২১। যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক কে?**

**উত্তর** শেয়ারহোল্ডারগণ যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক।

**২২। যৌথ মূলধনী কারবার কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়?**

**উত্তর** যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

**২৩। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ০৯]

অথবা, **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ৫০ জন সদস্য নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠিত হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

**২৪। পাবলিক লিঃ কোং বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ১০, ১৩]

অথবা, **পাবলিক লিঃ কোং এর সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ যে কোন সংখ্যক সদস্য (শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ) নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন যে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন গঠিত হয় তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

**২৫। বাংলাদেশে যৌথ মূলধনী কারবারসমূহ কোন আইন দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়?**

**উত্তর** বাংলাদেশে যৌথ মূলধনী কারবারসমূহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি অনুসারে গঠিত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

**২৬। কোম্পানির গঠনতন্ত্র কাকে বলা হয়?** [বাকাশিবো-২০০১, ২০০৩, ২০০৭]

**উত্তর** সংঘ, স্মারক বা স্বারকলিপিকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠনতন্ত্র বলা হয়ে থাকে।

**২৭। সংঘ-বিধি কী?** [বাকাশিবো-২০০৩]

অথবা, **পরিমেল নিয়মাবলি কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১]

**উত্তর** যে দলিলের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে তাকে কোম্পানির সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি বলে।

**২৮। সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** নিজেদের পারস্পরিক মঙ্গল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের বিত্তহীন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং একই শ্রেণী বা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

**২৯। সমবায় সমিতি গঠন করতে ন্যূনতম কত জন সদস্যের প্রয়োজন?**

**উত্তর ঃ** সমবায় সমিতি গঠন করতে ন্যূনতম ২০ জন সদস্যের প্রয়োজন হয়।

**৩০। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ কোন্ আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়?**

**উত্তর ঃ** বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ ২০০১ সালের সমবায় আইন ও ১৯৮৭ সালের সমবায় নিয়মাবলি অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

**৩১। সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮]

অথবা, **সমবায় সমিতি কী লক্ষ্যে গড়ে ওঠে?**

**উত্তর ঃ** মুনাফা অর্জন সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সদস্যদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনই এর মূল লক্ষ্য।

**৩২। উৎপাদক সমবায় সমিতি কী?** [বাকাশিবো-২০১০]

অথবা, **উৎপাদক সমবায় সমিতি কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** স্বল্প বিত্তশালী ব্যক্তিগণ কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে যে সমিতি গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।

**৩৩। ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭]

**উত্তর ঃ** কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ভোক্তারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী স্বল্পমূল্যে ও সহজে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি বলে।

**৩৪। যৌথ মূলধনী কারবারে লিঃ শব্দটি দিয়ে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** একমাত্র যৌথ মূলধনী কারবারে লিঃ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। লিমিটেড শব্দটি দ্বারা মূলত যৌথ মূলধনী কারবার তার শেয়ার মালিকদের পৃথক সত্ত্বা প্রকাশ করে।

**৩৫। নামে মাত্র অংশীদার কাকে বলা হয়?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর ঃ** যে অংশীদার কারবারে কোন মূলধন বিনিয়োগ ও কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, তবে নিজস্ব সুনামের বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট বেতন পায়, তাকে নামমাত্র অংশীদার বলে।

**৩৬। শেয়ার বাজার কী?** [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]

**উত্তর ঃ** যে বাজারে দেশের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো তাদের শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে শেয়ার বাজার বলে।

**৩৭। শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার প্রধানত তিন প্রকার, যথা ঃ

১। সাধারণ শেয়ার,
২। অগ্রাধিকার শেয়ার এবং
৩। বিলম্বিত বা প্রবর্তকগণের শেয়ার।

**৩৮। যৌথ মূলধনী কারবারে একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি স্থাপিত হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ মূলধনী কারবারকে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই এ ধরনের সংগঠন চড়াদামে পণ্য বিক্রয় করে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ায়। তাই বলা যায়, এ ধরনের কারবারে একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

**৩৯। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মাধ্যমিক শেয়ার বাজার।

**৪০। নিষ্ক্রিয় অংশীদার কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** যে অংশীদার কারবারের মূলধন বিনিয়োগ করে ও লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও কারবার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না, তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

**৪১। বোনাস শেয়ার কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে সংরক্ষিত তহবিলের যে অংশ অতিরিক্ত শেয়ার হিসেবে বন্টন করা হয়, তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

**৪২। শেয়ার কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১০, ১১]

**উত্তর ঃ** কোম্পানির মোট মূলধনকে নির্দিষ্ট পরিমাণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা হয় তার প্রতিটি এককে শেয়ার বলে। শেয়ার কোম্পানির মূলধনের উৎস।

**৪৩। "ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ" কত সালে কোথায় যাত্রা শুরু করে?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** "ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ" ১৯৫৪ সালে নিবন্ধিত হয়ে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে তার যাত্রা বা ট্রেডিং শুরু করে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। এক মালিকানা কারবার বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর ঃ** একজন মাত্র ব্যক্তিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কারবারকে এক মালিকানা কারবার বলা হয়। এ কারবারের মালিক নিজেই কারবারের সমুদয় পুঁজির সংস্থান করেন, কারবার পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমুদয় মুনাফা একাই ভোগ করেন। কারবারে লোকসান হলে তিনি তা এককভাবে বহন করেন। আইনের দৃষ্টিতে এ কারবারের কোন পৃথক সত্তা নেই। মালিক ও কারবার এক ও অভিন্ন সত্তার অধিকারী।

**২। এক মালিকানা কারবার কীভাবে গঠিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৬, ২০০৭]

**উত্তর ঃ** এক মালিকানা কারবার গঠন করতে বিশেষ কোন আইনগত বিধিনিষেধ বা নিয়মকানুন অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগই এ জাতীয় কারবার আরম্ভ করার জন্য যথেষ্ট। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কোন সময় এ কারবার গঠন করতে পারে।

**৩। এক মালিকানা কারবারের প্রধান অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর ঃ** নিম্নে এক মালিকানা কারবারের প্রধান অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

১। এক মালিকানা কারবারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল মূলধনের সীমাবদ্ধতা। এক মালিকের পক্ষে অধিক মূলধন যোগানো কঠিন।
২। ব্যক্তি বিশেষের কর্মশক্তি ও কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতাহেতু এক মালিকানা কারবার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।
৩। এক মালিকানা কারবারে মালিকের দায় সীমাহীন এবং তা মালিককেই বহন করতে হয়।
৪। আইনের দৃষ্টিতে এ কারবারের পৃথক কোন ঝাণ্ডা নেই।
৫। এরূপ কারবারের সম্প্রসারণের সুযোগ নেই। তাই এটি বৃহৎ কারবারের অনুপযুক্ত।
৬। পুঁজি কম বলে এ কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র হয়।
৭। এ কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যক্তিগতভাবে মালিককে বহন করতে হয়।
৮। এরূপ কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত, যে কোন সময় এর বিলোপ করতে পারে।
৯। বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্র ছাড়া এ কারবার সুবিধা করতে পারে না। অর্থাৎ এ কারবারের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।
১০। আইনগত সত্তার অভাবে এ কারবার সামাজিক মর্যাদা পায় না।

**৪। অংশীদারি কারবার বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**অথবা, অংশীদারি কারবার কাকে বলা হয়?**

**উত্তর ঃ** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন ও পরিচালনা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এ কারবার গঠনেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিজেরাই কারবারে মূলধনের যোগান দেয় এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে লাভ লোকসান বন্টন করে নেয়। সকল অংশীদার মিলে বা সকলের পক্ষে যে কোন একজন বা দু'জন অংশীদার এ কারবার পরিচালনা করতে পারে। অংশীদারি কারবারের পৃথক কোন সত্তা নেই। অংশীদারদের ব্যক্তিগত সত্তা দিয়েই এটা পরিচিতি লাভ করে। আমাদের দেশে প্রচলিত অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক হতে পারে না।

**৫। অংশীদারি কারবার কীভাবে গঠিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর** অংশীদারি কারবার গঠনের জন্য প্রথমেই কমপক্ষে ২ জন এবং বেশির পক্ষে ২০ জন। কিন্তু ব্যাংকিং কারবারের বেলায় ১০ জনের অধিক নয় এরূপ সমমনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে একত্রিত হতে হয়। অতঃপর কারবার গঠনে ইচ্ছুক এরূপ দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। উক্তরূপ চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেই অংশীদারি কারবারের সৃষ্টি হয়। অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে নিবন্ধকের অফিসে প্রয়োজনীয় ফিসহ আবেদন করে কারবারটিকে নিবন্ধিত করে নিতে পারেন। এভাবেই একটি অংশীদারি কারবার গঠিত হয়ে থাকে।

**৬। অংশীদারি চুক্তিপত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭]

অথবা, **অংশীদারি কারবারের চুক্তিনামা কাকে বলে?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবার পরস্পর চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়। যে পত্র বা দলিলে অংশীদারি কারবারের গঠন, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, অংশীদারদের অধিকার, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে তাকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলা হয়।

**৭। অংশীদারি কারবার কীভাবে নিবন্ধিত হয়?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবার নিবন্ধিত করতে হলে নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত ফি সহ আবেদন পত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রে ফার্মের নাম, ব্যবসায়ের স্থান, অংশীদারদের নাম, ঠিকানা, তাদের যোগদানের তারিখ, ফার্মের মেয়াদ প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়। আবেদন পত্রটি সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। আবেদনপত্রের বিবৃতি নিবন্ধক পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে ফার্মটিকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করেন। এভাবেই একটি অংশীদারি কারবার নিবন্ধন হয়ে থাকে।

**৮। অংশীদারি কারবারের চুক্তিপত্র লিখিত হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?**

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের চুক্তিপত্র লিখিত হলে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যায় ঃ

১। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা লিখিত চুক্তির শর্তানুসারে মীমাংসা করা সহজ হয়।

২। লিখিত চুক্তিপত্র অংশীদারিত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

৩। এটি অংশীদারদের মধ্যকার পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও মনোমালিন্য দূরীকরণে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

৪। লিখিত চুক্তিপত্র একটি স্থায়ী রেকর্ড।

৫। কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট অংশীদারি চুক্তিপত্রটি দাখিল করে কারবারের জন্য ঋণ বা অন্য যে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়।

৬। লিখিত চুক্তিপত্র প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনবোধে এর মাধ্যমে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়।

**৯। যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে কতিপয় ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বক্তিসত্তা বিশিষ্ট, চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন এবং সাধারণ সীলমোহরের অধিকারী স্বেচ্ছামূলক কারবারি প্রতিষ্ঠানকে যৌথ মূলধনী কারবার বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলা হয়।

**১০। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৩, ২০১০]

**উত্তর** কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ যে কোন সংখ্যক সদস্য (শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ) নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন যে যৌথ মূলধন কারবার সংগঠন গঠিত হয় তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। এটি জনসাধারণের নিকট শেয়ার ও ঋনপত্রসমূহ ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে এ কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

**১১। যৌথ মূলধনী কারবারের কৃত্রিম সত্তা কী?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮]

অথবা, **যৌথ মূলধনী কারবারের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বলে একটি পৃথক সত্তা অর্জন করে। যার অর্থ হল, এর মালিকানার পরিবর্তন হলেও কারবারটি আগেকার মতই থেকে যায়। আইনগতবাবে প্রত্যেক কোম্পানি একটি ব্যক্তি এবং তার নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব আছে। যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি গঠন করে থাকে তারাও গঠিত কোম্পানি সম্পূর্ণ পৃথক। একেই বলা হয় কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার বলে নিবন্ধিত কোম্পানি রক্ত মাংসে গড়া মানুষের মতই নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত। কোম্পানির নামে এবং দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি চলতে পারে।

**১২। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে "সসীম দায়" বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যৌথ মূলধনী কারবারের মালিকদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। কোন শেয়ারহোল্ডারকে তার নির্দিষ্ট দায়ের অধিক দায় বহন করতে হয় না। অর্থাৎ কারবারের দায় যাই হোক না কেন দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের শেয়ার মূল্যের অধিক হতে পারে না। শেয়ারহোল্ডারদের এ সসীম দায়কেই যৌথ মূলধনী কারবারের সসীম দায় বুঝানো হয়ে থাকে।

**১৩। প্রাইভেট লিঃ কোং এবং পাবলিক লিঃ কোং বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৭]

**উত্তর** **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঃ** ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ৫০ জন সদস্য নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠিত হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং এটি জনসাধারণ্যে এর শেয়ার বা ঋণপত্রসমূহ ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। কোম্পানি আইন অনুযায়ী এরূপ কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

**পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ঃ** কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ যে কোন সংখ্যক সদস্য (শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ) নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন যে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন গঠিত হয় তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। এ কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। এটি জনসাধারণের শেয়ার ও ঋণপত্রসমূহ ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধনের পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে তার ব্যবসায় কার্য আরম্ভ করতে হয়।

**১৪। যৌথ মূলধনী কারবারের ২টি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর** যৌথমূলধনী কারবারের ২টি সুবিধা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

**১। মূলধনের প্রাচুর্য ঃ** যৌথ মূলধনী কারবারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মূলধনের প্রাচুর্যতা। বহুলোকের মধ্যে এ কারবারের শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা থাকায় এটা সহজে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

**২। সীমিত দায় ঃ** যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে শেয়ার-বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ সহজ হয়।

**১৫। যৌথ মূলধনী কারবার কীভাবে গঠিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১১]

অথবা, **যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি লেখ।**

**উত্তর** কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত হয়। এর গঠনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিচে কোম্পানি গঠন পদ্ধতির পদক্ষেপসমূহ দেখানো হল ঃ

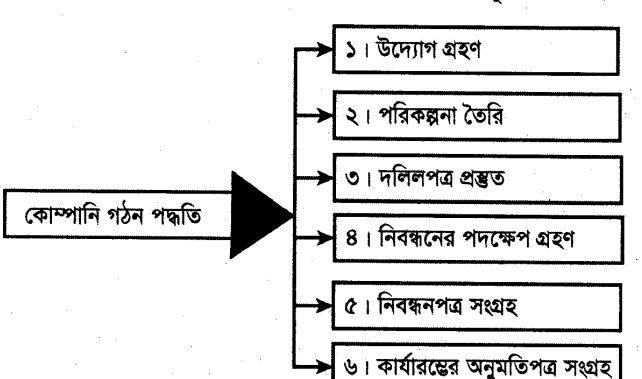

**১৬। যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ-স্মারক কী?**
**অথবা, পরিমেল বন্ধ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১০]
**অথবা, যৌথমূলধনী কারবারের স্মারকলিপি বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যে দলিলে যৌথ মূলধনী কারবারের নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, দায়, ক্ষমতা, মূলধন ও মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে তাকে সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ বলা হয়। এটা যৌথ মূলধনী কারবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ ছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হতে পারে না। এটা হচ্ছে কোম্পানির গঠনতন্ত্র। এর মাধ্যমে কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এতে কোম্পানি নিবন্ধের শর্তাবলী উল্লেখ থাকে এবং এটা কোম্পানির গণ্ডি নির্ধারণ করে। এ গণ্ডির বাইরে কোম্পানি কোন কার্য সম্পাদন করতে পারে না।

**১৭। বিবরণপত্র কী?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর** সাধারণ সসীম দায় যৌথ মূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রবর্তকগণ মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে পত্রের মাধ্যমে জনগণকে শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আহ্বান জানায় তাকে বিবরণপত্র বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র লাভের নিমিত্তে শেয়ার বিক্রির জন্য বিবরণপত্র প্রচার করা বাধ্যতামূলক।

বিবরণপত্র সাধারণত বিজ্ঞপ্তির আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হয় এবং এতে কোম্পানির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয় সমূহের সঠিক বর্ণনা থাকে।

**১৮। বিবরণপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য কী?**

**উত্তর** সাধারণত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বিবরণ পত্র প্রচার করা হয়ে থাকে ঃ

১। নব প্রতিষ্ঠিত কারবার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করানো
২। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণকে জ্ঞাত করানো
৩। জনসাধারণের নিকট হতে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো
৪। জনগণকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ
৫। সর্বোপরি কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করা।

**১৯। সমবায় সমিতির মূলনীতি বা আদর্শসমূহ কী কী?** বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ১০]

**উত্তর** সমবায় সমিতির মূল নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **একতা ঃ** সমবায় সমিতি একতার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।
২। **সাম্য ঃ** সমবায় সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সমান।
৩। **সততাঃ** সমবায়ের অন্যতম নীতি হল সদস্যদের মধ্যে সততা ও বিশ্বাস অটুট রাখা
৪। **ত্যাগঃ** একে অন্যের জন্য ত্যাগের মনোভাব বজায় রাখা সমবায়ের একটি আদর্শ।
৫। **সহযোগিতা ঃ** সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমবায় সমিতি পরিচালিত হয়।
৬। **বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ঃ** সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা সমন্বয়ের বিশেষ মূলনীতি।
৭। **গণতন্ত্র ঃ** গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি পরিচালিত হয়।

**২০। সমবায় সমিতি নিবন্ধন করতে কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়?**

**উত্তর** সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হয় ঃ

১। কমপক্ষে ১০ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠিত হতে হবে।
২। সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদেরকে নিজস্ব উপবিধি তৈরি করতে হবে-যাতে সমিতির সম্ভাব্য কার্যক্ষেত্রের ঠিকানা, উদ্দেশ্য, সদস্য গ্রহণের শর্ত, সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সভা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন, ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন, হিসাবনিকাশ পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে।
৩। নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট ফি সহ নিবন্ধকের নিকট আবেদপনপত্র দালিখ করতে হবে।

৪। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদিও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়।

(ক) প্রস্তাবিত সমিতির নিজস্ব উপবিধি-২ কপি;

(খ) সমিতির নিজস্ব সীলমোহরের নমুনা;

(গ) সচিব ও উদ্যোক্তাদের সইকৃত প্রতিশ্রুতি এ মর্মে যে, আবেদন পত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে।

নিবন্ধক আবেদনপত্রটি ও সংযুক্ত কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলে সমিতিটিকে নথিভুক্ত করেন এবং তার স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল দিয়ে নিবন্ধন পত্র প্রদান করেন।

**২১। আধুনিক যুগেও একমালিকানা কারবার এত জনপ্রিয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**অথবা, একমালিকানা কারবারের জনপ্রিয়তার কারণ কী কী?**

**উত্তর ঃ** বর্তমান বৃহদায়তন কারবারি যুগে একমালিকানা কারবারের জনপ্রিয়তার কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **সহজে গঠন ঃ** একমালিকানা কারবার গঠনে তেমন কোন আইনগত জটিলতা নেই। যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বল্প মূলধন নিয়ে এ কারবার গঠন করতে পারে।

২। **স্বল্প মূলধন ঃ** স্বল্প মূলধন নিয়েই এ কারবার আরম্ভ করা যায়, যা এর সবচেয়ে বড় সুবিধা।

৩। **অবস্থানগত সুবিধা ঃ** স্বল্প পরিসরে ও সাধারণ মানুষের দোরগড়ায় পণ্য পৌছে দিতে যত্রতত্র এ ধরনের কারবার স্থাপন করা যায়।

৪। **গোপনীয়তা রক্ষা ঃ** এক মালিকানা কারবারের পরিসর ছোট ও মালিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকায় এর গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।

৫। **সহজ বিলোপ ঃ** এ কারবারের বিলোপে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা না থাকায় বিলোপও অত্যন্ত সহজ। মালিক নিজ ইচ্ছায় যে কোন সময় কারবার গুটিয়ে ফেলতে পারে।

৬। **ব্যয় সংকোচন ঃ** অসীম দায় ও মালিক নিজেই কারবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকায় ব্যয় সংকোচনে উদ্বুদ্ধ হয়।

উপরোক্ত সুবিধা ছাড়াও বহুবিধ সুবিধার কারণে একমালিকানা কারবার অত্যন্ত জনপ্রিয়।

**২২। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"– বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪(T)]

**উত্তর ঃ** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারি কারবার গঠন করে। চুক্তি অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি। চুক্তি ছাড়া এ কারবার গঠন করা যায় না। অংশীদারদের অস্তিত্ব নির্ণয়ের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়। চুক্তি সম্পর্কে অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, "অংশীদারির সম্পর্ক চুক্তি হতে জন্মলাভ করে, জন্মগত বা সামাজিক অধিকার বলে নয়।" চুক্তি ছাড়া একাধিক সদস্য মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করলেও তাকে অংশীদারি কারবার বলা যায় না। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি।"

**২৩। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ–

১। সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ সাধন করা

২। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রভাব হ্রাস করা;

৩। সদস্যদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দান করা;

৪। ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ করা;

৫। নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণির মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

**২৪। শেয়ার বাজারে সদস্যপদ লাভের পদ্ধতি কী?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর ঃ** শেয়ার বাজারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য থাকে যাদেরকে দালাল বলা হয়। এ সদস্যদেরকে ছাড়া কোম্পানি লেনদেন করতে পারে না। সদস্যপদ লাভ করতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ক্রয় ও সদস্য ফি জমা দিতে হয়। এভাবেই শেয়ার বাজারের নিবন্ধিত সদস্য হওয়া যায়।

**২৫। শেয়ার লেনদেনের ডাক পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** শেয়ার লেনদেনের ডাক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সদস্যগণ ফ্লোরে উপস্থিত থাকেন। ফ্লোরে একজন কর্মকর্তা নির্ধারিত সিকিউরিটির তালিকা পাঠ এবং রুলিং প্রাইস উল্লেখ করেন। ক্রয় করতে ইচ্ছুক সদস্য দর উদ্ধৃত করেন এবং বিক্রয়ে ইচ্ছুক সদস্য দর প্রকাশ করেন। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের এ পদ্ধতি ডাক পদ্ধতি নামে পরিচিত।

**২৬। অংশীদারি কারবার ও যৌথ মূলধনী কারবারের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]

**উত্তর** অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের মাঝে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

| অংশীদারি কারবার | যৌথমূলধনী কারবার |
|---|---|
| ১। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সম্পত্তিক্রমে যে কারবার সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে অংশীদারি কারবার বলে। | ১। কোম্পানি আইনের আওতায় কতিপয় ব্যক্তি সেচ্ছায় সম্মিলিতভাবে যে কারবার সংগঠন গড়ে তোলে তাকে যৌথমূলধনী কারবার বলে। |
| ২। এরূপ কারবারের অস্তিত্ব সদস্যদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। | ২। এরূপ কারবার চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। |
| ৩। এরূপ কারবারের আয়তন ছোট আকারের হয়ে থাকে। | ৩। এরূপ কারবারের আয়তন বৃহৎ আকারের হয়ে থাকে। |
| ৪। সদস্যদের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। | ৪। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। |
| ৫। অংশীদারি চুক্তিপত্র অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। | ৫। স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। |

**২৭। শেয়ার বাজারের গুরুত্ব আলোচনা কর।** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর** শেয়ার বাজার হলো মূলধন বাজার ব্যবস্থায় মূল কেন্দ্রবিন্দু যা চূড়ান্তভাবে দেশের অর্থনীতি ও এর জনগণের সুবিধা ও কল্যাণের লক্ষ্যে দেশের ব্যবসায়ের অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। শেয়ার বাজার কার্যক্রম দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পায়নে সহায়তা করে। তাছাড়া সরকারের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হচ্ছে শেয়ার বাজার।

**২৮। শেয়ার ও ঋণপত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও।** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** নিম্নে শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | শেয়ার | ঋণপত্র |
|---|---|---|
| প্রকৃতি | শেয়ার কোম্পানির মূলধনের অংশ। | ঋণপত্র দ্বারা কোম্পানির জন্য ঋণ সংগ্রহ করা হয়। |
| মালিকানা | শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক। | ঋণপত্র গ্রহীতারা কোম্পানির ঋণদাতা। |
| দায় বহন | এর মালিকরা কোম্পানির লোকসান ও দায় বহন করে। | এর মালিকরা কোম্পানির লোকসান ও দায় বহনে বাধ্য থাকে না। |
| জামানত সংরক্ষণ | শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জামানত সংরক্ষণ করতে হয় না। | বন্ধকী ঋণপত্রের ক্ষেত্রে মালিকরা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। |
| আয় | মুনাফা অর্জিত হলে পরিচালকদের সিদ্ধান্ত ক্রমে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। | মুনাফা হোক না হোক মালিকরা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। |
| ক্রেতাগণের মর্যাদা | এর ক্রেতাগণ কোম্পানির সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও নিয়ন্ত্রণ এর মর্যাদা পায়। | ঋণপত্রের মাধ্যমে ঋণদাতা হিসেবেই শুধু মর্যাদা পায়। |

**২৯। উৎপাদক সমবায় সমিতি ও ভোক্তা সমবায় সমিতির মাঝে পার্থক্য লেখ।** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** উৎপাদক সমবায় সমিতি ও ভোক্তা সমবায় সমিতির মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

| বিষয় | উৎপাদক সমবায় সমিতি | ভোক্তা সমবায় সমিতি |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা সম্মিলিতভাবে যে সমিতি গঠন করে, তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। | ভোক্তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠন করে, তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে। |
| ২। মূলধন | এরূপ সমিতি পরিচালনায় সঠিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। | স্বল্প মূলধনের সাহায্যে এরূপ সমিতি পরিচালনা করা যায়। |
| ৩। বাজার | এরূপ সমিতির বাজার তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। | এরূপ সমিতির বাজার একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। |
| ৪। কার্যপ্রকৃতি | এ ধরনের সমিতির কার্যপ্রকৃতি প্রধানত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রিক। | এরূপ সমিতির কার্যপ্রকৃতি প্রধানত পণ্যের বণ্টন বা সরবরাহ কেন্দ্রিক। |
| ৫। সুবিধা | এর মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। | এর মাধ্যমে বৃহদায়তন ক্রয় সুবিধা পাওয়া যায়। |

**৩০। অংশীদারি কারবারের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** অংশীদারি কারবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **একাধিক সদস্য ঃ** এ কারবার গঠনের জন্য সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন এবং ব্যাংকিং কারবারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে হয়।

২। **চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক ঃ** অংশীদারি কারবার চুক্তি হতে জন্মলাভ করে। তাই এ কারবার গঠনের জন্য সকল সদস্যের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

৩। **বৈধ কারবার ঃ** অংশীদারদের মধ্যে চুক্তিটি অবশ্যই বৈধ কারবার গঠনের জন্য হতে হবে। অবৈধ উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি কারবার বলা যায় না।

৪। **অংশীদারদের যোগ্যতা ঃ** অংশীদারদের অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন- নাবালক, পাগল ও দেউলিয়া চুক্তি সম্পাদনা করতে পারে না।

৫। **পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ঃ** অংশীদারি সম্পর্ক গঠনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং চুক্তি পারস্পরিক ও বিশ্বাস থেকে জন্মলাভ করে।

**৩১। শেয়ার বাজারের ৪টি উদ্দেশ্য লেখ।** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** শেয়ার বাজারের ৪টি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১। দেশের জনগণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে তোলা,
২। দেশের মূলধন গঠনে সহায়তা করা,
৩। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা,
৪। দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। এক মালিকানা কারবার কাকে বলে? এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১১, ১২]

**উত্তর সংকেত** ২.১. ও ২.১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। এক মালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১২R]

**উত্তর সংকেত** ২.৩.১ ও ২.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা দাও। অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭]

**উত্তর সংকেত** ২.১.২ ও ২.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। অংশীদারি কারবারের গঠনপ্রণালি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.২.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। অংশীদারি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** ২.৩.৩ ও ২.৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বলতে কী বুঝ? এ কারবারের নিবন্ধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.২.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও। এ কারবারের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.১.৪ ও ২.১.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। বিভিন্ন প্রকার যৌথ মূলধনী কারবারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** ২.২.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ১০, ১১, ১২(R)]

**উত্তর সংকেত** ২.২.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ স্মারক কী? স্মারকলিপির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.২.৫ ও ২.২.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। সংঘবিধি কী? এর বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

**উত্তর সংকেত** ২.২.৭ ও ২.২.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২। পরিমেল নিয়মাবলির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। সংঘ স্মারক বা স্মারকলিপি ও সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

**উত্তর সংকেত** ২.২.৮ ও ২.২.১১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। যৌথমূলধনী কারবার কাকে বলে? যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো- ২০০৪]

**উত্তর সংকেত** ২.১.৪ ও ২.৩.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪। যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৭, ০৮, ১৩]

**উত্তর সংকেত** ২.৩.৫ ও ২.৩.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। সমবায় সমিতির সংজ্ঞা দাও। সমবায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.১.৫ ও ২.১.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৬। সমবায় সমিতির গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর। সমবায় সমিতির মূল নীতিগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ১১]
অথবা, সমবায়ের মৌলিক নীতি ও আর্দশগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.২.১২ ও ২.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৭। উৎপাদক সমবায় সমিতি কাকে বলে? বাংলাদেশে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** ২.৫.১ ও ২.৫.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৮। ভোক্তা সমবায় সমিতি কী? বাংলাদেশে ভোক্তা সমবায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ১২]

**উত্তর সংকেত** ২.৫.৩ ও ২.৫.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯]

**উত্তর সংকেত** ২.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

********

# অধ্যায়-৩

# ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Banking System & Negotiate Instrument)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৩.০ সূচনা; ৩.১ ব্যাংকের সংজ্ঞা; ৩.২ ব্যাংক প্রদত্ত সেবাসমূহ; ৩.৩ বাংলাদেশে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ; ৩.৪ মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি; ৩.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের কার্যাবলি; ৩.৬ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার হিসাব; ৩.৭ বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা পদ্ধতি; ৩.৮ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বর্ণনা; ৩.৯ বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল; ৩.১০ বিভিন্ন প্রকার চেক; ৩.১১ প্রত্যয়পত্র*



## ৩.০ সূচনা (Introduction) ঃ

আগে মানুষ পণ্যের পরিবর্তে পণ্য বিনিময় করে তাদের অভাব মিটাতো। এতে তারা নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হলে একটি বিকল্প পন্থা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রবর্তনের চিন্তা শুরু করে। তারই ফলশ্রুতিতে অর্থের প্রচলন হয়। বস্তুত সমাজ জীবনে মুদ্রা ব্যবস্থার আবির্ভাব ও এর ব্যবহারের সময় থেকেই ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ঘটে।

ব্যাংক মূলত অর্থ-বিনিময় ব্যবসায়ে লিপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি এক শ্রেণির লোকের নিকট থেকে টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্য এক শ্রেণির লোককে তা ঋণ হিসেবে প্রদান করে। অর্থ জমা গ্রহণ ও ঋণ দান ছাড়াও এটি অর্থের লেনদেন ও আদান-প্রদান, নোট প্রয়োগ, ঋণের দলিলপত্র বিনিময় ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থেকে মুনাফা অর্জন করে থাকে। বর্তমানে ব্যাংক আধুনিক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য উপাদান।

## ৩.১ ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of Bank) ঃ

প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে ইংরেজি 'Bank' শব্দটি এসেছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। ইংরেজি 'Bank' শব্দটি বাংলায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্যাংক শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নদীর তীর, ক্ষেতের আল, লম্বা টুল, কোন বস্তু বিশেষের স্তূপ বা ধন ভাণ্ডার ইত্যাদি। তবে প্রয়োগিক অর্থে ব্যাংক বলতে অর্থ বিনিময় ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এর কাজ হল এক শ্রেণির লোকের নিকট থেকে টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য এক শ্রেণির লোককে তা ঋণ হিসেবে প্রদান করা।

বস্তুত ব্যাংক বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণ নিয়ে কারবার করে থাকে অর্থাৎ ব্যাংক অর্থ ও অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়সমূহ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং জমাকৃত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ মঞ্জুর করা ছাড়াও ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কার্য সমাধা করে থাকে।

নিচে ব্যাংকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল ঃ

১। **জন হারি-এর মতে,** "ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ও ঋণের দলিল বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।"

২। **অধ্যাপক কেয়ারনক্রস বলেন,** "ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক মধ্যস্থ কারবারি- ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।" (A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts)

৩। **অধ্যাপক হার্ডির মতে,** "ব্যাংক-এমন একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যা অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতো অর্থের ব্যবসা করে।

৪। **নোটস এন্ড নোটস**-এর ভাষায়, "যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, নোট ও চেক প্রচলন, সুদ গ্রহণ ও প্রদান ইত্যাকার আর্থিক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকেই ব্যাংক বলে।"

৫। **ইম্পেরিয়্যাল ডিক্শনারী অনুযায়ী** "ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে, নিজ জিম্মায় অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ ও প্রচলনের ব্যবস্থা করে এবং ঋণ দানের হুন্ডি বা বিল ভাঙ্গিয়ে দেবার ও এক স্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা প্রদান করে।"

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, "যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ করে, ঋণ মঞ্জুর করে, ঋণ সৃষ্টি করে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, নোট প্রচলন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত থাকে সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলা হয়।

## ৩.২ ব্যাংক প্রদত্ত সেবাসমূহ (Service rendered by Banks) ঃ

অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মত মুনাফা অর্জন ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এটি কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেই এর কার্যক্রম পরিচালনা করে না। জনগণের সেবা প্রদান করা এর অন্যতম নীতি। ব্যাংক তার মক্কেল তথা জনসাধারণের জন্য যে সব সেবা প্রদান করে তা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

**১। জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বিধান (Insure security of assets of public)** ঃ ব্যাংক জনগণের জমাকৃত অর্থ ও সম্পদের সর্বাধিক নিরাপত্তা প্রদান করে। এতে জনগণের অর্থ ও সম্পদ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির হাত হতে রক্ষা পায়।

**২। সঞ্চয় সৃষ্টি (Creation of savings)** ঃ ব্যাংক জনগণের নিকট হতে অলস উদ্বৃত্ত অর্থ-জমা গ্রহণ করে জনগণের সঞ্চয় সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

**৩। মুনাফা প্রদান (Distribute profit)** ঃ আমানতকারীগণের আমানতকৃত অর্থের উপর ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে মুনাফা (সুদ) প্রদান করে থাকে। এতে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

**৪। অর্থ প্রেরণ (Transfer money)** ঃ ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে টাকা-পয়সা প্রেরণ করে থাকে। হুন্ডি, মেইল ট্রান্সফার, (M. T.), টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (T. T.) ইত্যাদির মাধ্যমে এটি জনগণের অর্থ দেশ-বিদেশে আদান-প্রদান করে থাকে।

**৫। ঋণের সুবিধা প্রদান (Credit facilities)** ঃ ব্যাংক কেবল জনগণের নিকট হতে আমানতই গ্রহণ করে না, দেশের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজন অনুযায়ী ধনের যোগান দিয়ে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

**৬। বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি (Creation of exchange medium)** ঃ মুদ্রার পাশাপাশি বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার চেক, হুন্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের বিনিময়কে সহজ ও নিঃখরচা করে তোলে। ফলে জনগণ বিনা ঝুঁকিতে ও অনায়াসে অর্থের আদান-প্রদান করতে পারে।

**৭। লেনদেন নিষ্পত্তি** ঃ **(Settle transaction)** ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে বিনিময় বিল, চেক ইত্যাদির অর্থ প্রদান করে থাকে। আবার মক্কেলদের প্রাপ্য বিল, চেক ইত্যাদির অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এভাবে এটি লেন-দেন নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে।

**৮। মূল্যবান জিনিসপত্রের সংরক্ষণ (Save valuable assets)** ঃ ব্যাংক মক্কেলদের তথা জনগণের মূল্যবান দলিলপত্র, গহনা, অলংকার, শেয়ার, সিকিউরিটিস ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য লকার সুবিধা প্রদান করে থাকে। ব্যাংক রক্ষিত এ লকারের একটি চাবি ব্যাংকের নিকট এবং আরেকটি চাবি মক্কেলের নিকট থাকে। অবশ্য ব্যাংক এরূপ সেবা-প্রদানের জন্য মক্কেলের কাছ থেকে কিছু সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে।

**৯। মক্কেলের পক্ষে শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (Purchase & sells share & security)** ঃ ব্যাংক মক্কেল বা গ্রাহকের পক্ষে শেয়ার, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

**১০। মক্কেলের পক্ষে বিবিধ পরিশোধ (Paid miscellaneous expenses to the customer)** ঃ ব্যাংক মক্কেলের পক্ষ হয়ে মক্কেলের বাড়ি-ভাড়া, কর, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে।

**১১। মক্কেলের পক্ষে আদায় (Collection for customer)** ঃ ব্যাংক মক্কেলের বাড়ি ভাড়া আদায় করে, তার শেয়ার লভ্যাংশ, ডিবেঞ্চারের সুদ কিংবা অন্য বিনিয়োগের মুনাফা সংগ্রহ করে থাকে।

**১২। আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান (Giving certificate of financial solvency)** ঃ ব্যাংক মক্কেলদের প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান করে থাকে।

**১৩। ভ্রমণের সুবিধা প্রদান (Facilites of travell)** ঃ ব্যাংক ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ভ্রমণকারীর চেক (Traveller chaque) ইস্যু করে থাকে। এ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক ভ্রমণকারী মক্কেলের অর্থ-বহনের ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে।

**১৪। প্রত্যয় পত্র ইস্যু (Issued letler of credit)** ঃ ব্যাংক প্রত্যয় পত্র খোলে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানি মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

**১৫। তত্ত্বাবধায়ক (Executor)** ঃ অনেক সময় ব্যাংক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Executor) হিসেবে কাজ করে থাকে।

**১৬। উপদেষ্টা (Caretaker)** ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে তাছাড়া আয়কর, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে থাকে।

**১৭। সাময়িকী প্রকাশ (Published magazine)** ঃ বিভিন্ন সময়ান্তে সাময়িকী প্রকাশ করে ব্যাংক দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা আর্থিক কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জনগণকে অবহিত করে থাকে।

মোট কথা, ব্যাংক জনগণের ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য বহুমুখী সেবামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

## ৩.৩ বাংলাদেশে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Bank in Bangladesh) ঃ

একটি দেশের সামগ্রিক ব্যাংককে তাদের গঠন প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, মালিকানার ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে কয়েকটি পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যাংকের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

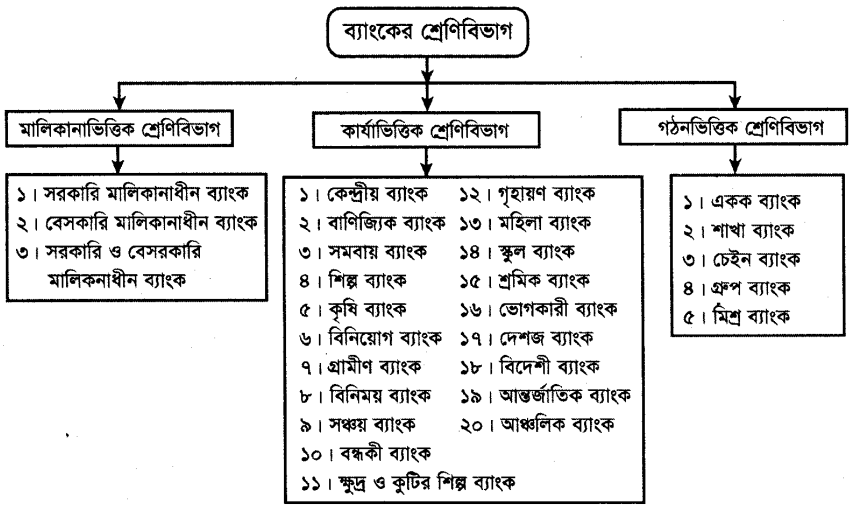


**ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল ঃ**

**(ক) মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of ownership) ঃ** মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

**১। সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক (State owned bank) ঃ** যে সকল ব্যাংক সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অথবা সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয়করণ করার মাধ্যমে সরাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণে থেকে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে ঐ সমস্ত ব্যাংককে সরকারি ব্যাংক বলে। যেমনঃ সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ইত্যাদি।

**২। বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক (Private ownership bank) ঃ** যে সকল ব্যাংক বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ঐ সমস্ত ব্যাংককে বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। যেমন– দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, দি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

**৩। সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক (Govt and private joint ownership bank) ঃ** যে সকল ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ঐ সমস্ত ব্যাংককে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। যেমন– উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ইত্যাদি।

**(খ) কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of function) ঃ**

**১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবসায় ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক। মুদ্রার প্রচলন, সরকারের ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক, ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

**২। বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial bank) ঃ** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, ঋণ-আমানত সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করা ইত্যাদি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ।

**৩। সমবায় ব্যাংক (Co-operative bank) ঃ** কোন এলাকার সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাকে সমবায় ব্যাংক বলা হয়। সমবায় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সদস্যদের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং সদস্যদের আর্থিক প্রয়োজনে ঋণদান করা ইত্যাদি।

**৪। শিল্প ব্যাংক (Industrial bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করে সে ব্যাংককে শিল্প ব্যাংক বলা হয়। শিল্প ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের শিল্পোন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা। 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক' বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

**৫। কৃষি ব্যাংক (Agricultural bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে তাকে কৃষি ব্যাংক বলা হয়। সাধারণত কৃষি ব্যাংক সার, বীজ, গবাদি পশু, কৃষি উপকরণাদি, কীটনাশক ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য কৃষকদের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে।

**৬। বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment bank) ঃ** যে ব্যাংক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যৌথ মূলধনী কোম্পানি, কর্পোরেশনসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য সহযোগিতা করে থাকে তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলা হয়।

**৭। গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen bank) ঃ** যে ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন জনসাধারণকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে তাকে গ্রামীণ ব্যাংক বলা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন খাতে সাধারণত স্বল্পমেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীনদেরকে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

**৮। বিনিময় ব্যাংক (Exchange bank) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যকার লেনদেন নিষ্পত্তির কাজে যে ব্যাংক নিয়োজিত থাকে তাকে বিনিময় ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিনিময় ব্যাংকের কাজ করে থাকে।

**৯। সঞ্চয়ী ব্যাংক (Savings bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহকে সংগ্রহ করে থাকে তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলা হয়। জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহকে সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। 'ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক' বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

**১০। বন্ধকী ব্যাংক (Mortgage bank) ঃ** যে ব্যাংক বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা জামানত রেখে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বন্ধকী ব্যাংক বলা হয়। বন্ধকী ব্যাংক সাধারণত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

**১১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Small and cottage industries bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক সাধারণত স্বল্প মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিঃ (BASIC) এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

**১২। গৃহায়ন ব্যাংক (Housing bank) ঃ** যে ব্যাংক দেশের গৃহায়ন সমস্যার সমাধানে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে তাকে গৃহায়ন ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের 'গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা' এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান।

**১৩। মহিলা ব্যাংক (Ladies bank) ঃ** যে ব্যাংক শুধুমাত্র মহিলাদেরকে ব্যাংকিং সুযোগ প্রদান করে থাকে তাকে মহিলা ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশে অবশ্য মহিলা ব্যাংক নেই, তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মহিলা শাখা মহিলা ব্যাংকের কাজ করে থাকে।

**১৪। স্কুল ব্যাংক (School bank) ঃ** যে ব্যাংক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঞ্চয়মুখী করে তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহকে সংগ্রহ করে তাকে স্কুল ব্যাংক বলা হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের সামান্য সঞ্চয়কৃত অর্থ স্কুল ব্যাংক আমানত হিসেবে জমা রাখতে পারে।

**১৫। শ্রমিক ব্যাংক (Labour bank) ঃ** যে ব্যাংক শ্রমিকদের সঞ্চয়মুখী করে তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহ সংগ্রহ করে তাকে শ্রমিক ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ব্যবস্থা করে শ্রমিক ব্যাংকের কাজ চালানো হচ্ছে।

**১৬। ভোগকারীর ব্যাংক (Consumer bank) ঃ** যে ব্যাংক জনগণকে ভোগ্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করে তাকে ভোগকারীর ব্যাংক বলা হয়। ব্যাংক গ্রাহকদেরকে (Credit card) সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকগণ এই কার্ডের সাহায্যে তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে থাকে। বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান নাই বললেই চলে। তবে আই এফ আই সি ব্যাংক সীমিত পরিসরে গ্রাহকদেরকে (Credit card) ইস্যু করে থাকে।

**১৭। দেশজ ব্যাংক (Domestic bank) ঃ** যে ব্যাংক স্বল্প পরিসরে জনসাধারণকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে দেশজ ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের মহাজন, স্বর্ণকার, সুদের ব্যবসায়ী এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

**১৮। বিদেশী ব্যাংক (Foreign bank) ঃ** কোন দেশের ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানায় গঠিত ব্যাংকসমূহকে বিদেশী ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক ইত্যাদি এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

**১৯। আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International bank) ঃ** জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলা হয়। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এর উদাহরণ।

**২০। আঞ্চলিক ব্যাংক (Local bank) ঃ** যে ব্যাংক কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ঋণ দিয়ে থাকে তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলা হয়। এ জাতীয় ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

**(গ) গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of structure) ঃ** গঠনের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা ঃ

**১। একক ব্যাংক (Unit bank) ঃ** যে ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট স্থানে একটি মাত্র অফিস বা কার্যালয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংকের একটি মাত্র অফিস বা কার্যালয় ছাড়া আর কোথায়ও কোন শাখা অফিস থাকে না।

**২। শাখা ব্যাংক (Branch bank) ঃ** যে ব্যাংকের একাধিক শাখা থাকে তাকে বলা হয় শাখা ব্যাংক ব্যবস্থা। একটি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে শাখাসমূহকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক ইত্যাদি শাখা ব্যাংকের উদাহরণ।

**৩। চেইন ব্যাংক (Chain bank) ঃ** সমজাতীয় কতিপয় ব্যাংক যখন অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তখন তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে। বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

**৪। গ্রুপ ব্যাংক (Group bank) ঃ** ব্যাংকিং ব্যবসায়ে কার্যরত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক যখন একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে এসে জোট গঠন করে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় গ্রুপ ব্যাংকিং। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

**৫। মিশ্র ব্যাংক (Mix bank) ঃ** যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একই সাথে জনগণের আমানত গ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে পল্লী জনগণের বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং চাহিদা পূরণের জন্য মিশ্র ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে।

## ৩.৪ মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি (The Functions of Bangladesh Bank in Controlling Money Market) ঃ

একটি দেশে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত মুদ্রাবাজারের উপস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের সুষ্ঠু সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিচে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

**১। নোট ও মুদ্রা প্রচলন (Note & coin Issue) ঃ** দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু ও মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনীতিকে সবল রাখার জন্য এটি প্রয়োজন অনুযায়ী বাজারে মুদ্রা সরবরাহ করে থাকে। তাই একে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক ও মুদ্রার নিয়ন্ত্রক বলা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে 'নির্দিষ্ট রিজার্ভ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। প্রচলিত নোট ও মুদ্রার বিপরীতে ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সৃষ্টির জন্য সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে থাকে। তাছাড়া সমপরিমাণ রিজার্ভ সংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যাংক সরকারি ঋণপত্র, ট্রেজারী বিল, বাণিজ্যিক হুন্ডি ইত্যাদি সংরক্ষণ করে থাকে।

**২। ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit control) ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বহুগুণিত ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অর্থের যোগান তথা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দেশের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থের যোগান তথা ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকল্পে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিসমূহ যেমন– ব্যাংকের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারী কার্যক্রম, জমার হার পরিবর্তন, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রেশনিং পদ্ধতির প্রবর্তন, নৈতিক চাপ প্রয়োগ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

**৩। মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ (Maintaining the Value of currency) ঃ** বাংলাদেশে প্রচলিত টাকা ও মুদ্রার মান সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক একক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে অর্থ সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশীয় মুদ্রার মান তথা ক্রয় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে থাকে। আবার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে থাকে।

**৪। বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Foreign Exchange control) ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; দেশীয় মুদ্রার সম্মানজনক বিনিময় হার সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-এর কার্যকারিতার উপরই লেনদেনের ভারসাম্য দেশের অনুকূলে থাকবে না প্রতিকূলে থাকবে তা নির্ভর করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও নির্গমন কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

**৫। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ (Reserve foreign currency) ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ করে। তাছাড়া অর্থ প্রচলনের বিপক্ষে এ ব্যাংক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি জমা রাখে। উপরন্তু আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মানজনক বিনিময় হার পেতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এতদউদ্দেশ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তোলে। এ ব্যাংক দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে।

উপরোল্লেখিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের দ্বারা বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে সচল রাখে। সুতরাং বলা যায় যে, দেশের মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

## ৩.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের কার্যাবলি (Commercial Bank in Bangladesh and their Functions) ঃ

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা অপ্রতুল হলেও ধীরে ধীরে এ সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রচনার লক্ষ্যে সুসংগঠিত রূপ লাভ করছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো ব্যাংককে জাতীয়করণ করে পাঁচটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে সরকার বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করলে বেসরকারি মালিকানায় অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নয়শীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার বর্তমান অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। আশা করা যায়, অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি, দেশি, বিদেশি, তালিকাভুক্ত, অ-তালিকাভুক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মালিকানা ও প্রকৃতির প্রায় ৫০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত আছে।

নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা দেখানো হল ঃ

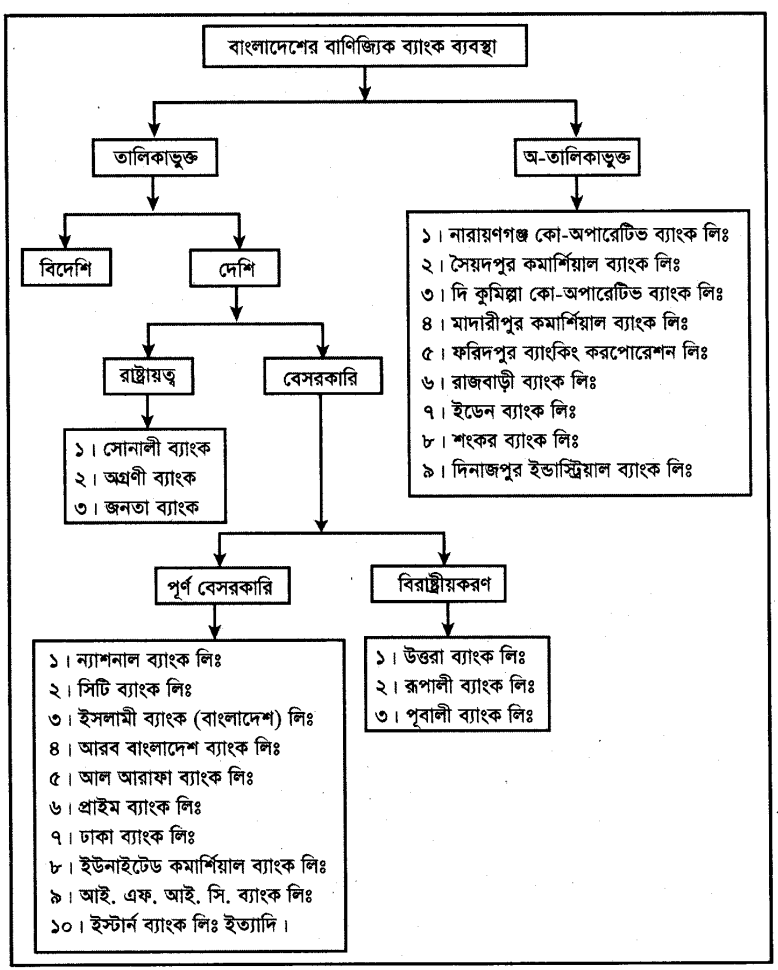

## ৩.৫.১ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড (Sonali Bank Ltd.) ঃ

সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** এ ব্যাংক ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান', 'দি প্রিমায়ার ব্যাংক লিঃ' ও 'ব্যাংক অব বহওয়ালপুর লিঃ'- এর সমন্বয়ে গঠিত হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisation structure) ঃ** সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও লন্ডনে এর একটি করে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস রয়েছে। তাছাড়া সমগ্র দেশে এর ২৫টি প্রিন্সিপাল অফিস, ৩৫টি জোনাল অফিস এবং ২১টি করপোরেট অফিস রয়েছে। বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের সর্বমোট ১৩১৭টি শাখা কর্মরত আছে যার ৪২০টি শহরে, ৮৯০টি গ্রামাঞ্চলে এবং ৭টি বিদেশে অবস্থিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ব্যাংকের ৩৫০টি প্রতিনিধি রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** সোনালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকা যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩২৭.২০ কোটি টাকা যার সম্পূর্ণটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত।

**পরিচালনা (Administration) ঃ** এ ব্যাংক ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ পর্ষদ সরকার নিযুক্ত একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৬ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

**কার্যাবলি (Functions) ঃ** সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের সর্ববৃহ বাণিজ্যিক ব্যাংক। সেজন্য বিশ্বের অন্যান্য বাণিজ্যেক ব্যাংকের ন্যায় কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যাংক বিশেষ কতগুলো অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন করে। নিচে সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করা হল ঃ

**(ক) সাধারণ কার্যাবলি (General Activities) ঃ**

**১। আমানত গ্রহণ (Collection of deposit) ঃ** সোনালী ব্যাংকের একটি অন্যতম কাজ হল জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখা। সোনালী ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় বিভিন্ন হিসেবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

**২। ঋণ দান (Payment of loan) ঃ** জনগণকে ঋণ দান করা সোনালী ব্যাংকের একটি কাজ। সোনালী ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় বিভিন্ন আমানত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ মুনাফার বিনিময়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে।

**৩। ঋণ আমানত সৃষ্টি (Creation of loan deposit) ঃ** অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সোনালী ব্যাংকও আমানত সৃষ্টি করে। এ ব্যাংক অত্যন্ত সুকৌশলে প্রদত্ত ঋণকে আমানতে পরিণত করার মাধ্যমে অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।

**৪। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of medium of exchange) ঃ** সোনালী ব্যাংক লেনদেনকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়পত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদির প্রচলন করে থাকে।

**৫। বিনিময় বিল বাট্টাকরণ (Discounting bill) ঃ** সোনালী ব্যাংক ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে তাদের বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি বাট্টাকরণ করে।

**৬। বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য (Help Banglasesh bank to credit control) ঃ** এ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

**৭। অর্থ স্থানান্তর (Money transfer) ঃ** সোনালী ব্যাংক এর গ্রাহকদের পক্ষে চেক, ড্রাফট, হুণ্ডি, পে-অর্ডার, মেইল ট্রান্সফার (M.T) টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (T.T) ইত্যাদির মাধ্যমে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে।

**৮। পাওনা আদায় ও পরিশোধ (Collection & Payment of money) ঃ** এ ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে তাদের প্রাপ্ত চেক, ড্রাফট, বিনিময় বিল, হুণ্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন পাওনা আদায় করে এবং এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পাওনা পরিশোধ করে।

**৯। শেয়ার, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (Purchase & sells share & security) ঃ** সোনালী ব্যাংক নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয় করে এবং সরকারকে সরকারি বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় সহায়তা করে।

**১০। অছি হিসেবে কাজ (Work as a trustee) ঃ** সোনালী ব্যাংক অনেক সময় এর মক্কেলের সম্পত্তির জিম্মাদার বা অছি হিসেবে কাজ করে।

**১১। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব (Work as a agent of Bangladesh bank) ঃ** সোনালী ব্যাংক কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে যেসব স্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেসব স্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সোনালী ব্যাংক নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে এবং সরকারি অর্থের আদান-প্রদান করে।

**১২। বৈদেশিক বিনিময় (Foreign exchange) ঃ** সোনালী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, প্রত্যায়নপত্র ইস্যু, বিনিময় বিল ও হুন্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময়ে সাহায্য করে।

**১৩। মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ (Reserve valuable assets) ঃ** সোনালী ব্যাংক নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এর মক্কেলের মূল্যবাদ সম্পদ যেমন-স্বর্ণালঙ্কার, দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি নিরাপদে রাখার জন্য লকার সুবিধা প্রদান করে।

**১৪। আর্থিক অবস্থার সনদ (Certificate of financial solvency) ঃ** বিভিন্ন কারণে মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্রের প্রয়োজন হলে সোনালী ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে তা ইস্যু করে।

**১৫। অবলেখন (Under writing) ঃ** সোনালী ব্যাংক অনেক সময় নতুন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য অবলেখক হিসেবে কাজ করে।

**(খ) বিশেষ কার্যাবলি (Special Functions) ঃ**

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সকল থানা ও উপজেলায় সরকারি লেনদেন সম্পাদন করে।
২। পাট, চা ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক হারে ঋণ প্রদান করে।
৩। অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরে ঋণ মঞ্জুর করে।
৪। দক্ষ ব্যাংকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে।
৫। বিশেষ ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও পেনশন বিতরণ করে।
৬। ডিপোজিট পেনশন স্কীম পরিচালনা করে।
৭। হজ্জ যাত্রীদের ফি গ্রহণ, যাকাত তহবিলের অর্থ গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলের অর্থ গ্রহণ করে থাকে।
৮। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন বিতরণ করে।
৯। সরকারের স্ট্যাম্প, রাজস্ব ও রেজিস্ট্রেশন ফি সংগ্রহ করে।
১০। জনগণকে গৃহনির্মাণ ও কৃষিঋণ প্রদান করে।
১১। খাদ্য ক্রয়ে সরকারকে ঋণ প্রদান করে।
১২। সরকারের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ কর আদায় করে।
১৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ডেইরি, হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের জন্য ঋণ প্রদান করে।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে সোনালী ব্যাংক উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## ৩.৫.২ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (Agrani Bank Ltd.) ঃ

অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের 'দি হাবিব ব্যাংক লিঃ' ও 'দি কমার্স ব্যাংক লিঃ'-এর বাংলাদেশী শাখাসমূহের দায় ও সম্পত্তি নিয়ে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশ বলে এ ব্যাংক গঠিত হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational structure) ঃ** এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয় ব্যতীত এ ব্যাংকের ৫টি সার্কেল কার্যালয়, ৫৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৮টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক শাখা রয়েছে। বর্তমানে এ ব্যাংকের ৯০৩টি শাখা ও বিদেশে ২৮০টি প্রতিনিধি রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৪৮.৪২ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সম্পূর্ণটাই সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ১ জন সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ৭ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এ ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য সংঘটিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত।

**অগ্রণী ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Agrani Bank) ঃ** অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে অগ্রণী ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি বর্ণনা করা হল ঃ

**১। আমানত গ্রহণ (Collection of deposit) ঃ** এ ব্যাংক বিভিন্ন হিসেবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

**২। ঋণদান (Providing loan) ঃ** এ ব্যাংক জনগণকে ঋণদান করে।

৩। **বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য (Helping international trade) ঃ** এ ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত আমদানি ও রপ্তানিকারকদের আমদানি ও রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান করে।

৪। **মূলধন গঠন (Capital formation) ঃ** এ ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় সংগ্রহ দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করে।

৫। **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য (Helping credit control) ঃ** এ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৬। **অর্থ স্থানান্তর (Fund transfer) ঃ** এ ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে।

৭। **অছি হিসেবে কাজ (Work as a trustee) ঃ** এ ব্যাংক মক্কেলদের সম্পত্তির জিম্মাদার বা অছি হিসেবে কাজ করে।

৮। **বৈদেশিক বিনিময় (Foreign exchange) ঃ** এ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময়ে সাহায্য করে।

৯। **অবলেখক হিসেবে কাজ (Work as a under writer) ঃ** এ ব্যাংক নতুন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য অবলেখক হিসেবে কাজ করে।

১০। **মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ (Save valuable asset) ঃ** এ ব্যাংক জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, শেয়ার সিকিউরিটিজ ও বিভিন্ন দলিলপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করে।

## ৩.৫.৩ জনতা ব্যাংক লিমিটেড (Janata Bank Ltd) ঃ

জনতা ব্যাংক একটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ব্যাংক জাতীয়করণ অধ্যাদেশ বলে সাবেক 'দি ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ' ও 'দি ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ' এর তদানিন্তন বাংলাদেশীয় শাখাসমূহের দায় ও সম্পত্তি নিয়ে এ ব্যাংক গঠিত হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** এ ব্যাংকের প্রধন কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ঢাকা, খুলান ও চট্টগ্রামে ১৪টি প্রিন্সিপাল অফিস, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি বিভাগীয় অফিস এবং সমগ্র দেশে ৪৬ টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে এ ব্যাংকের ৯০০টি শাখা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৪৫২টি প্রতিনিধি রয়েছে। এর ৪৪টি শাখা বৈদেশিক মুদ্রার কারবারে নিয়োজিত।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৫৯.৩৯ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সম্পূর্ণটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ১ জন সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৬ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এ ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য সংঘটিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ৮ জন মহাব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনা পরিচালকে কার্যাবলি পরিচালনায় সহায়তা করে থাকেন।

**জনতা ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Janata Bank) ঃ** জনতা ব্যাংক বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রয়াত্ব তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই এ ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলিসহ সরকারের আরও বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করে। এ ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা।
২। জনগণকে ঋণ প্রদান করা।
৩। বৈদেশিক বিনিময় কার্য সম্পাদন করা।
৪। বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করা।
৫। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন করা।
৬। ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহায়তা করে।
৭। নতুন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য অবলেখক হিসেবে কাজ করা।
৮। মক্কেলদের মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা।
৯। বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ করা।
১০। মক্কেলদের অছি ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা।
১১। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহ করা।
১২। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসেবে সরকারি খাতে অর্থ নিবিয়োগ করা ইত্যাদি।

### ৩.৫.৪ রূপালী ব্যাংক লিঃ (Rupali Bank Ltd) ঃ

রূপালী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম বিরাষ্ট্রীকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশ বলে সাবেক মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি, দি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ ও অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ-এর বাংলাদেশে অবস্থিত শাখাসমূহের দায় ও সম্পত্তি নিয়ে এ ব্যাংক গঠন করা হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। বর্তমানে এ ব্যাংকের ৫১৮টি শাখা এবং বিদেশে ৮৮ টি প্রতিনিধি রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকা।

**মালিকানা (Ownership) ঃ** ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় এ ব্যাংককে একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। এর ৫১% ভাগ শেয়ারের মালিক সরকার এবং ৪৯% ভাগ বেসরকারি ক্রেতাগণ। বেসরকারি ৪৯% ভাগ শেয়ারের মধ্যে ১৫% ভাগ ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্যে এবং ৮৫% ভাগ জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়। বর্তমানে একটি সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Adminisitration & management) ঃ** ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য সংঘটিত হয়। উক্ত পরিচালনা পর্ষদের ৯ জন সরকার কর্তৃক এবং ৭ জন বেসরকারি মালিকগণ কর্তৃক মনোনীত।

**কার্যাবলি (Functions) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে রূপালী ব্যাংক লিঃ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সকল স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

### ৩.৫.৫ উত্তরা ব্যাংক লিঃ (Uttara Bank Ltd.) ঃ

উত্তরা ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম বিরাষ্ট্রীকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দি ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড-এর দায় ও সম্পত্তি নিয়ে এ ব্যাংক গঠন করা হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ব্যাংকের ১৯৮ টি শাখা এবং বিদেশে ২২৪ টি প্রতিনিধি রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা।

**মালিকানা (Owncrship) ঃ** ১৯৮৩ সালে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় এ ব্যাংককে পাবলিক লিঃ কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয় এবং মালিকানা সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ১ জন সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ১১ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য সংঘঠিত হয়।

**কার্যাবলি (Activities) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে উত্তরা ব্যাংক লিঃ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সকল সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

### ৩.৫.৬ পূবালী ব্যাংক লিঃ (Pubali Bank Ltd.) ঃ

পূবালী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি বিরাষ্ট্রীকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দি ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ-কে জাতীয়করণের মাধ্যমে এর দায় ও সম্পত্তি নিয়ে এ ব্যাংক গঠন করা হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** পূবালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিলে অবস্থিত। বর্তমানে ২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে এ ব্যাংকের ৩৫১টি শাখা রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

**মালিকানা (Owncrship) ঃ** ১৯৮৩ সালে সরকারের বিরাষ্ট্রীকরণ নীতির আওতায় এ ব্যাংককে একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানিতে রূপান্তর করে একে বেসরকারি মালিকানা হস্তান্তর করা হয়।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ১ জন সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ১৩ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য সংঘটিত হয়।

**কার্যাবলি (Functions) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে উত্তরা ব্যাংক লিঃ দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সকল সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

## ৩.৫.৭ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (Islami Bank Bangladesh Ltd.) ঃ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক একটি সুদমুক্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

**গঠন (Formation) ঃ** এ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে বিশ্বের কতিপয় ইসলামী ব্যাংকের অনুসরণে ইসলামী উন্নয়ন সংস্থার অংশীদারিত্বে এবং বাংলাদেশের কতিপয় ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তার উদ্যোগে পাবলিক লিঃ কোম্পনি হিসেবে প্রাতিষ্ঠিত হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। বর্তমানে (২০০২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) এ ব্যাংকের ১২৭টি শাখা রয়েছে।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা এ ব্যাংক পরিচালিত হয়। এছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম তদারক করার জন্য একটি শরীয়া কাউন্সিল রয়েছে। দেশের প্রখ্যাত আলেম, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হয়।

**বৈশিষ্ট্য (Characteristic) ঃ** এ ব্যাংকের কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত।

২। এ ব্যাংক লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

৩। এ ব্যাংকের যাবতীয় আমানত, বিনিয়োগ ও ঋণ সুদমুক্ত।

৪। এ ব্যাংক দাতা-গ্রহীতার পরিবর্তে গ্রাহকদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৫। ইসলামী শরীয়া বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

**উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ** মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি এ ব্যাংকের আরও কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

১। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা,

২। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রর্বতন করা,

৩। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিকল্পনা করা,

৪। দেশে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা,

৫। যাকাত তহবিল ও দাতব্য তহবিল গঠন ও এর লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা,

৬। জনগণকে ইসলামী জীবনধারণে উদ্বুদ্ধ করা।

**কার্যাবলি (Functions) ঃ** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে এ ব্যাংক দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সকল সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

## ৩.৫.৮ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh Development Bank Ltd) ঃ

বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে বাংলাদেশ ডেভেলমেন্টে ব্যাংক এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

**গঠন (Formation) ঃ** ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS) কে সমন্বিত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি এ দুটি সংস্থার সকল ক্ষমতা, অধিকার, দায়দায়িত্ব বহন করে।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure) ঃ** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা। এর জোনাল অফিসের সংখ্যা ৪টি এবং ব্রাঞ্চ অফিসের সংখ্যা ২৮টি।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত। এর ১০০% শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ সরকার। প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস ১১টি শাখায় বিভক্ত এবং এতে বিভাগের সংখ্যা ৩০টি।

**উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। শিল্পের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
২। নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন।
৩। ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের সংখ্যা বাড়ানো।
৪। শিল্পোদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও ঋণ প্রদান।
৫। বিদ্যমান শিল্পগুলোকে টিকিয়ে রাখা ও নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সম্ভাব্য সকল উপায়ে শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে থাকে।

### ৩.৫.৯ গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank) ঃ

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষদের ঋণদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে।

**গঠন (Formation) ঃ** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এ ব্যাংক একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। নজিরবিহীন সাফল্যের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকার গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি করে এ প্রকল্পকে 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামে একটি স্বতন্ত্র বিশেষ ব্যাংক হিসেবে রূপায়িত করেন।

**সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational structure) ঃ** গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ১,১০০টি শাখা রয়েছে এবং ৩৬,৪২০টি গ্রামে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ব্যাংকের কার্যক্রম জোনাল অফিস, এরিয়া অফিস ও শাখা অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

**মূলধন (Capital) ঃ** এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা।

**মালিকানা (Ownership) ঃ** এ ব্যাংকের মালিকানার ৮৮% ভাগ ভূমিহীন ঋণগ্রহীতাদের এবং অবশিষ্ট ১২% ভাগ সরকারের।

**পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management) ঃ** ১৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী এ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণকারী হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে ১ জন সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট ৯ জন ভূমিহীন শেয়ারমালিক কর্তৃক নির্বাচিত হন।

**উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ** এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

১। গ্রামের দরিদ্র মানুষদেরকে মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করা।
২। গ্রামের ভূমিহীন লোকদের সংগঠিত করে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা।
৩। গ্রামে দরিদ্র ও বেকার লোকদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪। গ্রামের দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।
৫। দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৬। গ্রামের ভূমিহীন ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়তা করা।
৭। সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের জন্য সহজ ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা।

**গুরুত্ব ও কার্যাবলি (Importance & functions) ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে সকল কাজ করে তা নিম্নরূপ ঃ

১। এ ব্যাংকে গ্রামের দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের জামানত ব্যতীত ঋণ প্রদান করে।
২। এ ব্যাংক গ্রামের দুঃস্থ ও ভূমিহীন নারী-পুরুষদের সংগঠিত করে গ্রুপ ফান্ডের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টি করে এবং উক্ত সঞ্চয় সদস্যদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে।
৩। এ ব্যাংক সদস্যদের গৃহনির্মাণ, কৃষিকাজ, কুটির শিল্প, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করে।
৪। গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্প্রসারণ করা এর একটি প্রধান কাজ।
৫। এ ব্যাংক সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
৬। গ্রামভিত্তিক মূলধন গঠন করে।

সবশেষে বলা যায়, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ ব্যাংক দুঃস্থ ও বিত্তহীন গ্রামীণ লোকদের সংঘবদ্ধ করে তাদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। বিশ্ব ব্যাংকসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা এ ব্যাংকের সফলতায় প্রভাবিত হয়ে একে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে এ ব্যাংকে মডেল হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রেও এরূপ ব্যাংক স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এ ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৯৮% ভাগ। ঋণগ্রহীতাদের ৯১% ভাগ মহিলা।

## ৩.৬ ব্যাংক হিসাব (Bank Account) ঃ

ব্যাংক তার নিজস্ব নথিপত্রে যে পৃথক নাম, হিসাব নম্বর ও ঠিকানার মাধ্যমে তার প্রত্যেক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, উত্তোলনের সুযোগ দেয় এবং গ্রাহকের সাথে সকল ব্যাংকিং সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

মনীষীগণ ব্যাংক হিসাবকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঃ

**Lewis. E. Davids এর মতে,** "ব্যাংক হিসাব ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যকার এমন একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক, যা দ্বারা নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে গ্রাহককে সেবা প্রদান করা হয়।" (Bank account is a contractual agreement between a bank and its customer allowing the customer to use bank services for a face).

**Prof Hardson- এর মতে,** "ব্যাংক যে হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে লেনদেন করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।"

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাংক হিসাব হলো মক্কেলের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক রক্ষা ও আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম।

## ৩.৬.১ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার হিসাব (Different types of Account operated in a bank) ঃ

বর্তমানে সমাজে বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন আয়ের লোক রয়েছে। এসব লোকদের পছন্দ ও চাহিদা বিভিন্ন রকম বিধায় তাদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাধারণত ব্যাংকে যে সব ধরনের হিসাব খোলা যায় তা নিচের তালিকায় দেখানো হল ঃ

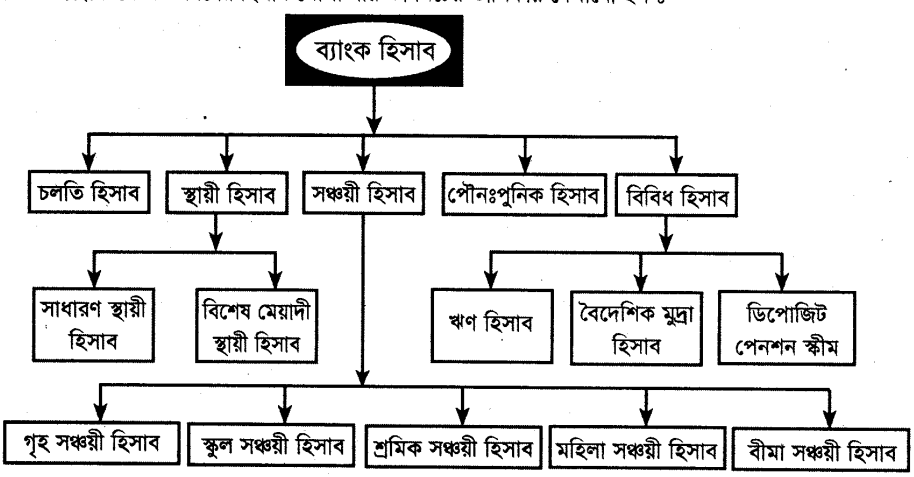


**নিচে ব্যাংকের এ সকল হিসাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ**

**১। চলতি হিসাব (Current account) ঃ** যে হিসাবে আমানতকারিগণ ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখতে ও উত্তোলন করতে পারে, সে হিসাবকে চলতি হিসাব বলা হয়। চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখা বাবদ আমানতকারিগণ ব্যাংক থেকে কোন সুদ পায় না। চলতি হিসাবের আমানতকারিগণ ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

**২। স্থায়ী হিসাব (Fixed account) ঃ** যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না, তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের জন্য আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে। স্থায়ী হিসাব দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ

**(ক) সাধারণ স্থায়ী হিসাব (General fixed account) ঃ** যে স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে ন্যূনতম ৩ মাস এবং বেশির পক্ষে ৩ বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা হয় তাকে সাধারণ স্থায়ী হিসাব বলা হয়। এ হিসাবের জন্য উচ্চহারে সুদ দেয়া হয়।

**(খ) বিশেষ মেয়াদী স্থায়ী হিসাব (Special term account) ঃ** যে স্থায়ী হিসাবের জমাকৃত টাকা ৭ দিনের নোটিশ অন্তে পরিশোধিত হয় এবং নির্দিষ্ট হারে ব্যাংক সুদ প্রদান করে তাকে বিশেষ মেয়াদী স্থায়ী হিসাব বলে।

**৩। সঞ্চয়ী হিসাব (Saving account) ঃ** যে হিসাবে ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখা যায়। কিন্তু জমাকৃত টাকা সপ্তাহে মাত্র দু'বারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারিগণ ব্যাংক থেকে স্বল্পহারে সুদ পেয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারিগণ সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা পায় না।

**নিচে সঞ্চয়ী হিসাবের বিভিন্ন শ্রেণিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ**

**(ক) গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব (Family savings account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় তাকে গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। গৃহ সঞ্চয়ী হিসেবে টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংক আমানতকারীর গৃহে সীল করা বাক্স অথবা সীল করা কৌটা সরবরাহ করে থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যাংক কর্মচারী বাক্স খুলে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর হিসাবে জমা করে থাকে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

**(খ) স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব (School savings account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাকে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়।। ছাত্র-ছাত্রীরা দৈনিক হাত খরচা ও টিফিন বাবদ যে টাকা পেয়ে থাকে তা থেকে সঞ্চয় করে সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকে জমা রাখে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

**(গ) শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব (Labourers savings account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাকে শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকে জমা রাখে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

**(ঘ) মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব (Female customers savings account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষতঃ পর্দাশীল মহিলাদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাকে মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালিত ব্যাংকসমূহ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এ হিসাবের আমানতকারিগণও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

**(ঙ) বীমা সঞ্চয়ী হিসাব (Insurance savings account) ঃ** এই হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী একসাথে সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা ও বীমার সুবিধা পায়।

**৪। পৌনঃপুনিক হিসাব (Recurring account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পুনঃপুন অর্থ জমা দিতে পারে এবং মেয়াদশেষে একসাথে বা কিস্তিতে টাকা উত্তোলন করতে পারে তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে। এ হিসাবে সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অধিক হারে সুদ প্রদান করা হয়।

**উপরোক্ত হিসাবসমূহ ব্যতীত ব্যাংকে নিম্নোক্ত হিসাবসমূহ খোলা যায়ঃ**

**৫। ঋণ হিসাব (Loan account) ঃ** যে হিসাবে ঋণ গ্রহীতাকে মঞ্জুরীকৃত ঋণ নগদে না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার নামে জমা রাখা হয়, উক্ত হিসাবকে ঋণ হিসাব বলা হয়। ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন অনুযায়ী চেকের মাধ্যমে ঋণের টাকা উত্তোলন করে থাকে।

**৬। বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (Foreign currency account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিগণের অর্জিত টাকা দেশে অবস্থিত কোন ব্যাংকে জমা রাখা হয় তাকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বলা হয়। আমানতকারী নিজে অথবা মনোনীত যে কেহ এ জাতীয় হিসাব পরিচালন করে থাকে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়ে থাকে।

**৭। ডিপোজিট পেনসন স্কীম (Deposit pension scheme) ঃ** যে হিসাবে জমাকৃত টাকার মাধ্যমে আমানতকারীদের ভবিষ্যতে পেনশনের সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়, তাকে ডিপোজিট পেনশন স্কীম বলা হয়। আমানতকৃত টাকা চুক্তি অনুযায়ী মাসিক কিস্তির মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিয়ে থাকে।

ব্যাংকের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারিগণের সুযোগ-সুবিধাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধার তারতম্য ঘটে থাকে।

## ৩.৭ বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা পদ্ধতি (How different types of bank accounts are opened and operated) ঃ

ব্যাংকে সাধারণত চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী এই তিন ধরনের হিসাব খোলা যায়। হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রথমেই স্থির করতে হবে তিনি কোন্ ধরনের হিসাব খুলতে চান। যে কোন প্রকার হিসাব খুলতে কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

নিচে ব্যাংক হিসাব খোলার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

### ৩.৭.১ চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Current Savings Account) ঃ

ব্যাংকে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় ঃ

১। **আবেদন ফরম সংগ্রহ (Collection of Application Form) ঃ** কোন ব্যক্তি ব্যাংকে হিসাব খুলতে চাইলে নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করতে হয়। ব্যাংক বিনামূল্যে এই আবেদন ফরম সরবরাহ করে থাকে। চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে নির্ধারিত আবেদন ফরম (Prescribed Application Form) সংগ্রহ করতে হয়।

২। **আবেদন ফরম পূরণ (Fill-up the Application From) ঃ** আবেদন ফরমে সাধারণত আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা ইত্যাদির উল্লেখ করতে হয়। উল্লিখিত তথ্যাদি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট কলাম বা ঘরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আবশ্যক।

৩। **পরিচিতির সুপারিশ (Recommendation of Introduction) ঃ** ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে পরিচিতির সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে আবেদকারীকে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি অথবা উক্ত ব্যাংকে হিসাব আছে এমন কোন আমানতকারী কর্তৃক পরিচিতির সুপারিশ করতে হয়। সাধারণত আবেদন ফরমেই আবেদনকারীকে কে পরিচয় করিয়ে দিল তার একটা ঘর থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচিতির জন্য আলাদা একটা বিশেষ ফরম ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হয়। পরিচিতির ঘরে পরিচয় প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ তার নাম, ঠিকানা, পেশা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে তার হিসাব নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়।

৪। **ছবি ও দলিলপত্র সংযুক্তি (Enclosing Photo and Documents) ঃ** আবেদনপত্রের ফরম পূরণের পর আমানতকারীকে তার সদ্য তোলা দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সত্যায়িত করে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হয়। তাছাড়া আবেদনকারী একক ব্যক্তি না হলে অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ হিসাব কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবে খোলার এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সাথে কতিপয় প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল করতে হয়।

যৌথ হিসাব এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব খোলার বেলায় সাধারণত নিম্নলিখিত দলিলাদি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হয় ঃ

(ক) যৌথ হিসাবের (Joint Account) ক্ষেত্রে হিসাব পরিচালনাকারীর নাম অর্থাৎ কে হিসাব থেকে টাকা তুলবে এবং কেউ মারা গেলে হিসাবের টাকা কে পাবে ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট ঘোষণাপত্র।

(খ) এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স।

(গ) অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারি চুক্তিপত্রের কপি এবং অংশীদারদের মধ্যে যাকে হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা দেয় হবে তার নাম ও স্বাক্ষর।

(ঘ) কোম্পানি সংগঠনের বেলায় সংঘ-স্মারক, নিবন্ধনপত্র, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র, প্রসপেক্টাসের সত্যায়িত কপি এবং হিসাব পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে কোম্পানির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি।

(ঙ) সমবায় সংগঠনের ক্ষেত্রে সমবায়ের উপবিধি এবং হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি।

(চ) ক্লাব বা অন্যান্য অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারী কর্মচারীদের নাম ও এতদ্‌সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনপত্র বা সিদ্ধান্তের কপি।

৫। **আবেদনপত্র জমা (Submission of Application) ঃ** আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণের পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনকারীকে তা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা হিসাব খোলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জমাকৃত আবেদনপত্র ও কাগজপত্রাদি দেখে সন্তুষ্ট হলে আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে একটি হিসাব নম্বর বরাদ্দ করেন এবং আবেদনকারীকে একটি নমুনা স্বাক্ষরকার্ড প্রদান করেন। অবশ্য অনেক সময় ব্যাংক আবেদনপত্রের ফরমের সাথেও এরূপ কার্ড সরবরাহ করে থাকে।

৬। **নমুনা কার্ড পূরণ (Fill-up the Specimen Signature Card) ঃ** আবেদনকারী ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা করবে অর্থাৎ হিসাব থেকে চেক কেটে টাকা তুলবে তাদের নাম ও নমুনা স্বাক্ষর ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের নির্ধারিত স্থানে তার পূর্ণ নাম ও অন্তত তিনটি নমুনা স্বাক্ষর দিতে হয়। ব্যাংক নমুনা স্বাক্ষরের কার্ডটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে। আমানতকারীকে ব্যাংক থেকে টাকা ওঠাতে হলে চেকে এই স্বাক্ষর দিয়েই ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হয়। ব্যাংক উপস্থাপিত চেকের স্বাক্ষর উক্ত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিলে কিনা তা দেখে টাকা পরিশোধ করে।

**৭। প্রাথমিক আমানত জমা (Paying Primary Deposit) ঃ** উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদনের পর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে বরাদ্দকৃত হিসাব নম্বরে জমা রসিদের মাধ্যমে একটি ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সেই প্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে জমা রসিদ সংগ্রহ করে আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রাথমিক আমানতের অর্থ ব্যাংকের কাউন্টারে জমা দিতে হয়। প্রাথমিক আমানতের টাকা সাধারণত ব্যাংক কর্তৃপক্ষই নির্ধারণ করে দেয়। তবে হিসাবের প্রকৃতিভেদে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

**৮। টাকা জমার রসিদ বই (Deposit Receipt Book) ঃ** ন্যূনতম প্রাথমিক আমানত জমা দেয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে টাকা জমা দেয়ার জন্য আমানকারীকে একটি টাকা জমার রসিদ বই প্রদান করে। উক্ত রসিদে ব্যাংকের সিল, জমাকারী ও ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকে। এর এক অংশ ব্যাংকে জমা হয় এবং অন্য অংশ আমানতকারীর নিকট মুড়ি হিসেবে থাকে।

**৯। চেক ও পাস বই গ্রহণ (Receiving Cheque and Pass Book) ঃ** অতঃপর আমানতকারী যাতে প্রয়োজনের সময় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারে তার জন্য ব্যাংক আমানতকারী গ্রাহকের নামে চেক বই ইস্যু করে। সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থ, উত্তোলনকৃত অর্থ, সুদ এবং সর্বশেষ ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্ত ইত্যাদি পাস বাইরে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উপরোক্ত কার্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই ব্যাংকে চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

**স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Fixed Account) ঃ** যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খুলতে পারে। নিম্নে স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি বর্ণনা করা হল ঃ

**১। মেয়াদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Take decision about period) ঃ** স্থায়ী হিসাব যেহেতু একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় সেজন্য হিসাব খুলতে আগ্রহী আমানতকারীকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কত মেয়াদের জন্য হিসাব খুলবেন। এরূপ হিসাব ন্যূনতম ৩মাস এবং সর্বোচ্চ ৩বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য খোলা যেতে পারে।

**২। ইচ্ছা জ্ঞাপন (Feling deine) ঃ** মেয়াদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগযোগ করে এরূপ হিসাব খোলার জন্য ইচ্ছা বা আগ্রহ ব্যক্ত করতে হয়।

**৩। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরণ (Collection & fillup application form) ঃ** অতঃপর স্থায়ী হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তিকে ব্যাংক কর্মকর্তা একটি স্থায়ী হিসাব খোলার আবেদন ফরম প্রদান করেন। এতে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, পেশা, টাকার পরিমাণ, মেয়াদ ইত্যাদি বিবরণ উল্লেখের জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকে। আবেদনকারীকে ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক ব্যাংকে জমা দিতে হয়। আমানতকারী প্রতিষ্ঠান হলে আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হয়।

**৪। আমানত প্রদান ও রসিদ সংগ্রহ (Depositing money and collecting receipt) ঃ** ব্যাংক কর্মকর্তা আবেদনপত্র পেয়ে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করলে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হয়। আবেদনকারী ব্যাংকে টাকা জমা দিলে ব্যাংক এর বিপরীতে একটি রসিদ প্রদান করে যা স্থায়ী আমানত রসিদ (Fixed Deposit Receipt) বা সংক্ষেপে এফ, ডি, আর (F, D, R) নামে পরিচিত।

এই রসিদটিতে জমাকারীর নাম, ঠিকানা, জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, মেয়াদকাল, সুদের হার ইত্যাদি লেখা থাকে এবং আমানকারী ও ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকে। তাছাড়া স্থায়ী আমানত রসিদে একটি নম্বর থাকে। উক্ত নম্বরই আমানতকারীর হিসাব নম্বর হিসেবে গণ্য হয়। মেয়াদ শেষে আমানতকারী রসিদটি ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক সুদসহ সমুদয় অর্থ তাকে পরিশোধ করে দেয়।

## ৩.৭.২ ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়ার পদ্ধতি (Process of Depositing Money in the Bank Accounts) ঃ

টাকা জমা দেয়ার জন্য ব্যাংকের ছাপানো রসিদ থাকে। ব্যাংক বিনামূল্যে গ্রাহকদেরকে ছাপানো রসিদ বই সরবরাহ করে থাকে। টাকা জমা দেয়ার উক্ত রসিদের পৃষ্ঠা দুটো অংশে বিভক্ত থাকে। টাকা জমা দেয়ার সময় দুটো অংশেই আমানতকারী হিসাবের নম্বর তারিখ, আমানতকারীর নাম, টাকার পরিমাণ অঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করে রসিদের ডান পার্শ্বের নিচের অংশে জমাদানকারীর স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর দিতে হবে। অতঃপর টাকাসহ রসিদ বই ব্যাংকের 'নগদ গ্রহণ' কাউন্টারে জমা দিতে হয়।

টাকাসহ রসিদ বই জমাদানের পর ক্যাশিয়ার টাকা গ্রহণ করে জমার রসিদে স্বাক্ষর দিয়ে রসিদ বইখানা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা রসিদের কাউন্টার ফয়েল বা মুড়িপত্র স্বাক্ষর প্রদান করে বইটি আমানতকারীর নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা রসিদের কাউন্টার ফয়েল বা মুড়িপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে বইটি আমানতকারীর নিকট ফেরত দেন। ব্যাংক কর্মকর্তা রসিদের কাউন্টার ফয়েল বা মুড়িপত্রের স্বাক্ষর প্রদান করে বইটি নেন। এভাবেই ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া হয়ে থাকে।

নিচে ব্যাংক হিসাবে টাকা জমার দেয়ার রসিদের একটি নমুনা দেয়া হল ঃ

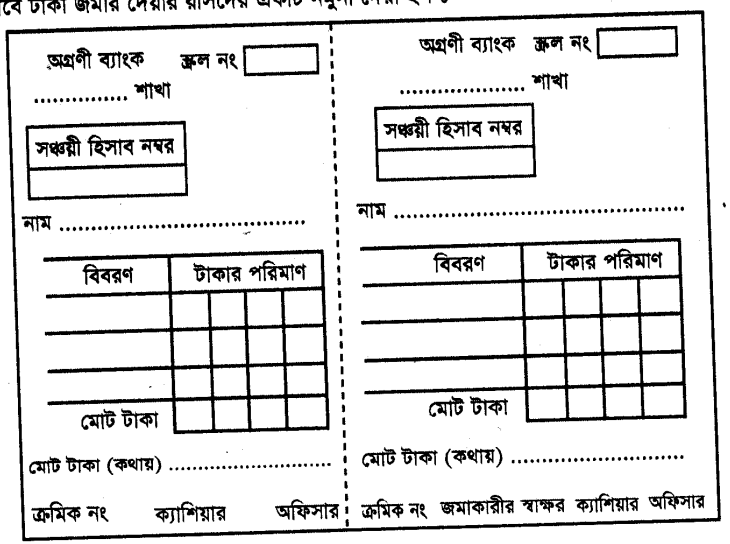


অগ্রণী ব্যাংক ক্রল নং
.............. শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর
নাম ........................................
বিবরণ টাকার পরিমাণ
মোট টাকা
মোট টাকা (কথায়) ............................
ক্রমিক নং ক্যাশিয়ার অফিসার

অগ্রণী ব্যাংক ক্রল নং
.................... শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর
নাম ................................................
বিবরণ টাকার পরিমাণ
মোট টাকা
মোট টাকা (কথায়) ...............................
ক্রমিক নং জমাকারীর স্বাক্ষর ক্যাশিয়ার অফিসার

## ৩.৭.৩ ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের নিয়ম বা পদ্ধতি (Procedure of Withdrawn of Money) ঃ

ব্যাংকে হিসাব খোলার পর ব্যাংক আমানতকারীকে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের অর্থ উত্তোলনের জন্য ১০, ২০, ২৫ বা ৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত চেক বই প্রদান করে। ব্যাংক হতে যে কোন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে হলে আমানতকারীকে উক্ত চেক বই হতে চেক ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়।

আমানতকারী ব্যাংক হতে টাকা ওঠানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত চেক বই থেকে একটি পাতা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে চেকের যথাস্থানে তারিখ, প্রাপকের নাম (আমানতকারী নিজে প্রাপক হলে সেক্ষেত্রে "নিজ" বা "স্বয়ং" কথাটির উল্লেখ), টাকার পরিমাণ কথায় এবং অঙ্কে পরিষ্কারভাবে লিখে নমুনা স্বাক্ষরের অনুরূপ স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। অতঃপর চেকের উল্টো পিঠে আরও দুটো স্বাক্ষর দিয়ে ব্যাংকের "টোকেন প্রদান" কাউন্টারে জমা দিতে হয়। টোকেন কাউন্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চেকখানা রেখে প্রাপককে নির্দিষ্ট নম্বরবিশিষ্ট একটি টোকেন প্রদান করেন।

অতঃপর চেকটি পরীক্ষা করার জন্য টোকেন কাউন্টার থেকে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট পাঠানো হয়। উক্ত কর্মকর্তা টাকার পরিমাণ অঙ্কে ও কথায়, ঠিক আছে কি না, তারিখ, আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল আছে কি না ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলে চেকটি পাস করে ক্যাশ কাউন্টারে প্রেরণ করেন। তারপর আমানতকারী বা প্রাপক 'নগদ প্রদান' কাউন্টারে টোকেনটি ক্যাশিয়ারের নিকট প্রদান করলে ক্যাশিয়ার চেকে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রাপককে প্রদান করেন।

নিচে টাকা উত্তোলনের চেক বই-এর একটি নমুনা পাতা প্রদর্শন হল ঃ

**চেকের পাতার নমুনা**

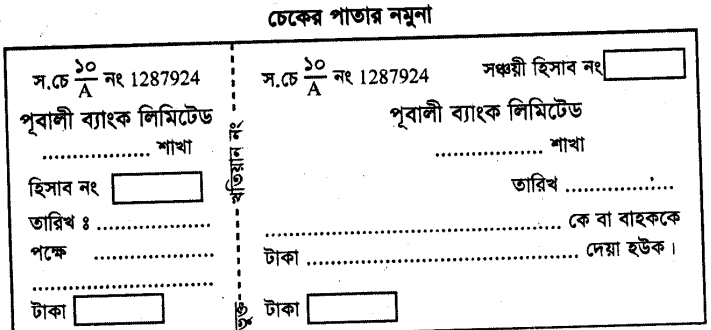


স.চে $\frac{১০}{A}$ নং 1287924
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
.................. শাখা
হিসাব নং
তারিখ ঃ ..................
পক্ষে ....................
..................................
টাকা

স.চে $\frac{১০}{A}$ নং 1287924 সঞ্চয়ী হিসাব নং
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
.................. শাখা
তারিখ ..................
................................................ কে বা বাহককে
টাকা ................................................ দেয়া হউক।
টাকা

## ৩.৮ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বর্ণনা (Define Negotiable Instruments) ঃ

সাধারণ অর্থে যে সমস্ত দলিলের মালিকানা হস্তান্তর করা যায়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে। অন্যভাবে বলা যায়, আইন অনুযায়ী বা প্রচলিত রীতি মোতাবেক যে সমস্ত ঋণের দলিলসমূহ একজনের নিকট হতে অন্যজনের নিকট হস্তান্তরের সাথে সাথে দলিলের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে। অর্থাৎ হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে ঋণের দলিলের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্যতাকে বুঝায়।



নিচে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হল ঃ

১। **অধ্যাপক টমাস** বলেন, "দেশের প্রচলিত কারবারী আইন অনুযায়ী হাত পরিবর্তন দ্বারা যে দলিল হস্তান্তরযোগ্য তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে।

২। **বিচারপতি উইলিস**-এর মতে, "হস্তান্তরযোগ্য দলিল হচ্ছে এমন একটি দলিল যা পূর্ববর্তী পক্ষের (ধারকের) দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী যে কোন ধারক তার উপর মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে"।

৩। **১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন** অনুযায়ী, "বাহক অথবা বাহকের নির্দেশিত কোন ব্যক্তিকে পরিশোধ্য প্রতিজ্ঞাপত্র, বিনিময় বিল বা চেককে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয়"।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, হস্তান্তরযোগ্য দলিল হচ্ছে এমন একটি দলিল যা দেশের প্রচলিত কারবারী আইনানুযায়ী দলিলের ধারক বা মালিকের নিকট হতে অন্যদের নিকট হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি এর মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।

### ৩.৮.১ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Negotiable Instruments) ঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিচারপতি উইলসের মতানুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য দলিলের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় ঃ

১। **লিখিত (Written)** ঃ হস্তান্তরযোগ্য দলিল একটি লিখিত দলিল।

২। **মালিকানা (Ownership)** ঃ হস্তান্তরযোগ্য দলিল কেবলমাত্র একজন অন্য একজনকে হস্তান্তর করে বা যথাযথ অনুমোদন সহকারে হস্তান্তর করলে মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়।

৩। **মালিকানা ক্ষুণ্ন হয় না (Not effect in ownership)** ঃ হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের পূর্ববর্তী মালিকের কোন প্রকার ত্রুটির জন্য বর্তমান মালিকের মালিকানা ক্ষুণ্ন হবে না। অর্থাৎ, ত্রুটিহীন স্বত্ব লাভ করবে।

৪। **মামলা দায়েরের ক্ষমতা (Rights of litigation)** ঃ প্রকৃত ধারক বা স্বত্বাধিকারী যথাসময়ে ঋণের দলিলের মূল্য না পেলে কোন নোটিশ না দিয়েই নিজ নামে দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।

৫। **অবাধ বিনিময় (Un-restricted)** ঃ হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলসমূহ নগদ টাকা পয়সার মতই অবাধে বিনিময় করা যায়।

৬। **শর্তহীন নির্দেশ (Unconditional order)** ঃ এরূপ দলিলে মূল্য প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতি থাকে।

৭। **দায়মুক্ত (Free from heritage)** ঃ পূর্ববর্তী ধারকের প্রতারণা বা জালিয়াতির জন্য প্রকৃত ধারক বা স্বত্বাধিকারীকে দায়ী করা যাবে না।

৮। **বিনিময় মূল্য (Exchange value)** ঃ প্রতিটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যে কোন প্রকার মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়।

৯। **স্বাক্ষর (Signature)** ঃ এরূপ দলিলে প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর থাকে।

১০। **দায়-দায়িত্ব (Liabilities)** ঃ যে বা যারা এরূপ দলিলে স্বাক্ষর করেছে অর্থাৎ দলিলে স্বাক্ষরকারীগণের উপর এর সঠিকতার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে।

## ৩.৯ বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Types of Negotiable Instruments) ঃ

আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে চিত্রের সাহায্যে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রকারভেদ দেখানো হল ঃ

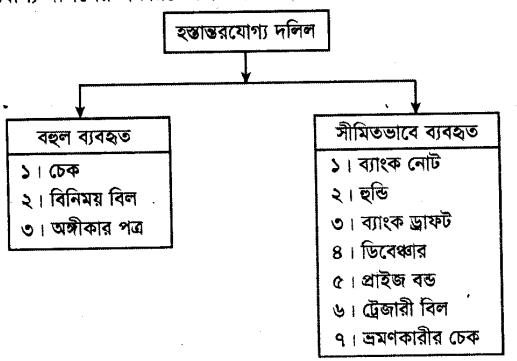


নিচে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল ঃ

**১। চেক (Cheque) ঃ** চেক ব্যাংকের প্রতি আমানতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি শর্তহীন লিখিত আদেশনামা। এতে বাহককে অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার নির্দেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকে। চেক বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে, যথাঃ বাহক চেক, হুকুম চেক ও দাগকাটা চেক।

**২। বিনিময় বিল (Bill of exchange) ঃ** বিনিময় বিল বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার উপর ইস্যু বা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। "প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে লিখিত শর্তহীন আদেশ দেয়া হয় তাকে বিনিময় বিল বলা হয়"।

**৩। অঙ্গীকারপত্র (Promissosy note) ঃ** অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে দেনাদার পাওনাদারের নিকট অঙ্গীকার করে থাকে। "প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তিকে অথবা তার নির্দেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার লিখিত শর্তহীন অঙ্গীকারনামাকে অঙ্গীকারপত্র বলা হয়"।

**৪। ব্যাংক নোট (Bank Note) ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও প্রচারিত বিভিন্ন মূল্যমানের নোটসমূহকে ব্যাংক নোট বলা হয়। এটি মূলত কাগজী মুদ্রা। চাহিবামাত্র এর মূল্য পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাধ্য থাকে। যেমন– বাংলাদেশের পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত ও পাঁচশত টাকার নোট।

**৫। হুন্ডি (Hundi) ঃ** এটা এক প্রকার দেশীয় বিনিময় বিল, যাতে অন্যের পাওনা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি থাকে। ধারে বা বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত হুন্ডি ব্যবহার হয়ে থাকে।

**৬। ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বা ব্যাংক ড্রাফট (Bank Draft) ঃ** ব্যাংক তার শাখা ব্যাংক অথবা অন্য কোন ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চাহিবামাত্র প্রদান করার জন্য যে নির্দেশ প্রদান করে তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বা ব্যাংক ড্রাফট বলা হয়"। ব্যাংকের আজ্ঞপত্রকে D. D. বা Demand Draft- বলা হয়। অর্থ স্থানান্তরের কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

**৭। ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র (Debenture) ঃ** ঋণ সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে। যে দলিল বা পত্রের মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ঋণদাতার নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে তার গৃহীত ঋণের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে তাকে ঋণপত্র বলা হয়।

**৮। প্রাইজবন্ড (Prize-bond) ঃ** যে নোট ক্রয়ের মাধ্যমে জনগণের অর্থ ফেরৎ পাওয়া ছাড়াও পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে প্রাইজবন্ড বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে প্রচলিত ১০০ (একশত) টাকা মূল্যের প্রাইজবন্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে।

**৯। ট্রেজারী বিল বা সরকারী বিল (Treasury bill) ঃ** যে ঋণ দলিলের মাধ্যমে সরকার জনগণের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে তাকে ট্রেজারী বিল বলা হয়। ট্রেজারী বিল সরকার চাহিবামাত্র ও কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার অঙ্গীকার প্রদান করে থাকে।

**১০। ভ্রমণকারীর চেক (Travellers cheque) ঃ** যে ঋণপত্রের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য ব্যাংক তার কোন শাখা ব্যাংক বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ প্রদান করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ভ্রমণকারীর অর্থ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এরূপ চেক ইস্যু করা হয়ে থাকে।

উপরালোচিত ঋণের দলিলসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেনদেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

## ৩.১০ বিভিন্ন প্রকার চেক (Different Types of Cheque) ঃ

চেক প্রধানত দুই প্রকার। যথা-(১) বাহক চেক ও (২) হুকুম চেক বা আদেশ চেক। এই উভয় প্রকার চেককে প্রয়োজন অনুযায়ী দাগ কেটে বা রেখাঙ্কিত করে আর এক শ্রেণির নতুন চেক তৈরি করা যায়, যাকে দাগকাটা চেক নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে চেককে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

১। বাহক চেক (Bearer Cheque)
২। হুকুম চেক (Order Cheque) ও
৩। দাগকাটা চেক (Crossed Cheque) ।

তবে উল্লেখিত এ তিন প্রকার চেক ছাড়াও গ্রাহকদের লেনদেন কার্যের সুবিধার্থে ব্যাংক আরও বহু রকমের চেকের প্রচলন করে থাকে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার চেক দেখানো হল ঃ

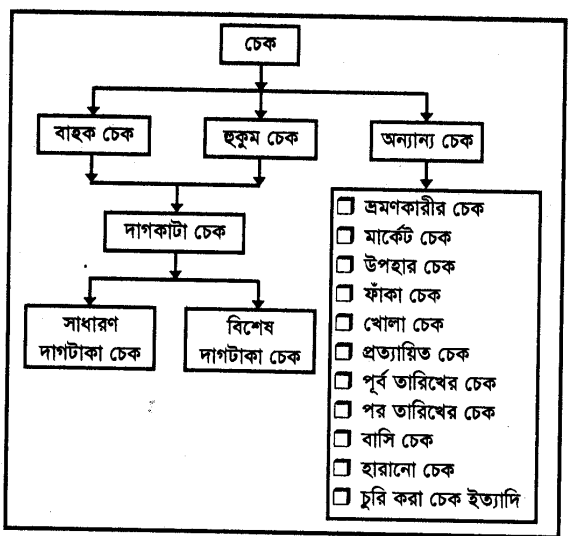


পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার চেকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল ঃ

**১। বাহক চেক (Bearer Cheque) ঃ** চেকের ধারক বা বাহক অথবা যে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে যে চেকের টাকা সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। বাহকের চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে। এ প্রকার চেক কোন প্রকার অনুমোদন ছাড়াই হস্তান্তর করা যায় এবং যে কোন ব্যক্তি এই চেক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক তাকে টাকা দিতে বাধ্য থাকে।

**২। হুকুম চেক (Order Cheque) ঃ** যে চেকের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রতি আদেশ জারি করা হয় তাকে হুকুম চেক বা আদেশ বলে। এ প্রকার চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে 'অথবা আদেশানুসারে' কথাটি লেখা থাকে। হুকুম চেক অনুমোদনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হয়। তাই এরূপ চেকের অর্থ প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপক ছাড়া অন্য কেহ ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে না।

**৩। দাগকাটা চেক (Crossed Cheque) ঃ** যে চেকের উপরিভাগের বাম কোনায় আড়াআড়িভাবে দুটো সমান্তরাল রেখা টানা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে। বাহক চেক অথবা হুকুম চেকে এরূপ রেখা টেনে দাগকাটা চেক তৈরি করা হয়। এ চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা যায় না, ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। দাগকাটা চেককে দু'ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

**(ক) সাধারণ দাগকাটা চেক (General crossed cheque) ঃ** যে দাগকাটা চেকের সমান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে কিছু লেখা থাকে না বা লেখা থাকলেও কোন ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে না তাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলে। যে কোন ব্যাংক হিসাবে এ ধরণের চেক জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

**(খ) বিশেষ দাগকাটা চেক (Special crossed cheque) ঃ** যে দাগকাটা চেকের সমান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে কোন ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হয়, তাকে বিশেষ দাগকাটা চেক বলে। এরূপ চেকের অর্থ দাগের ভিতর যে ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে কেবলমাত্র সেই ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।

**৪। ভ্রমণকারীর চেক (Travellers Cheque) ঃ** ব্যাংক ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে এক বিশেষ ধরনের চেক ইস্যু করে, যাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ভ্রমণকারীরা দেশের বাইরে গিয়ে এ চেকের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংকের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

**৫। মার্কেট চেক (Market Cheque) ঃ** যে চেকের সাহায্যে বাজার হতে দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করা যায় তাকে মার্কেট চেক বা বাজার চেক বলে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি উন্নত দেশে এ জাতীয় চেকের প্রচলন দেখা যায়। বাংলাদেশে কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক 'চেক কার্ড' নামে এক ধরনের কার্ড সীমিত পরিসরে ইস্যু করে থাকে, যার দ্বারা নির্দিষ্ট বড় বড় দোকান থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়।

**৬। উপহার চেক ( Gift Cheque) ঃ** যে চেক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে প্রদান করা যায়, তাকে উপহার চেক বলে। এরূপ চেক অনেকটা প্রাইজবন্ডের মত। এ জাতীয় চেকের মাধ্যমে একদিকে নির্দিষ্ট মেয়াদে সুদ পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের কিছু কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক এ জাতীয় চেক ইস্যু করে থাকে। এ চেক যে কোন সময় ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখায় ভাঙানো যায়।

**৭। ফাঁকা চেক ( Blank Cheque) ঃ** যে চেক সবকিছু যথাযথভাবে পূরণ করা হলেও টাকার অঙ্কের ঘর খালি রেখে আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক স্বাক্ষর প্রদান করে তাকে ফাঁকা চেক বা নিরঙ্ক চেক বলে। এক্ষেত্রে প্রাপক নিজে টাকার অংক লিখে তা ব্যাংক থেকে ভাঙ্গিয়ে থাকে। ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে বলা হয়েছে, "নিরঙ্ক চেক হচ্ছে এমন একটি চেক যাতে প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর থাকে, টাকার পরিমাণ বা প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে না। প্রাপক তার সুবিধামত টাকার অঙ্ক বসিয়ে নেয়। তবে প্রস্তুতকারক ইচ্ছে করলে টাকার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে।"

**৮। খোলা চেক (Open Cheque) ঃ** যে চেকে কারও নাম লিখা হয় না বা দাগকাটা হয় না তাকে খোলা চেক বলে। এরূপ চেক অবাধে হস্তান্তরযোগ্য এবং চেকের যে কোন ধারক একে আদেশ চেক বা দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করতে পারে।

**৯। প্রত্যায়িত চেক (Certified Cheque) ঃ** যে চেক প্রস্তুতের পর উপস্থাপনের আগে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত (Certified) হয় তাকে প্রত্যায়িত চেক বা অনুমোদনপ্রাপ্ত চেক বলে। সাধারণত এরূপ প্রত্যয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট চেকের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। ব্যাংক অত্যন্ত স্বচ্ছল ও বিশ্বস্ত গ্রাহককে এ ধরনের চেক ইস্যু করে থাকে।

**১০। পূর্ব-তারিখের চেক (Ante-dated Cheque) ঃ** আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক যে তারিখে চেক ইস্যু করে থাকে, চেকে যদি উক্ত তারিখ না দিয়ে যদি পূর্ববর্তী কোন তারিখ দেয়া হয় তাহলে উক্ত চেককে পূর্ব তারিখের চেক বলা হয়। যেমন– জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের স্থলে ১৫ তারিখ লেখা হল। এরূপ ক্ষেত্রে চেকে উল্লিখিত তারিখ ছয় মাসের মধ্যে হলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করে, অন্যথায় নয়।

**১১। পর-তারিখের চেক (Post-dated Cheque) ঃ** আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক যে তারিখে চেক ইস্যু করে থাকে, চেকে যদি উক্ত তারিখ না দিয়ে পরবর্তী কোন তারিখ দেয়া হয়, তাকে পর-তারিখের চেক বলে। এরূপ চেকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখের পূর্বে চেকের টাকা উত্তোলন করা যায় না।

**১২। বাসি চেক (Stale Cheque) ঃ** সাধারণত চেক ইস্যু করার দিন হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত চেকের মর্যাদা বলবৎ থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন না করলে পরবর্তীতে চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না। এ জাতীয় চেককে বাসি চেক বা তামাদি চেক বলা হয়। অর্থাৎ যদি কোন চেক ০১-০১-২০১৪ ইং তারিখে ইস্যু করা হয় তাহলে ৩০-০৬-২০১৪ ইং পর্যন্ত চেকটি বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ০১-০৭-২০১৪ ইং পর্যন্ত তারিখ হতে চেকটি বাসি বা তামাদি চেক হিসেবে গণ্য হবে।

**১৩। হারানো চেক (Lost Cheque) ঃ** যদি কোন বৈধ চেক চুরি হয় অর্থাৎ চেক প্রস্তুতের পর ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে কোন চেক চুরি করে নিয়ে যায় তাকে চুরি করা চেক বলে। এক্ষেত্রে এর ধারককে অবশ্যই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে চেক সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করলে এর জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যায় না।

**১৪। চুরি করা চেক (Stolen Cheque) ঃ** যদি কোন বৈধ চেক চুরি হয় অর্থাৎ চেক প্রস্তুতের পর ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে কোন চেক চুরি করে নিয়ে যায় তাকে চুরি করা চেক বলে। এক্ষেত্রে এর ধারককে অবশ্যই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে চেক সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করলে এর জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যায় না।

### ৩.১১ প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ঃ

প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণের দলিল। রপ্তানীকারী তার পণ্যের মূল্য আমদানিকারীর নিকট থেকে যথাসময়ে পাবার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে, তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হলে আমদানিকারককে প্রথমেই রপ্তানিকারকের অনুকূলে ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুলতে হয়। ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারকের রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। যদি আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করতে অসমর্থ হয় অথবা পরিশোধ না করে তাহলে রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট হতে পণ্যসামগ্রীর মূল্য আদায় করতে পারে বা ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য থাকে।

**নিচে প্রত্যয়পত্রের একটি নমুনা দেয়া হল ঃ**

**প্রত্যয়পত্র**

**পূবালী ব্যাংক লিমিটেড** ২ জুলাই, ২০১৪ ইং
দিলকুশা শাখা, ঢাকা, বাংলাদেশ
টাকা = ১৫,০০০.০০

নং ১০১২০৩
**বরাবর,**
**মেসার্স হক এন্ড কোং**
১০৭, কে সি গুহ রোড
মাদ্রাজ, ভারত।

**সুধীবৃন্দ,**

আমাদের মক্কেল মেসার্স পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা–এর বরাবরে প্রেরিত পণ্যের মূল্য বাবত ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকার বিনিময় বিল আমাদের বরাবরে প্রস্তুত করতে পারেন।

এই প্রত্যয়পত্রের জন্য প্রস্তুতকৃত বিনিময় বিল অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে এবং এটি ২ জুলাই তারিখে ইস্যুকৃত ১০১২ নং প্রত্যয়পত্রের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে তা বিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অত্র তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস পর প্রত্যয়পত্রের মেয়াদ শেষ হবে।

আমরা এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এই প্রত্যয়পত্রের অধীনে প্রস্তুতকৃত বিনিময় বিল যথাযথভাবে উপস্থাপিত হলে আমরা বিলে স্বীকৃতি প্রদান করব এবং মেয়াদ শেষে মূল্য পরিশোধ করব।

**আপনার বিশ্বস্ত,**
**মোঃ হামিদুল হক মামুন**
ব্যবস্থাপক
**পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা**

### ৩.১১.১ প্রত্যয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Necessity and importance of Letter of Credit) ঃ

ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রত্যয়পত্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরত্বপূর্ণ ঋণের দলিল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ব্যবসা–বাণিজ্যের লেনদেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল ঃ

**১। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য (Import & export trade) ঃ** প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজ হয়ে থাকে। সাধারণত রপ্তানি বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয়ই একে অপরের নিকট অপরিচিত হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্র ঋণের দলিল হিসেবে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজতর করে থাকে।

**২। মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান (Promising to pay) ঃ** প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে। আমদানিকারক পণ্যের মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হলে বা মূল্য পরিশোধ না করলে রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করতে পারে।

**৩। লেনদেন নিষ্পত্তি (Closing of transaction) ঃ** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তিতে প্রত্যয়পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক সহজে অর্থ পরিশোধ করতে পারে এবং রপ্তানিকারকও সহজে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

**৪। আমদানিকারককে আমদানিতে সহায়তা (Help importer to import) ঃ** প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকগণ সহজে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। আমদানিকারককে নগদ অর্থে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হয় না এবং আমদানিকারকের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে প্রত্যয়পত্র রপ্তানিকারককে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে।

**৫। ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস (Decreasing business risk) ঃ** প্রত্যয়পত্র ঋণের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যয়পত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং, প্রত্যয়পত্র চুরি হলে বা হারিয়ে গেলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণে প্রত্যয়পত্র অধিকতর নিরাপদ ঋণের দলিল এবং ব্যবসায়ীদিগকে ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে থাকে।

**৬। ব্যাংকিং কার্যক্রমে সহায়তা (Help banking) ঃ** প্রত্যয়পত্র ইস্যু বা প্রস্তুত করার মাধ্যমে ব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তিকারী হিসেবে মুনাফা অর্জন করে থাকে। সুতরাং, দেখা যায় যে প্রত্যয়পত্রের সাহায্যে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম বিভিন্ন দিক হতে উপকৃত হয়ে থাকে।

**৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা (Help economic development) ঃ** প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। ফলে পণ্যসামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও গতিশীল করতে সহায়তা করে থাকে।

**৮। ভ্রমণকারীদের সহায়তা (Help to travellers) ঃ** ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়পত্র সহায়তা করে থাকে। ভ্রমণকারিগণ নগদ টাকার পরিবর্তে প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনের সময় ইস্যুকৃত ব্যাংক বা প্রতিনিধি ব্যাংক হতে প্রত্যয়পত্র উপস্থাপন করে টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

**৯। বাট্টাকরণের সুবিধা (Discounting facilities) ঃ** প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের ভিত্তিতে বিনিময় বিল বাট্টা করে নগদ টাকা সংগ্রহ করা যায়। অর্থাৎ নগদ টাকার প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই বিল বাট্টা করে রপ্তানিকারক নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

**১০। উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা (Help to maintain standard life) ঃ** প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জনগণকে উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা করে থাকে।

**১১। ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি (Create relation of business) ঃ** প্রত্যয়পত্র দু'দেশের মধ্যকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রত্যয়পত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ঋণের দলিল। প্রত্যয়পত্র ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একেবারেই অচল।

## অনুশীলনী-৩

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। ইংরেজী `Bank' শব্দটি কোন্ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে?**

**উত্তর ঃ** ইংরেজি `Bank' শব্দটি প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Bangne, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

**২। প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংক বলতে অর্থ বিনিময় ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। যার কাজ হচ্ছে এক শ্রেণির লোকের নিকট থেকে টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য এক শ্রেণির লোককে তা ঋণ হিসেবে প্রদান করা।

**৩। ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও।** [বাকাশিবো-২০০৪, ২০১৩]

**অথবা, ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** ব্যাংক বলতে এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যা আমানত গ্রহণ, ঋণদান, অর্থ ও ঋণ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

**৪। ব্যাংকের প্রধান কাজ কী?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর** ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনগণের সঞ্চয়সমূহ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং জমাকৃত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ প্রদান করা। এছাড়াও ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কার্য সমাধান করে থাকে।

**৫। একটি দেশের প্রধান ব্যাংক কোন্‌টি?**

**উত্তর** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান ব্যাংক।

**৬। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪(T)]

অথবা, **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** যে ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবসায় ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

**৭। বিনিময় ব্যাংক কী?**

**উত্তর** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যকার লেনদেন নিষ্পত্তি, কাজে যে ব্যাংক নিয়োজিত থাকে তাকে বিনিময় ব্যাংক বলা হয়।

**৮। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?**

**উত্তর** যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়।

**৯। গ্রামীণ ব্যাংক কী?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ১১, ০৯]

**উত্তর** যে ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র্য ও ভূমিহীন জনসাধারণকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে, তাকে গ্রামীণ ব্যাংক বলে।

**১০। আন্তর্জাতিক ব্যাংক কী?**

**উত্তর** জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক সমূহকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলা হয়।

**১১। কোন ব্যাংক দেশের মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে?**

**উত্তর** দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু ও মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে।

**১২। বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে?**

**উত্তর** বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

**১৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে?**

**উত্তর** বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে অর্থ সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশিয় মুদ্রার মান তথা ক্রয় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে থাকে। আবার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে থাকে।

**১৪। শিল্প ব্যাংক কী?**

**উত্তর** যে ব্যাংক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করে সে ব্যাংককে শিল্প ব্যাংক বলা হয়।

**১৫। শিল্প ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?**

**উত্তর** শিল্প ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে চেক, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

**১৬। ব্যাংক হিসাব কী?**

**উত্তর** ব্যাংক যে পদ্ধতিতে জনসাধারণের আমানতি টাকা জমা ও ফেরত দেয়ার হিসাব রাখে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

**১৭। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত কয় প্রকার হিসাব সংরক্ষণ করে ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**অথবা, হিসাব কত প্রকার ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০০২, ০৫]

**উত্তর** বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত তিন প্রকার হিসাব সংরক্ষণ করে, যথা–

১। চলতি হিসাব, ২। সঞ্চয়ী হিসাব এবং ৩। স্থায়ী হিসাব।

**১৮। চলতি হিসাব কাকে বলে?**

**উত্তর** যে হিসাবে আমানতকারীগণ ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখতে ও উত্তোলন করতে পারে সে হিসাবকে চলতি হিসাব বলা হয়।

**১৯। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর** বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩টি, যথা–

১। সোনালী ব্যাংক ২। জনতা ব্যাংক এবং ৩। অগ্রণী ব্যাংক।

**২০। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?**

**উত্তর** বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক।

**২১। বাংলাদেশের বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ব্যাংক কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর** বাংলাদেশে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ব্যাংক ৩টি, যথা ঃ

১। উত্তরা ব্যাংক লিঃ ২। রূপালী ব্যাংক লিঃ ৩। পূবালী ব্যাংক লিঃ।

**২২। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কত সালে এ ব্যাংকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে এ ব্যাংকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে।

**২৩। গ্রুপ ব্যাংকিং কী?**

**উত্তর** ব্যাংকিং ব্যবসায়ে কার্যরত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক যখন একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে এসে জোট গঠন করে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় গ্রুপ ব্যাংকিং।

**২৪। ব্যাংক ওভারড্রাফট বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৫]

**উত্তর** ব্যাংক গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত যে টাকা আগাম হিসেবে তার গ্রাহককে প্রদান করে তাকে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট বলা হয়।

**২৫। ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী?** [বাকাশিবো-২০০২, ০৫, ১০, পরি-১০, ১১]

**উত্তর** ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সহজ অর্থে, ঋণের পরিমাণকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার কৌশলকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। অন্যভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি ও মঞ্জুর কার্যক্রমের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকে বুঝানো হয়।

মোট কথা, দেশের অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সরবরাহের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচিকে যে বিশেষ কৌশলে বা পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

**২৬। হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী?**

**অথবা, হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩]

**উত্তর** যে সমস্ত দলিলের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে।

**২৭। চেক কী?** [বাকাশিবো-২০১১]

**অথবা, চেকের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** চেক ব্যাংকের প্রতি আমানতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি শর্তহীন লিখিত আদেশনামা। এতে বাহককে অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার নির্দেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকে।

**২৮। ব্যাংক নোট কী?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও প্রচারিত বিভিন্ন মূল্যমানের নোটসমূহকে ব্যাংক নোট বলা হয়।

**২৯। চেক প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর** চেক প্রধানত তিন প্রকার, যথা ঃ

১। বাহক চেক, ২। হুকুম চেক এবং ৩। দাগ কাটা চেক।

**৩০। বাহক চেক কী?**

**উত্তর** যে চেকের টাকা যে কেহ ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে ঐ চেককে বাহক চেক বলা হয়।

**৩১। ফাঁকা চেক কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** যে চেকে শুধুমাত্র আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকে কিন্তু টাকার অংক লেখা থাকে না তাকে ফাঁকা চেক বলা হয়।

**৩২। ভ্রমণকারীর চেক কী?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ব্যাংক যে চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়।

**৩৩। উপহার চেক কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** যে চেক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে প্রদান করা যায় তাকে উপহার চেক বলা হয়।

**৩৪। ট্রেজারী বিল বা সরকারী বিল কী?**

**উত্তর ঃ** যে ঋণ দলিলের মাধ্যমে সরকার জনগণের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে তাকে ট্রেজারী বিল বলা হয়।

**৩৫। দাগ কাটা চেক কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০০, ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৯, পরি-২০১২, ১৩]

**উত্তর ঃ** চেকের উপরিভাগের বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দু'টো সমান্তরাল রেখা টানা হলে তাকে দাগ কাটা চেক বলে।

**৩৬। দাগ কাটা চেক কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ঃ** দাগ কাটা চেক প্রধানতঃ দু' প্রকার, যথা ঃ ১। সাধারণভাবে দাগকাটা চেক ও ২। বিশেষভাবে দাগ কাটা চেক।

**৩৭। প্রত্যয়পত্র কী?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১০, পরি-২০১০, ১১]

**অথবা, প্রত্যয় পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** রপ্তানীকারী তার পণ্যের মূল্য আমদানীকারীর নিকট থেকে যথা সময়ে পাবার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে, তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

**৩৮। চেকের অমর্যাদা কী?**

**উত্তর ঃ** ব্যাংকে উপস্থাপিত কোন চেকে কোন প্রকার অনিয়ম থাকলে ব্যাংক টাকা প্রদান না করে চেকটি ফেরত দেয়, একেই চেকের অমর্যাদা বা অসম্মান বলে।

**৩৯। বিনিময় বিলের স্বীকৃতি বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** বিনিময় বিল প্রস্তুতের পর তা প্রথমত আদিষ্টের স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপিত হয়। আদিষ্ট বিলটি পাবার পর বিলের যাবতীয় শর্ত তার মনঃপুত হলে বিলে সম্মতি সূচক স্বাক্ষর প্রদান করে, তাকে বিলের স্বীকৃতি বলে।

**৪০। হুণ্ডি কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** আঞ্চলিক হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যার আইনগত কোন ভিত্তি নেই। পাক-ভারত উপমহাদেশের বহুদিন আগে থেকেই অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হুণ্ডির ব্যবহার হয়ে আসছে।

**৪১। বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো হলো– চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়নপত্র, অঙ্গিকারপত্র ইত্যাদি।

**৪২। বিনিময় বিল কী?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১]

**অথবা, বিনিময় বিল বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** প্রস্তুতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে লিখিত শর্তহীন আদেশ দেয় তাকে বিনিময় বিল বলে।

**৪৩। বিনিময় বিলে কয়টা পক্ষ থাকে ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** বিনিময় বিলে মূলত তিনটি পক্ষ থাকে, যথা– আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ১০]

**অথবা, ব্যাংক কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** ব্যাংক অর্থ ও অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি জনগণের সঞ্চয়সমূহ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং জমাকৃত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ মঞ্জুর করা ছাড়াও ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কার্য সমাধা করে থাকে।

সুতরাং ব্যাংক বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণ নিয়ে কারবার করে।

**২। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

**উত্তর ঃ** মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

১। সরকারি ব্যাংক, ২। বেসরকারি ব্যাংক এবং ৩। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক।

**৩। সরকারি ব্যাংক কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ঃ** যে সকল ব্যাংক সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অথবা সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয়করণ করার মাধ্যমে সরাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণে থেকে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে ঐ সমস্ত ব্যাংককে সরকারি ব্যাংক বলে।

**উদাহরণ ঃ** সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ইত্যাদি।

**৪। ব্যাংকের গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ দেখাও।**

**উত্তর ঃ** গঠনের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

১। একক ব্যাংক, ২। শাখা ব্যাংক, ৩। চেইন ব্যাংক,
৪। গ্রুপ ব্যাংক এবং ৫। মিশ্র ব্যাংক।

**৫। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?** [বাকাশিবো-২০১০, ১২, ১৪(T)]

**অথবা, বাণিজ্যিক বাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?**

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে থাকে। ঋণ গ্রহীতাকে মঞ্জুরিকৃত ঋণ নগদে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতার নামে আমানত হিসেবে ঋণ জমা রাখা হয়। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেয় না। এভাবে ঋণকৃত অর্থ আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

**৬। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক কী লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়?**

**উত্তর ঃ** নতুন শিল্প স্থাপন, বিদ্যমান শিল্প-কারখানাসমূহের সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে শিল্প ঋণের যোগান এবং শিল্প সংক্রান্ত পরামর্শ দানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৭। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?**

[বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, পরি-১১(R), ১২, পরি-১২, ১৩, ১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর ঃ** নিম্নোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে ঃ

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার সরবরাহ ও মুদ্রার মান বজায় রাখে।
২। ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশী মুদ্রার মান রক্ষা করে।
৪। মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে সুষ্ঠু ও কার্যকর মুদ্রাবাজার গড়ে তোলে।
৫। মুদ্রা বাজারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখে।

**৮। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে?**

**উত্তর ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণকল্পে নিম্নোক্ত পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে থাকে ঃ

১। ব্যাংকের হার নিয়ন্ত্রণ, ২। খোলাবাজারী কার্যক্রম,
৩। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, ৪। নৈতিক চাপ প্রয়োগ,
৫। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

**৯। আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আমানতকারীদের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং আমানতকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিবামাত্র পরিশোধ করা। আমানতকারী যে কোন সময় ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে এ অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ উঠাতে পারে। তাই আমানতককৃত অর্থের সঠিক হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক আমানতকারীর নামে পৃথক পৃথক শিরোনামে ব্যাংক আমানতকারীর সাথে সংঘটিত লেনদেনসমূহ ব্যাংকের হিসাব বহিতে রেকর্ড করে থাকে। রেকর্ডকৃত এ হিসাবসমূহ আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত।

**১০। সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** যে হিসাবে ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখা যায়। কিন্তু জমাকৃত টাকা সপ্তাহে মাত্র দু'বারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারীগণ ব্যাংক থেকে স্বল্পহারে সুদ পেয়ে থাকে। স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়।

**১১। ডিপোজিট পেনশন স্কীম কী?** [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর ঃ** যে হিসাবে জমাকৃত টাকার মাধ্যমে আমানতকারীদের ভবিষ্যতে পেনশনের সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়, তাকে ডিপোজিট পেনশন স্কীম বলা হয়। এ হিসাবে আমানতকৃত টাকা চুক্তি অনুযায়ী মাসিক কিস্তির মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিয়ে থাকে।

**১২। ব্যাংকের পাস বই কী?**

**উত্তর ঃ** ব্যাংক যে বইয়ে আমানতকারীদের হিসাবে জমাকৃত ও উঠানো টাকার হিসাবসহ স্থিতি টাকার বিবরণ লিখে আমানতকারীদেরকে সরবরাহ করে, তাকে ব্যাংকের পাস বই বলে। পাস বইয়ের উপরিভাগে হিসাব নম্বর, আমানতকারীর নাম ও ঠিকানা লেখা থাকে এবং ভিতরে তারিখ, বিবরণ, চেক নম্বর, জমার পরিমাণ, উত্তোলনের পরিমাণ, মোট টাকা ও স্বাক্ষর ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

**১৩। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯]

অথবা, **গ্রামীণ ব্যাংক কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

১। গ্রামের দরিদ্র মানুষদেরকে মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করা।

২। গ্রামের ভূমিহীন লোকদের সংগঠিত করে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা।

৩। গ্রামে দরিদ্র ও বেকার লোকদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। গ্রামের দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

৫। দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬। গ্রামের ভূমিহীন ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়তা করা।

৭। সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের জন্য সহজ ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা।

**১৪। দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা কী?** [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর ঃ** বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোয় এনে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। এতে গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন লোকেরা স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ পায়।

২। এ ব্যাংক ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ভূমিহীন ঋণ গ্রহীতাদের গ্রুপভিত্তিক সঞ্চয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

৩। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দুঃস্থ ও বেকার নারী-পুরুষের জন্য স্বকর্ম প্রকল্প তৈরি করে তাদেরকে প্রকল্প চালানোর সুযোগ করে দেয়।

৪। কোন প্রকার জামানত ছাড়াই গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের গরিব ভূমিহীনদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। এতে সহজেই গ্রামের গরিব লোকদের পক্ষে ছোট-খাট ব্যবসায় গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৫। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও গরিব পরিবারের মহিলাদের খণ্ডকালীন কাজের সংস্থান করে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬। এ ব্যাংক গ্রামের নিঃস্ব ও ভূমিহীন ব্যক্তিবর্গকে গৃহনির্মাণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে সব রকমের সাহায্য ও অর্থায়ন করে থাকে।

৭। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে থাকে।

**১৫। হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** সাধারণ অর্থে যে সমস্ত দলিলের মলিকানা হস্তান্তর করা যায়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে। অন্যভাবে বলা যায়, আইন অনুযায়ী বা প্রচলিত রীতি মোতাবেক যে সমস্ত ঋণের দলিলসমূহ একজনের নিকট হতে অন্যজনের নিকট হস্তান্তরের সাথে সাথে দলিলের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে। হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলতে ঋণের দলিলের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্যতাকে বুঝায়।

**১৬। হুকুম চেক কী?**

**উত্তর** যে চেকের টাকা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য ব্যাংককে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে হুকুম চেক বলা হয়। এরূপ চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে "অথবা আদেশানুসারে" কথাটি লেখা থাকে। হুকুম চেকে প্রাপকের নামের স্থানে অবশ্যই প্রাপকের নাম থাকতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক চেকের টাকা পরিশোধ করবে না। এরূপ চেকের অর্থ সাধারণত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়।

**১৭। বাসি চেক কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** ইস্যু করার দিন হতে পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত চেকের মেয়াদ বলবৎ থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন না করলে পরবর্তীতে চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না। এ জাতীয় চেককে বাসি চেক বা তামাদি চেক বলা হয়।

**১৮। বাহক চেক বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যে চেকের টাকা যে কেহ ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে ঐ চেককে বাহক চেক বলা হয়। বাহক চেকের ক্ষেত্রে চেক বহনকারী ব্যক্তিই চেকের মালিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এরূপ চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে। প্রাপকের নামের স্থানে প্রাপকের নাম, নিজ অথবা স্বয়ং ইত্যাদি শব্দ লেখা হয়। বাহক চেক হস্তান্তরের জন্য কোন প্রকার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

**১৯। প্রত্যয়পত্র বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, পরি-১২]

**উত্তর** প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণের দলিল। রপ্তানিকারক তার পণ্যের মূল্য আমদানিকারকের নিকট থেকে যথাসময়ে পাবার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হলে আমদানিকারককে প্রথমেই রপ্তানিকারকের অনুকূলে ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুলতে হয়। ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে রপ্তানি কারকের রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্যে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। যদি আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করতে অসমর্থ হয় অথবা পরিশোধ না করে তাহলে রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট হতে পণ্যসামগ্রীর মূল্য আদায় করতে পারে বা ব্যাংক মূল্য ব্যাংকের নিকট হতে পণ্য সামগ্রীর মূল্য আদায় করতে পারে বা ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য থাকে।

**২০। ভ্রমণকারীর চেক কী?**

**উত্তর** ব্যাংক ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে যে চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ভ্রমণকারীর চেক অবশ্যই প্রাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ইস্যুকৃত ব্যাংক কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হতে হবে। বর্তমানে ভ্রমণকারীর চেক ঋণের দলির হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, "ঋণ দলিলের মাধ্যমে চেক ইস্যুকৃত ব্যাংক তার শাখা ব্যাংক অথবা প্রতিনিধি ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপক বা ভ্রমণকারীকে পরিশোধের জন্য যে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়।"

**২১। প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব লিখ।** [বাকাশিবো-২০০৪, ১১, ১৩]

অথবা, **প্রত্যয়পত্র কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে?**

**উত্তর** ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রত্যয়পত্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরত্বপূর্ণ ঋণের দলিল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল ঃ

১। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজ হয়ে থাকে। একটি ঋণের দলিল হিসেবে এটি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সহায়তাকরে।

২। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে।

৩। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক সহজে অর্থ পরিশোধ করতে পারে এবং রপ্তানিকারকও সহজে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৪। প্রত্যয়পত্র আমদানিকারকের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে রপ্তানিকারককে নিশ্চয়তা প্রদান করে পণ্য আমদানির পথ সুগম করে থাকে।

৫। প্রত্যয়পত্র অধিকতর নিরাপদ ঋণের দলিল এবং এটি ব্যবসায়ীদিগকে ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে।

৬। প্রত্যয়পত্র ইস্যু বা প্রস্তুত করার মাধ্যমে ব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তিকারী হিসেবে মুনাফা অর্জন করে থাকে।

৭। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে।



**২২। দাগকাটা চেক নমুনাসহ বুঝিয়ে দাও।** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, পরি-১০]

**উত্তর ঃ** যে চেকের উপরের বাম কোনে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টানা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে। সমান্তরাল রেখা দুটির মাঝখানে & Co: Not Negotiable; A/C payee ইত্যাদি কথা লিখে বা না লিখে দাগকাটা যায় এ জাতীয় চেক যে কোন ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে ধারক আদেষ্টা ব্যাংক হতে টাকা সংগ্রহ করত পারে।

দাগকাটা চেকের নমুনা ঃ

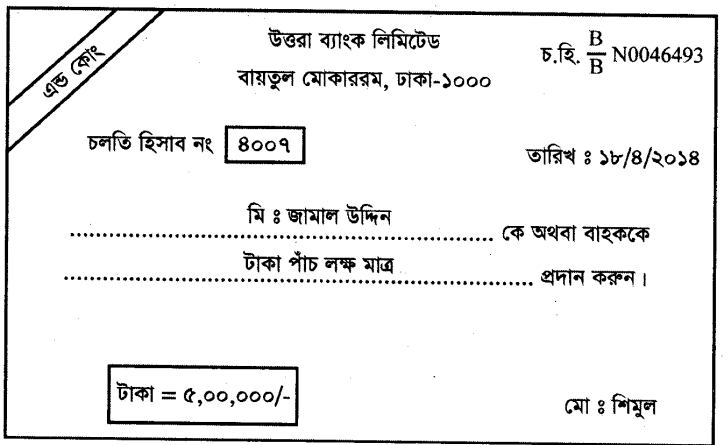


**২৩। পাঁচটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম লিখ।**

**উত্তর ঃ**

| ক্রমিক নং | দেশের নাম | কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম |
|---|---|---|
| ১। | বাংলাদেশ | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ২। | ভারত | রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া |
| ৩। | পাকিস্তান | স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান |
| ৪। | ইংল্যান্ড | দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড |
| ৫। | আমেরিকা | দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম। |

**২৪। এ.টি.এম (A.T.M) বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** এ.টি.এম (A.T.M) বলতে Automated Teller Machine কে বুঝায়। ব্যাংক এ.টি.এম এর সুবিধা গ্রহণকারীকে একটি এ.টি.এম কার্ড প্রদান করে। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ম্যাগনেটাইজড কার্ড। এতে প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য পৃথক গোপন (PIN) নম্বর থাকে, যা কেবলমাত্র ব্যাংক ও গ্রাহকই জানে। গ্রাহক এ কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়েও যেকোন এ.টি.এম বুথ হতে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে।

**২৫। ক্রেডিট (Credit) কার্ড বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** এটি একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটাইজড কার্ড। ব্যাংক নির্দিষ্ট অর্থ মূল্যের ক্রেডিট গ্রাহকের অনুকূলে ইস্যু করে। উক্ত কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক বাজার হতে পণ্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা কার্ডের মালিককে দিয়ে তার বিক্রীত পণ্যের বিলে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। বিলটি ক্রেতার ব্যাংককে জমা দিয়ে মূল্য সংগ্রহ করে থাকে এবং ব্যাংক মালিকের নিকট হতে পরিশোধিত অর্থ সংগ্রহ করে নেয়।

**২৬। অন-লাইন (On-line) ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** অন-লাইন (On-line) ব্যাংকিং হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ভিত্তিতে আধুনিক ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থা। অন-লাইন ব্যাংকিং এর কার্যক্রম স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজের অবস্থানে বসে ব্যাংকিং কার্য সমাধা করতে পারে।

**২৭। বিনিময় বিল বাট্টাকরণ বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** বিনিময় বিলের আদেষ্টা বা ধারক বিলটি পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে বিলটি নগদ টাকায় রূপান্তরে প্রয়োজন হরে, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছুটা কম টাকায় বিলের স্বত্ব বিক্রয় করে দিলে উহাকে বিনিময় বিল বাট্টাকরণ বলে।

**২৮। বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আর্থিক সংকটে পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসে। এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে ঋণ দেয়। তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

**২৯। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।** [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর ঃ** হস্তান্তরযোগ্য দলিলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়–

(i) হস্তান্তরযোগ্য দলিল একটি লিখিত দলিল।
(ii) যথাযথ অনুমোদন সহকারে এর মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়।
(iii) নগদ টাকার মতই অবাধে বিনিময় করা যায়।
(iv) এরূপ দলিলে প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর থাকে।
(v) যে কোন প্রকার মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়।

**৩০। বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

(i) বিনিময় বিল অর্থ-প্রদানের একটি শর্তহীন আদেশ।
(ii) এটি অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।
(iii) বিনিময় বিল অবশ্যই আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।
(iv) এটি নির্দিষ্ট সময় পরে বা চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হতে হবে।
(v) বিনিময় বিলের টাকা দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য।

**৩১। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন যে কোন দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। দেশের ঋণের পরিমাণ কার্যস্তরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচিকে যে বিশেষ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ব্যাংক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৩.১ ও ৩.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যাংকের তালিকা দাও।

**উত্তর সংকেত ঃ** ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যাংকের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ এর (খ) অংশ দ্রষ্টব্য।

৪। মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ১০, ১১]
অথবা, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর। [বাকামিবো-২০০৯, ১৩, ১৪(T)]
অথবা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।
অথবা, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে শিল্প ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.৮ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮]

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.৮ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। বাংলাদেশের শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে এদেশের শিল্প ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.৮ ও ৩.৫.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। ব্যাংক হিসাব কী? বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাবের বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** ৩.৬ ও ৩.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা দাও। ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকার হিসাব খোলার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.৬ ও ৩.৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২। সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে? বিভিন্ন শ্রেণির সঞ্চয়ী হিসাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.৬ এর ৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০০৪, পরি-১০, ১৩(T)]
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** ৩.৫.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪। হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে কী বুঝায়? হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** ৩.৮ ও ৩.৮.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

**উত্তর সংকেত** ৩.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৬। চেক বলতে কী বুঝ? চেকের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.৯ (১) ও ৩.১০ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রত্যয়পত্র কী? প্রত্যয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৩.১১ ও ৩.১১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



********

# অধ্যায়-৪

# অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য
# (Home & Foreign Trade)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৪.০ ভূমিকা; ৪.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা; ৪.২ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকারভেদ; ৪.৩ পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য; ৪.৪ বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা; ৪.৫ বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ; ৪.৬ বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণিবিভাগ; ৪.৭ পণ্য আমদানি ও পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি; ৪.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব*

## ৪.০ ভূমিকা (Introduction) ঃ

সাধারণভাবে পরস্পরের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানকে বাণিজ্য বলা হয়। একই দেশের ভেতরে সব অঞ্চলে সব জিনিস সমানভাবে উৎপন্ন হয় না। কোন দ্রব্য হয়তো একটি বিশেষ অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হয়; আবার একই জিনিস অন্য অঞ্চলে কম উৎপন্ন হয় অথবা একেবারেই উৎপন্ন হয় না। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে এরূপ বৈষম্য থাকার দরুণই উদ্বৃত্ত অঞ্চল ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের লেনদেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। জাতীয় সীমারেখার অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের এরূপ লেনদেন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা (Home Trade) নামে পরিচিত। কোনও দেশের আঞ্চলিক উৎপন্ন দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের জন্যই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

## ৪.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা (Definition of Home Trade) ঃ

যখন কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সংঘটিত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ একটি দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদির লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় কার্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে একই দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকার্যাদির বিনিময় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি দেশের আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ বা বিশেষী করণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের তারতম্যের কারণে কোন দেশের বিভিন্ন এলাকায় বা অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদিত হয় বা বিশেষায়ণের সুবিধা লাভ করে থাকে। ফলে যে অঞ্চলে যে দ্রব্য ভাল উৎপাদিত হয় না, সে অঞ্চলে সেগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য অঞ্চল থেকে তা আনয়ন করতে হয়। এভাবে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের পণ্য বা সেবার আদান-প্রদান বা বিনিময় হতেই অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বা বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে।

সুতরাং বলা যায় যে, একটি দেশের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিংবা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের ব্যবসায় বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন বা বিনিময় সংঘটিত হলে তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

### ৪.১.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Home Trade) ঃ

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল ঃ

**১। ভৌগোলিক সীমানা (Geographical Area) ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এরূপ ব্যবসায় একটি দেশের ভৌগোলিক বা সার্বভৌম সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলের মধ্যে এ ধরণের বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

**২। ক্রেতা ও বিক্রেতা (Buyer and Seller) ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে জড়িত পক্ষদ্বয় অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে।

**৩। লেনদেন পদ্ধতি (Method of Transaction) ঃ** এ জাতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনসমূহ অর্থাৎ পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় নগদ ও বাকি উভয় পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

**৪। মূল্য পরিশোধ (Payment) ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল ধরনের লেনদেনের মূল্যই দেশীয় মুদ্রায় দেশের অভ্যন্তরে পরিশোধ করা হয়।

**৫। আয়তন (Size) ঃ** এ ধরনের বাণিজ্য সাধারণত ছোট আকারে সংঘটিত হয়। তবে এরূপ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বৃহৎ আয়তনেরও হতে পারে।

**৬। মালিকানা (Ownership) ঃ** অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এক মালিকানা ও অংশীদারী কারবারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

**৭। পুঁজি (Capital) ঃ** এরূপ ব্যবসায় দেশের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয় বলে এতে তুলনামূলকভাবে বেশি পুঁজি লাগে না।

**৮। ঝুঁকি (Risk) ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ঝুঁকির পরিমাণ কম হয়।

**৯। সংগঠন ও পরিচালনা (Organisation and Management) ঃ** স্বল্প পুঁজি ও সীমিত পরিসরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় বলে এরূপ বাণিজ্যের সংগঠন ও পরিচালনা অনেকটা জটিলমুক্ত ও সহজসাধ্য। কোনরূপ পূর্ব প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে কেউ এ ধরনের ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে।

**১০। জনগণের চাহিদা (Public demand) ঃ** দেশীয় জনগণের চাহিদা পূরণকল্পে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

**১১। শুল্ক ও কর (Tax and Tariff) ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশের সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্ক ও কর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

**১২। ওজন ও পরিমাপ (Weight and Measurement) ঃ** দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি এবং স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নিয়ম-নীতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

## ৪.১.২ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্য (Objective of Home Trade) ঃ

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়।

২। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ।

৩। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

৪। সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

৬। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৭। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

## ৪.২ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকারভেদ (Types of Home Trade) ঃ

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দুই প্রকার; যথা–

১। পাইকারী ব্যবসায় এবং,

২। খুচরা ব্যবসায়।

**১। পাইকারী ব্যবসায় (Wholesale Trade) ঃ** উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে একযোগে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে অল্প অল্প করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করাকে পাইকারী ব্যবসায় বলে। পাইকারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিকে পাইকার বলা হয়। পাইকার মধ্যস্থ কারবারী হিসেবে পণ্যদ্রব্যের বণ্টন প্রণালিতে উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন কার্যকে সহজ করে তোলে।

**২। খুচরা ব্যবসায় (Retail Trade) ঃ** পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ভোগকারী ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রয় করাকে খুচরা ব্যবসায় বলে। যে ব্যক্তি খুচরা ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে তাকে খুচরা ব্যবসায়ী বলা হয়। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকার বা অন্য কোন সূত্র থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয় করে থাকে।

## ৪.৩ পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য (Differentiate Between Wholesale Trade and Retail Trade) ঃ

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় উভয়ই মধ্যস্থকারবারি হিসেবে পণ্যদ্রব্য বণ্টনকার্যে নিয়োজিত। কার্যগত দিক থেকে এদের মধ্যে কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যস্থিত পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | পাইকারী ব্যবসায় | খুচরা ব্যবসায় |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | উৎপাদনকারী বা আমদানিকারকের নিকট হতে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে খুচরা ব্যবসায়ীগণের নিকট বিক্রয় করার কার্যকে পাইকারী ব্যবসায় বলে। | পাইকারী ব্যবসায়ী বা অন্য কোন উৎস থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করার কার্যকে খুচরা ব্যবসায় বলে। |
| ২। বণ্টন প্রণালীতে অবস্থান | পণ্য বণ্টন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে এর অবস্থান। | খুচরা ব্যবসায়ের অবস্থান পাইকার এবং ভোক্তাদের মধ্যবর্তী স্থানে। |
| ৩। সংগঠন প্রকৃতি | পাইকারী ব্যবসায় একটি বৃহদায়তনের ব্যবসায় সংগঠন। | খুচরা ব্যবসায় একটি ক্ষুদ্রায়তনের কারবার সংগঠন। |
| ৪। মালিকানা | পাইকারী ব্যবসায় এক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী কোম্পানিরূপে গড়ে ওঠতে পারে। | অধিকাংশ খুচরা ব্যবসায়ই এক মালিকানা কারবারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। |
| ৫। মূলধন | এরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয়। | অপেক্ষাকৃত কম মূলধন নিয়েই খুচরা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা যায়। |
| ৬। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ | পাইকারী ব্যবসায়ী একত্রে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। | খুচরা ব্যবসায়ী কম পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে এবং কম পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করে। |
| ৭। পণ্যের প্রকার | পাইকারগণ সাধারণত একটি বা দু'টি পণ্য নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। | খুচরা ব্যবসায়ীগণ ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। |
| ৮। পণ্য সংগ্রহ ও বণ্টন | পাইকারী ব্যবসায়ীগণ উৎপাদক বা আমদাকিকারকের নিকট হতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট সরবরাহ করে। | খুচরা ব্যবসায়ীরা পাইকারদের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। |
| ৯। পণ্যমূল্য | পাইকারী ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। | পণ্যের খুচরা মূল্য সর্বদাই পাইকারী মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। |
| ১০। পণ্যের বৈচিত্রতা | সীমিত সংখ্যক পণ্য নিয়ে পাইকারী ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলে এক্ষেত্রে পণ্যের বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায় না। | খুচরা ব্যবসায়ীরা বিচিত্র রকমের পণ্য নিয়ে কারবার করে। |
| ১১। ব্যবসায়ের বিস্তৃতি | পাইকারী ব্যবসায়ের কার্যকলাপ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। | খুচরা ব্যবসায়ের কার্যকলাপ স্থানীয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। |
| ১২। অবস্থান | কম জনবসতিপূর্ণ অথচ ভাল যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাইকারী ব্যবসায় গড়ে ওঠে। | খুচরা ব্যবসায় সর্বদাই অধিক জনবসতিপূর্ণ ও সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানে গড়ে ওঠে। |
| ১৩। বণ্টন স্তর | পাইকারী ব্যবসায় বণ্টন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় এবং খুচরা ব্যবসায়ের পূর্ববর্তী স্তর। | খুচরা ব্যবসায় বণ্টন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর। |

| পার্থক্যের বিষয় | পাইকারী ব্যবসায় | খুচরা ব্যবসায় |
|---|---|---|
| ১৪। ক্রেতার শ্রেণী | খুচরা ব্যবসায়ী, শিল্পোৎপাদনকারী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীরা পাইকারী কারবারের অধিকাংশ ক্রেতা। | প্রকৃত ভোক্তারাই খুচরা ব্যবসায়ের ক্রেতা। |
| ১৫। সম্পর্ক | পাইকারী ব্যবসায়ীদের উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। | খুচরা ব্যবসায়ীদের পাইকার ও ভোক্তাদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকে। |
| ১৬। পণ্যের মজুতকরণ | পাইকারী ব্যবসায়ীকে একসাথে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করতে হয় বলে নিজস্ব অথবা ভাড়া করা গুদামে পণ্য মজুত করে রাখতে হয়। | খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয় করা হয় বলে পণ্য মজুতের জন্য আলাদা কোন গুদামঘরের প্রয়োজন হয় না। |
| ১৭। ঝুঁকি | পাইকারী ব্যবসায়ীকে গুদামজাতকৃত পণ্য বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসহ মূল্যের ওঠানামাজনিত ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। | খুচরা ব্যবসায়ীকে এ ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় না। খুচরা ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে। |
| ১৮। ঋণ সুবিধা | পাইকারী ব্যবসায়ীগণ অধিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। | খুচরা ব্যবসায়ে ঋণের সুবিধা কম থকে। |
| ১৯। মুনাফা | পাইকারী ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণ পণ্য লেদেন হয় বলে মুনাফার পরিমাণ বেশি হয়। | খুচরা ব্যবসায়ে অল্প পরিমাণ পণ্য লেনদেন হয় বলে মুনাফার পরিমাণ কম হয়। |
| ২০। সেবাদান | পাইকারী ব্যবসায়ী উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীকে প্রভূত সেবাদান করে। | খুচরাব্যবসায়ী ভোক্তাদেরকে সেবাদান করে। |



### ৪.৩.১ পাইকারি ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantage & Disadvantage of Wholesale Trade) ঃ

পাইকারি ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে ক্রয় করা যায়।
২। পাইকারি ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
৩। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে গুদামজাতকরণ সুবিধা পাওয়া যায়।
৪। উৎপাদকের পরিবহন ব্যয় হ্রাস পায়।
৫। পণ্যের প্রচার ও বিজ্ঞাপন কাজ সহজ হয়।

পাইকারি ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে অনেক সময় পাইকাররা পণ্যের উচ্চমূল্য ধার্য করে।
২। পাইকারি ব্যবসায় পরিচালনায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।
৩। পাইকারি ব্যবসায়ে বিচিত্র পণ্যের সমাবেশ ঘটানো যায় না।
৪। পাইকারি ব্যবসায়ে সবসময় ভোক্তার চাহিদানুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা যায় না।
৫। যেকোনো স্থানে পাইকারি ব্যবসায় স্থাপন করা যায় না।

## ৪.৪ বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা (Definition of Foreign Trade) ঃ

সাধারণভাবে বাণিজ্য বলতে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদির ক্রয়-বিক্রয় বা লাভজনক আদান-প্রদানকে বুঝায়। এ বাণিজ্য যখন দুটো দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়, তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। অর্থাৎ দু'দেশের মধ্যে যখন পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

বর্তমান বিশ্বের কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজ প্রয়োজন মেটাতে প্রত্যেক দেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সম্পদে সমৃদ্ধশালী। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরের মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ করা হয়। কোন দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ যে দেশে উক্ত পণ্যের ঘাটতি রয়েছে সে দেশে বিক্রি করা হয় এবং ঐ দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য নিজ দেশের ঘাটতি পূরণে ক্রয় করা হয়। পণ্য দ্রব্যের এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদানকে বলা হয় রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য, যাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

**প্রমাণ্য সংজ্ঞা ঃ**

১। **বিশিষ্ট মনিষী ডি. এম. মিথানী (D.M Mithani) বলেন,** "আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য" (Inermational trade is a trade among defferent countries or trade across political frontiers.)

২। **অধ্যাপক ডিন্ডাল বার্জারের (Prof. Dindle Berzer) মতে,** "দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে লেনদেনকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়।" (International trade is the transaction of goods and services between two or more soverign countries.)

৩। **প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এম. সি. ভ্যাইস (M.C. Vaish) বলেছেন,** "স্বাধীন অথবা সার্বভৌম রাষ্ট্র বা দেশসমূহের জনগণের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।" (International trade may be defined as the exchange of goods and services among the citizens of independent or sovereign states or countries.)

সুতরা, উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্য সামগ্রী ও সেবাকর্মাদির ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদানকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

## ৪.৪.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পার্থক্য (Difference Between Home Trade & Forcign Trade) ঃ

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য | বৈদেশিক বাণিজ্য |
|---|---|---|
| ১। প্রকৃতি | এরূপ বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আওতা ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। | এরূপ বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আওতা ব্যাপক ও আন্তর্জাতিক। |
| ২। কার্যক্ষেত্র | এর কার্যক্ষেত্র দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। | এর কার্যক্ষেত্র আন্তর্জাতিক ও বিস্তৃত। |
| ৩। মূলধন | এক্ষেত্রে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। | এক্ষেত্রে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। |
| ৪। আয়তন | এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়। | এর আয়তন সাধারণত বড় হয়। |
| ৫। প্রকার | এরূপ বাণিজ্য দুই প্রকার, যথা– পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়। | এরূপ বাণিজ্য তিন প্রকার, যথা– আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি। |
| ৬। দলিলপত্রাদি | এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। | এক্ষেত্রে প্রত্যয় পত্র, বিনিময় বিল, বহনপত্র, ফরমায়েশ পত্র ইত্যাদি দলিলের প্রয়োজন হয়। |

## ৪.৫ বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of foreign Trade) ঃ

**বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাসমূহ (Advantage of foreign trade) ঃ** নিচে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা (Consume the product which is not production by the country) ঃ** কোন দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ তার প্রয়োজনীয় অনুৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজেই বিদেশ থেকে আমদানি করে ভোগের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে।

২। **মোট উৎপাদন বৃদ্ধি (Increase gross production) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকলে প্রত্যেক দেশই সেই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে যে দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা বেশি। এতে প্রত্যেক দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যা পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

৩। **শ্রমের বিশেষায়ন (Labour diversification) ঃ** কোন দেশ সমান পারদর্শিতার সাথে সকল প্রকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে একটি দেশ বিশেষ শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে। ফলে এক একটি এক এক শ্রেণীর শ্রমের বিশেষায়ন ঘটে। ফলশ্রুতিতে পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

**৪। উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি (Export surplus product) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ তার উৎপাদিত পণ্য ভোগের পর উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সুযোগ পায়।

**৫। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার (Proper utilization of natural resources) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। ফলে প্রত্যেক দেশই তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে।

**৬। কম মূল্যে দ্রব্য ভোগ (Consume product with lower price) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ সেই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে না যেগুলো উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে। আমদানি বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজ দেশের ব্যয়বহুল উৎপাদন সামগ্রী কম দামে বিদেশ থেকে ক্রয় করে ভোগ করতে পারে।

**৭। বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ (Expansion of market worldwide) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ তার দেশীয় পণ্যের বাজার বিশ্ববাপী সম্প্রসারণ করতে পারে। যেমন– বাংলাদেশের পাটের বাজার বিশ্বব্যাপী।

**৮। শিল্পের স্থানীয়করণ (Centralized Industry) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ শিল্পের স্থানীয়করণে সহায়তা করে।

**৯। আন্তঃআঞ্চলিক পণ্য বিনিময় (External trade) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিনিময় সহজতর হয়।

**১০। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা (Facing natural disaster) ঃ** কোন দেশে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানি করে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনসাধারণের জীবন রক্ষা করা যায়।

**১১। দেশীয় উৎপাদকের দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing efficiency of local producer) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রা তীব্রতর হয়। ফলে প্রত্যেক উৎপাদকের দক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

**১২। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি (Increasing production power) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে প্রত্যেক দেশ তাদের দেশে প্রাপ্ত উৎপাদনের দক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

**১৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়নকামী দেশগুলো উন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও প্রযুক্তি আমদানি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

**১৪। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার (Expansion of knowledge, science & culture) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ সুগম হয়। ফলে একটি দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে।

**১৫। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি (International delight) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায় এবং একটি দেশ অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। ফলে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

**বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হতে পারে ঃ**

**১। পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি (Increase dependability) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ তার প্রয়োজনীয় সবগুলো পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে না, কতগুলো দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য এরূপ পরনির্ভরশীলতা মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

**২। ক্ষতিকারক দ্রব্যের আমদানি (Import harmful product) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার ফলে অনেক সময় অনাবশ্যক ও ক্ষতিকারক পণ্যসামগ্রী আমদানি হতে দেখা যায়। এতে একদিকে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয় এবং অন্য দিকে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রেরও অবক্ষয় ঘটে।

**৩। সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা (Barrier in balance in economic development) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক সময় দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের আবার কোন দেশ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করে। এতে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ সুষম উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

**৪। অতিরিক্ত রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনজনিত সমস্যা (Problem in huge export oriented production) ঃ** দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে এবং সরকারী বিধি-নিষেধের কারণে অনেক সময় আমদানিকারক দেশগুলো সঠিক চাহিদা জানা যায় না। ফলে অতিরিক্ত রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনজনিত সমস্যায় পড়ে এবং উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**৫। অসাধু প্রতিযোগিতা (Unfair competition) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় এক দেশে অন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে স্বল্পমূল্যে এমনকি লোকসান দিয়ে পণ্য সরবরাহ করে। ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলোর শিল্পসমূহ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**৬। দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদনে খরচ বৃদ্ধি (Increase production cost of domestic goods) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানির ফলে অনেক সময় দেশে কাঁচামালের সরবরাহ কমে যায়। এতে দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

**৭। এক দেশের অর্থনৈতিক দুর্যোগ অন্য দেশেও প্রতিক্রিয়া (Effect of natural disaster of a country to another country) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে এক দেশের অর্থনৈতিক দুর্যোগ অন্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের পাট উৎপাদন ব্যাহত হলে এদেশ থেকে পাট আমদানিকারী দেশসমূহের পাটের কারখানায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

**৮। আন্তর্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি (Create International conflict) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন দেশ তাদের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা করার প্রয়াসে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এতে আন্তর্জাতিক রেষারেষি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে।

**৯। ভবিষ্যৎ স্বার্থহানি (Less future interest) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক দেশ অনেক লোভে তার দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদ অবাধে বিদেশে রপ্তানি করে দেয়। ফলে সেই দেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

**১০। কতিপয় সম্পদের নিঃশোষীকরণ (Finished few assets) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে একটি দেশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ লাভ করে। ফলে যে দ্রব্যে উৎপাদনের বিশেষত্ব লাভ করে তা বেশি রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশের প্রকৃতি প্রদত্ত বনজ, খনিজ ইত্যাদি সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলে। এতে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

**১১। শিল্প বৈচিত্র্যকরণের অভাব (Lack of industrial diversification) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্য থাকলে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনে অনুভূত হয় না। ফলে একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পে বৈচিত্র্য আনয়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

**১২। দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ (Barrier in development of domestic Industry) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি হয়। এতে দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

**১৩। প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত (Unfavourable trade condition) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য শর্ত প্রতিকূল হয়ে থাকে। কেননা তারা নিজেদের উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে কম মূল্যে রপ্তানি করে বিদেশ থেকে অধিক মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকে। এভাবে বণিজ্য শর্ত তাদের প্রতিকূলে চলে যায়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**১৪। রাজনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন (Effect on political interest) ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিদেশীরা অনেক সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং আস্তে আস্তে ষড়যন্ত্র করে সুযোগমত রাজদন্ড ছিনিয়ে নেয়। ভারতবর্ষের দু'শ বছরের গোলামি এর প্রকৃষ্ট নজির।

## ৪.৬ বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Foreign Trade) ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্য তিন ধরনের, যথা–

১। আমদানি ব্যবসায়,

২। রপ্তানি ব্যবসায় এবং

৩। পুনঃ রপ্তানি ব্যবসায়।

**১। আমদানি ব্যবসায় (Import Trade) ঃ** বিদেশ হতে পণ্য ক্রয় করে তা স্বদেশে আনয়ন করার কার্য প্রক্রিয়াকে আমদানি ব্যবসায় বা বাণিজ্য বলে। আমদানি ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিদেশ হতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয়। তাই বলা চলে, যখন কোন দেশ অন্য কোন দেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে থাকে তখন তাকে আমদানি ব্যবসায় বলে।

পৃথিবীর কোন দেশই সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রত্যেক দেশই কোন না কোন পণ্য বিদেশ হতে আমদানি করে। আমদানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি অন্যতম প্রধান দিক। যখন কোন দেশ তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারে বা ঐ পণ্য উৎপাদনে অন্য দেশের চেয়ে বেশি খরচ পড়ে তখন সে দেশ বিদেশ থেকে ঐ পণ্য আমদানি করে। যেমন, বাংলাদেশ বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি আমদানি করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যন্ত্রপাতির আমদানি বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। কোন দেশ নিজে যা উৎপাদন করতে পারে না আমদানির মাধ্যমে তা ভোগ করতে পারে।

**২। রপ্তানি ব্যবসায় (Export Trade) ঃ** সাধারণ অর্থে স্বদেশ হতে বিদেশে পণ্য প্রেরণের নামই রপ্তানি। ব্যাপক অর্থে কোন দেশ যখন তার দেশে উৎপাদিত বা উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য কোন দেশে বিক্রয় করে তখন তাকে রপ্তানি ব্যবসায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাধারণত প্রতিটি দেশই কোন না কোন পণ্য বেশি উৎপাদন করে এবং ভোগের পর ঐ পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশটুকু অন্য কোন দেশের কাছে বিক্রয় করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সুতরাং, নিজ দেশের পণ্য অন্য কোন দেশের কাছে বিক্রয় করাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলা হয়। বাংলাদেশ বিদেশে পাট, চা ও চামড়া বিক্রয় করে। এর অর্থ হল বাংলাদেশ পাট, চা, ও চামড়ার রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছে।

সুতরাং, রপ্তানি হল এক দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য ও সেবাসামগ্রী অন্য দেশে বিক্রয় করা। এর ফলে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে রপ্তানি বাণিজ্যের ভারসাম্য যে দেশের অনুকূলে সে দেশকে স্বচ্ছল দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

**৩। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় (Re-Export Trade) ঃ** এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত আমদানিকৃত পণ্য পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বা ব্যবসায় বলে। সাধারণত এরূপ ব্যবসায়ে যারা নিয়োজিত তাদেরকে পুনঃরপ্তানিকারক বলে। এরা এক দেশ থেকে কম মূল্যে পণ্য আমদানি করে তা পুনরায় তৃতীয় কোন দেশে অধিক মূল্যে রপ্তানি করে। অর্থাৎ এরূপ ব্যবসায়ে আমদানিকারক পুনরায় রপ্তানিকারকে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায়, কোন দেশ যখন রপ্তানির উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত আমদানিকৃত পণ্য পুনরায় অন্য আরেকটি দেশে রপ্তানি করে তখন তাকে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়। যেমন– বাংলাদেশ জাপান থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করে তাতে নিজ দেশের সীল ও মোড়ক লাগিয়ে পুনরায় নেপালে রপ্তানি করলে তা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য হিসেবে গণ্য হবে। সাধারণত উৎপাদনকারী দেশের সাথে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকলে, সংশ্লিষ্ট দেশ দুটোর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা থাকলে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকলে বা অধিক লাভজনক হলে এরূপ ব্যবসায় সংঘটিত হয়।

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কীভাবে সংঘটিত হয় তা দেখানো হল ঃ

## ৪.৭ পণ্য আমদানি ও পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি (The Import & Exporting procedure) ঃ

**(ক) পণ্য আমদানি পদ্ধতি (Import Procedure) ঃ** বিদেশ হতে পণ্য আমদানি একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর জন্য যথেষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এরূপ আনুষ্ঠানিকতা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি যাকে আমদানি পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়।

নিচে আমদানি পদ্ধতির বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

**১। আমদানি অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স সংগ্রহ (Procuring Import License) ঃ** প্রত্যেক দেশের আমদানি বাণিজ্য সাধারণত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই বিদেশ হতে পণ্য আমদানি করতে হলে সর্বপ্রথম আমদানি-কারককে উপযুক্ত ফি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে সরকারের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে আমদানির অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। দেশের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সরকার পণ্য আমদানির অনুমতি দিয়ে থাকে।

**২। মূল্য অনুসন্ধান (Inquiry of Price) ঃ** আমদানি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংগ্রহের পর আমদানিকারককে পণ্য আমদানির জন্য বিভিন্ন দেশের রপ্তানিকারকদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মান, মূল্য ও বিক্রয়ের বিভিন্ন শর্ত অনুসন্ধান করতে হয়। মূলত মূল্য অনুসন্ধানের মাধ্যমেই বাণিজ্যের প্রকৃত প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পর্যায়ে আমদানিকারক মূল্য ও বিক্রয় শর্ত জানার জন্য রপ্তানিকারকদের সাথে যোগাযোগ করে বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের দেশীয় এজেন্টদের নিকট হতে মূল্য তালিকা সংগ্রহ করে।

**৩। অর্ডার বা ফরমায়েশ প্রদান (Placing Order) ঃ** অতঃপর এ পর্যায়ে যে রপ্তানিকারকের পণ্য মূল্য ও বিক্রয় শর্তাবলি সন্তোষজনক বলে মনে হয় তাকে পণ্য প্রেরণের জন্য অর্ডার বা ফরমায়েশ প্রদান করা হয়। ফরমায়েশপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণগত মান, মূল্য, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। ফরমায়েশ মুক্ত ও নির্দিষ্ট এ দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

**৪। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ (Procuring Foreign Exchange) ঃ** ফরমায়েশকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। তাই এ পর্যায়ে আমদানিকারককে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য আদানিকারক বৈদেশিক মুদ্রার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করলে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবারাহ করে থাকে।

**৫। প্রত্যয়পত্র খোলা (Opening Letter of Credit) ঃ** ফরমায়েশপত্র পাবার পর রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র খোলার অনুরোধ জানায়। অতঃপর এ পর্যায়ে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র খোলার ব্যবস্থা করে এবং এর একটি কপি রপ্তানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এরূপ প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়, যদি আমদানিকারক পণ্যমূল্য পরিশোধ না করে তবে ব্যাংক নিজে পরিশোধ করবে।

**৬। মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ (Fixation of the rate of Foreign Exchange) ঃ** প্রত্যয়পত্র প্রেরণের পর আমদানিকারকের কাজ হল কোন বিনিময় ব্যাংকের মাধ্যমে ফরমায়েশের বিপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করা এবং পরবর্তীতে তা রপ্তানিকারককে জানিয়ে দেয়া। এরূপ হার নির্ধারণের উদ্দেশ্য হল মুদ্রার মূল্যমান ওঠানামার ফলে যাতে ভবিষ্যতে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করা।

**৭। পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রাপ্তি (Receiving Advices of Shipment) ঃ** প্রত্যয়পত্র প্রেরণের পর আমদানিকারক রপ্তানিকারকের নিকট থেকে পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। অপরদিকে রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্র পাবার পর পণ্য সংগ্রহ করে তা জাহাজে বোঝাইয়ের ব্যবস্থা করে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত খবর আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করে। এ সংবাদের মধ্যে পণ্যের নাম, পরিমাণ, জাহাজের নাম, জাহাজ বন্দরে পৌঁছার তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

**৮। বিলের মূল্য পরিশোধ ও দলিল প্রাপ্তি (Payment of Bills and Receiving Documents) ঃ** পণ্য প্রেরণের প্রাথমিক সংবাদ পাবার পর আমদানিকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি প্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে চালানি রসিদ, নৌ-বীমাপত্র, রপ্তানি চালান, প্রভব লেখ, বৈদেশিক বিনিময় বিল, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান বা এর মূল্য পরিশোধ করলেই ব্যাংক রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রেরিত জাহাজি দলিলসমূহ আমদানিকারককে প্রদান করে।

**৯। শুল্ক বিষয়ক আনুষ্ঠানিকতা পালন (Maintain Formalities Regarding Tariff) ঃ** অতঃপর পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে পৌঁছলে আমাদানিকারক মাল খালাসের অনুমতি প্রপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে আমদানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে দু'কপি আগামপত্র বা (Bill of Entry) এবং অন্যান্য জাহাজি দলিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে। শুল্ক কর্তৃপক্ষের উক্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা আদায় করে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত আগামপত্রের এক কপি আমদানিকারককে ফেরৎ দেয়। এরূপ পত্র 'কাস্টমস্ পাস' হিসেবে বিবেচিত হয়।

**১০। মাল খালাসকরণ (Delivery of Goods) ঃ** এ পর্যায়ে আমদানিকারককে জাহাজ হতে মাল খালাসের ব্যবস্থা করতে হয়। এ জন্য আমদানিকরক জেটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চালান ফরম সংগ্রহ ও তা পূরণ করে এবং জেটি ও অন্যান্য মাশুল সমেত উক্ত ফরম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে জেটি চালানপত্র সংগ্রহ করে। এরপর জাহাজি দলিলসমূহ, শুল্ক বিভাগীয় পাস, জেটি চালানপত্র ইত্যাদি জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে পণ্য খালাস আদেশ ও গেট পাস সংগ্রহ করে এবং জাহাজ হতে মাল খালাস করে।

**১১। লেনদেনের পরিসমাপ্তি (Closing Transaction) ঃ** অতঃপর আমদানিকারক জাহাজ হতে পণ্য সংগ্রহের পর এর যথাযথতা বিচারপূর্বক সন্তুষ্ট হলে রপ্তানিকারকের বরাবর সন্তোষ প্রকাশ করে পত্র লিখে এবং এর মাধ্যমে লেনদেন ও আমদানি প্রক্রিয়ার সকল আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য পণ্য সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে পরবর্তীতে পারস্পরিক যোগাযোগ বা স্থানীয় বণিক সভার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।

নিচে একটি ছকের সাহায্যে আমদানি পদ্ধতির পদক্ষেপগুলো দেখানো হল ঃ

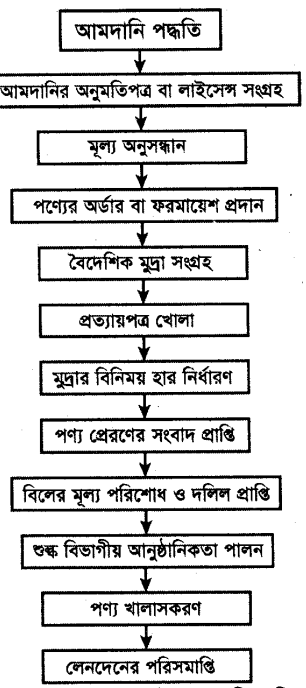


উপরোক্ত পদ্ধতি বা পর্যায়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণের মাধ্যমেই আমদানি বাণিজ্যের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

**(খ) পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি (Export Procedure) ঃ** পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল দেশকে কতগুলো ধারাবাহিক নিয়ম বা আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। বাংলাদেশকেও বিদেশে পণ্য রপ্তানি করতে হলে উক্ত আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করতে হয়। এ সকল নিয়ম বা আনুষ্ঠানিকতা গুলোকেই পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি বলা যায়। নিচে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি বা আনুষ্ঠানিকতাগুলোর বর্ণনা দেয়া হল ঃ

**১। ফরমায়েশ বা অর্ডার প্রাপ্তি (Receiving Order) ঃ** রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল বিদেশী ক্রেতা বা আমদানিকারকদের নিকট থেকে পণ্য প্রেরণের অর্ডার বা ফরমায়েশ প্রাপ্তি। কারণ অর্ডার বা ফরমায়েশ ছাড়া পণ্য রপ্তানি করা যায় না। ফরমায়েশ প্রাপ্তির মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের সূচনা হয়। এরূপ ফরমায়েশ দু'ধরনের হতে পারে, যথা–

**(ক) মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশ পত্র (Open order) ঃ** যে ফরমায়েশ পত্রে শুধুমাত্র পণ্যের নাম ও বিবরণের উল্লেখ থাকে তাকে মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশপত্র বলে। এতে রপ্তানিকারক ফরমায়েশ সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্তের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা যোগ করতে পারে।

**(খ) স্থির বা নির্দিষ্ট ফরমায়েশ পত্র (Particular order) ঃ** যে ফরমায়েশপত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ফরমায়েশ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলির উল্লেখ থাকে তাকে স্থির বা নির্দিষ্ট ফরমায়েশপত্র বলে। এতে পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য ও গুণগত মান, মোড়কিকরণ, পণ্য প্রেরণের সময় ও তারিখ, জাহাজকরণ ও বীমা সংক্রান্ত নির্দেশ, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। এরূপ উল্লেখের কারণে এক্ষেত্রে রপ্তানিকারক নিজস্ব কোন চিন্তা-ভাবনা যোগ করতে পারে না।

**২। ফরমায়েশ স্বীকৃত বা গ্রহণ ( Acceptance of Order) ঃ** ফরমায়েশ প্রাপ্তির পর রপ্তানিকারক উক্ত ফরমায়েশের বিভিন্ন বিষয়াদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখে। অতঃপর পণ্য সরবরাহের শর্তাবলি অনুকূল বিবেচিত হলে লিখিতভাবে ফরমায়েশ গ্রহণের সংবাদ আমদানিকারককে জানিয়ে দেয়।

**৩। প্রত্যয়পত্র খোলার নির্দেশ (Advice to Open Letter of Credit) ঃ** ফরমায়েশ গ্রহণের পর রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য সময়মত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেন কোন ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য আমদানিকারককে তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র (L.C) খোলার এবং তা তার নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়। অতঃপর আমদানিকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রত্যয়পত্র খুলে তা রপ্তানিকারককে পাঠিয়ে দেয়।

**৪। রপ্তানির ছাড়পত্র সংগ্রহ (Procuring Export Permit) ঃ** পণ্য রপ্তানির প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের পর রপ্তানিকারককে পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকারের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে রপ্তানি লাইসেন্স বা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। তবে রপ্তানিকৃত পণ্য সরকারের খোলা অনুমতি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে তার জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

**৫। বিনিময় হার নির্ধারণ (Booking of Exchange Rate) ঃ** বৈদেশিক মুদ্রার হার প্রায়ই ওঠানামা করে। বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে কোন পক্ষই যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য মূল্য পরিশোধের সময় মুদ্রার বিনিময় হার কী হবে তা স্থির করে রাখা উচিত। তাই এ পর্যায়ে রপ্তানিকারক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাংকের সাথে বিনিময় হার নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করে। এর ফলে রপ্তানিকারক পূর্ব নির্ধারিত হারে তার রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করতে পারে।

**৬। পণ্য সংগ্রহ ও মোড়কিকরণ (Procurement of goods and packing) ঃ** সরকারের অনুমতি এবং আমদানিকারক কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যয়পত্র প্রাপ্তির পর রপ্তানিকারকের ফরমায়েশকৃত পণ্য উৎপাদন অথবা অন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করে রাখতে হয়। অতঃপর নির্ধারিত মান রক্ষা এবং জাহাজে বোঝাইকরণের জন্য ফরমায়েশপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে পণ্যগুলোর প্যাকিং বা মোড়াকিকরণ করতে হয়।

**৭। জাহাজ ভাড়া চুক্তি সম্পাদন (Contract of Affreihment) ঃ** অতঃপর সংগৃহীত পণ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে এ পর্যায়ে রপ্তানিকারককে জাহাজ কর্তৃপক্ষের সাথে জাহাজ ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। এরূপ চুক্তিতে পণ্য পরিবহণের সময়, প্রেরণ ও প্রাপ্তির স্থান এবং পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকে। এরূপ চুক্তি দু'ধরনের হতে পারে যথা– (ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজ ভাড়া চুক্তি এবং (খ) নির্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রার জন্য জাহাজ ভাড়া চুক্তি। পণ্য রপ্তানি পদ্ধতির মধ্যে জাহাজ ভাড়া চুক্তি সম্পাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

**৮। পণ্যের বীমাকরণ (Insuring of Goods) ঃ** জাহাজ ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের পর রপ্তানিকারকের দায়িত্ব হল নৌ-বীমা চুক্তি সম্পাদন করা। কেননা পরিবহনকালে নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন– সামুদ্রিক ঝড়, অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি ইত্যাদি। উক্ত ঝুঁকি এড়াবার জন্য রপ্তানিকারক বীমা কোম্পানির সাথে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করে। এরূপ চুক্তির ফলে পরিবহনাধীন অবস্থায় পণ্যের কোন ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি তা পূরণে বাধ্য থাকে।

**৯। শুল্ক বিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন (Processing of Custom and Export Formalities) ঃ** অতঃপর পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারককে শুল্ক বিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এ লক্ষ্যে পণ্যদ্রব্য জাহাজে বোঝাই করার পূর্বে তাকে শুল্ক নিয়ন্ত্রকের (Collector of Customs) নিকট থেকে একটি অনুমতিপত্র ও একটি শুল্ক বিভাগীয় চালান সংগ্রহ ও সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ করতে হয়। তারপর রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় ফিসহ উক্ত রপ্তানি অনুমতিপত্র, শুল্ক বিভাগীয় চালান ও রপ্তানি ঘোষণাপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হয়। এরপর শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে রপ্তানি অনুমতিপত্র ইস্যু করে এবং চালানোর ওপর শুল্কের পরিমাণ লিখে দেয়। তারপর রপ্তানিকারকে শুল্ক সংগ্রহকারীর নিকট ধার্যকৃত শুল্ক পরিশোধ করতে হয় এবং এর মাধ্যমে শুল্ক বিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

**১০। জাহাজে মাল বোঝাইকরণ (Shipment of Goods) ঃ** শুল্ক বিভাগীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর রপ্তানিকারককে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ কাজ রপ্তানিকারক ডক বা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও করতে পারে অথবা নিজেও করতে পারে। যদি ডক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পণ্য বোঝাই করা হয়, তবে উক্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকারককে পণ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি 'ডক রসিদ' প্রদান করে। আর যদি নিজেই বোঝাইকরণের ব্যবস্থা করে তবে জাহাজের ক্যাপ্টেন যে পরিমাণ ও প্রকৃতির পণ্য পান তার সার্বিক বিবরণ সম্বলিত একটি রসিদ তাকে প্রদান করেন একে মেটস রসিদ (Mates Receipt) বলা হয়। অতঃপর রপ্তানিকারককে ডক রসিদ বা মেটস্ রসিদ জাহাজ কোম্পানিকে ফেরত দিয়ে পণ্যের চালানি রসিদ বা Bill of Lading গ্রহণ করতে হয়। এটি একাধারে পণ্য প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র ও পণ্যের মালিকানার দলিল। এটি তিন প্রস্থে তৈরি করা হয় এবং জাহাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেকটি কপিই স্বাক্ষরিত হয়। এভাবে পণ্য জাহাজিকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

**১১। পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রদান (Sending Shiping Advices) ঃ** অতঃপর রপ্তানিকারক পণ্য প্রেরণের সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারককে জানিয়ে দেয়। এতে পণ্য বোঝাই সংক্রান্ত তথ্যাদি, জাহাজের নাম, পণ্য পৌছানোর সম্ভাব্য তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। এরূপ পত্র পেয়ে আমদানিকারক পণ্যের বিবরণ ও পণ্য প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে জানতে পারে।

**১২। রপ্তানি দলিলপত্র তৈরি ও প্রেরণ (Preparation and Sending of Export Documents) ঃ** উপরোক্ত কার্যগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর রপ্তানিকারক বিনিময় বিল তৈরি করে এবং উক্ত বিলের সাথে জাহাজি ও রপ্তানি সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র সংযুক্ত করে তা ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের বরাবর প্রেরণ করে। উক্ত দলিলগুলোর মধ্যে চালানি রসিদ (Bill of Lading), নৌ-বীমাপত্র (Marine Insurance Policy), রপ্তানি চালান (Export Invoice), প্রভাব লেখ (Certificate of Origin) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জাহাজ বন্দরে পৌঁছলে আমদানিকারক এ সকল দলিলপত্র কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে মাল খালাস করে নিতে পারে।

**১৩। মূল্য প্রাপ্তি (Receiving Payment) ঃ** আমদানিকারক বিনিময় বিল ও দলিলপত্র পাওয়ার পর উক্ত বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে রপ্তানিকারকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর রপ্তানিকারক বিলটি তার ব্যাংকে জমা দিয়ে অথবা বাট্টায় ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, মূল্য প্রাপ্তির পর রপ্তানিকারকের আর কোন করণীয় কাজ থাকে না।

**১৪। লেনদেনের পরিসমাপ্তি (Closing of Transaction) ঃ** আমদানিকারক জাহাজ হতে পণ্য সংগ্রহের পর পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় প্রাপ্তির সংবাদটি পত্র মারফত রপ্তানিকারককে অবগত করে এবং এর মাধ্যমে রপ্তানি প্রক্রিয়ার সকল আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি ঘটে। তবে, পণ্য সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা পরবর্তীতে পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় বণিক সভার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়।

উপরোল্লিখিত রপ্তানি প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতাগুলোকে নিচে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

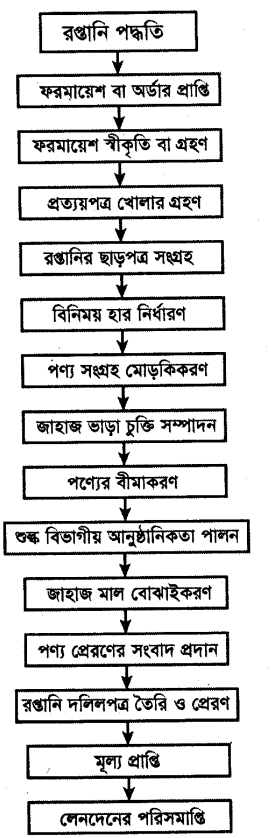


উপরিউক্ত পদ্ধতি বা পর্যায়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণের মাধ্যমেই রপ্তানি বাণিজ্যের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

## ৪.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব (Importance of Foreign Trade in the Economy of Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত এদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

**১। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (Earn foreign currency) ঃ** বাংলাদেশে প্রচুর পাট, চা, চামড়া, মৎস্য প্রভৃতি কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয়। দেশের প্রয়োজন মেটানোর পর ও এসব পণ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

**২। যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি (Import equipment & material) ঃ** শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনগ্রসর। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং বিভিন্ন শিল্পের কতিপয় কাঁচামালের প্রয়োজন। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন করা যায়।

**৩। খাদ্য চাহিদা পূরণ (Meet up demand of food) ঃ** বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যা, খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানি হয়। এ কারণে খাদ্য ঘাটতি থেকেই যায়। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে এ ঘাটতি পূরণ করা হয়।

**৪। প্রযুক্তি আমদানি (Import technology) ঃ** বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রকৌশলগত জ্ঞানে উন্নত নয়। এমতাবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করে শিল্পে উন্নতি লাভ করা যায়।

**৫। দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি (Create international market of domestic goods) ঃ** আমাদের দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বৈদেশিক বাজার প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

**৬। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সৃষ্টি (Create fund of forign currency) ঃ** বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। কারণ এদেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খুবই কম। তাই রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি করা যায়।

**৭। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Development standard of living) ঃ** বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানির ফলে মানুষের আয় বৃদ্ধি করা এবং সে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

**৮। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস (Decrease dependablity of foreign aid) ঃ** বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

## ৪.৮.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় (Problems & its solution of home trade in Bangladesh) ঃ

**বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ ঃ**

১। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মূলধনের অপ্রতুলতা।
২। এদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়।
৩। এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে মস্থ কারবারিদের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৪। সরকারের বাণিজ্য নীতিও অনেক সময় ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুব একটা অনুকূল হয় না।
৫। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।
৬। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পণ্য পরিকল্পনারও যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

**বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় ঃ**

১। সরকারি ও বেসরকারিভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মূলধনের সরবরাহ বাড়াতে হবে, সহজ ঋণ ও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
২। রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যেন তা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল হয়।
৩। সরকারকে সুষ্ঠু বাণিজ্য নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪। পণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ আরও সচেতন হতে হবে।
৫। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

# অনুশীলনী-৪

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]
**অথবা, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও।** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য তথা পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সংঘটিত হলে তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

**২। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?**

**উত্তর ঃ** দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

**৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দুই প্রকার, যথা–

১। পাইকারী ব্যবসায় এবং

২। খুচরা ব্যবসায়।

**৪। বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-১০, ১২, ১৪(T)]
**অথবা, বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** দু'দেশের মধ্যে যখন পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

**৫। বৈদেশিক বাণিজ্য কয় ধরনের ও কী কী?**

**উত্তর ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্য তিন ধরনের, যথা–

১। আমদানি ব্যবসায়।

২। রপ্তানি ব্যবসায় এবং

৩। পুনঃ রপ্তানি ব্যবসায়।

**৬। আমদানি বাণিজ্য কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** বিদেশ হতে পণ্য ক্রয় করে তা স্বদেশে আনয়ন করার কার্যপ্রক্রিয়াকে আমদানি বাণিজ্য বা আমদানি ব্যবসায় বলে।

**৭। বিদেশ হতে পণ্য আমদানি করতে হলে সর্বপ্রথম কী করতে হয়?**

**উত্তর ঃ** বিদেশ হতে পণ্য আমদানি করতে হলে সর্বপ্রথম আমদানি কারককে উপযুক্ত ফি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে সরকারের আমদানির রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে আমদানির অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

**৮। রপ্তানি ব্যবসায় কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর ঃ** কোন দেশ যখন তার দেশে উৎপাদিত বা উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য কোন দেশে বিক্রয় করে তাকে রপ্তানি ব্যবসায় বলে।

**৯। রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ কী?**

**উত্তর ঃ** রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল বিদেশী ক্রেতা বা আমদানিকারকের নিকট হতে পণ্য প্রেরণের অর্ডার বা ফরমায়েশ প্রাপ্তি।

**১০। ফরমায়েশ কয় ধরনের হতে পারে ও কী কী?**

**উত্তর ঃ** ফরমায়েশ ২ ধরনের হতে পারে। যথা–

১। মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশ এবং

২। স্থির বা নির্দিষ্ট ফরমায়েশ।

**১১। মুক্ত ফরমায়েশ বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যে ফরমায়েশপত্রে শুধুমাত্র পণ্যের নাম ও বিবরণ উল্লেখ থাকে তাকে মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশপত্র বলে। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৮, ০৯,

**১২। পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য কাকে বলে?**

**অথবা, পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত আমদানিকৃত পণ্য পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

**১৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

**উত্তর**

১। ক্রেতা ও বিক্রেতা,

২। লেনদেন পদ্ধতি,

৩। মালিকানা,

৪। ঝুঁকি,

৫। জনগণের চাহিদা।

**১৪। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?**

**উত্তর** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেশের অভ্যন্তরের পণ্যদ্রব্য বা সেবাসমূহ ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করা।

**১৫। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের আয়তন কেমন হয়ে থাকে?**

**উত্তর** অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় সাধারণত ছোট বা ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে।

**১৬। কোন ব্যবসায়ে তুলনামূলক কম পুঁজি লাগে?**

**উত্তর** খুচরা ব্যবসায়ে তুলনামূলক কম পুঁজি লাগে। [বাকাশিবো-২০০৮]

**১৭। সঠিক মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?**

**উত্তর** ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক দর কষাকষির মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। [বাকাশিবো-২০০৮]

**১৮। পণ্যের স্থানগত উপযোগ কীসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর** পরিবহনের মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। [বাকাশিবো-২০০৮]

**১৯। সঠিক সময়ে পণ্য ক্রয় করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?**

**উত্তর** সঠিক সময়ে পণ্য ক্রয় করলে তা ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়। [বাকাশিবো-২০০৮]

**২০। নিলামে ক্রয়নীতি কী?**

**উত্তর** সরবরাহকারী বা বিক্রেতার কাছ থেকে নিলামের মাধ্যমে অর্থাৎ সর্বনিম্ন মূল্যে যার নিকট থেকে নির্দিষ্ট পণ্য পাওয়া যায় তার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করাকে নিলামে ক্রয় নীতি বলে। [বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১]

**২১। ফটকা ক্রয়নীতি কাকে বলে?**

**উত্তর** কম মূল্যে ফটকা বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করাকে ফটকা ক্রয় নীতি বলে। [বাকাশিবো-২০০৯]

**২২। বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্য কী?**

**উত্তর** বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্য হলো ভোক্তাদের চাহিদা বা পছন্দ উৎপাদনকারীকে জানানো এবং তাদের থেকে পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানো।

**২৩। ফড়িয়া কাদের বলা হয়?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** ফড়িয়া এমন একজন প্রতিনিধি যিনি নিজের নামে বা তার মহাজনের নামে পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত হয়।

**২৪। পাইকারি ব্যবসা বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** উৎপাদকের নিকট থেকে এক সাথে প্রচুর পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে ভবিষ্যতে সেগুলো খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট অল্প পরিমাণ বিক্রয় করাকে পাইকারি ব্যবসা বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও।** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** যখন কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য তথা পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সংঘটিত হয়, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে একই দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদির বিনিময় ঘটে।

সুতরাং বলা যায় যে, একটি দেশের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিংবা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন বা বিনিময় সংঘটিত হলে তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

**২। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?**

**উত্তর ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরূপ বাণিজ্য একটি দেশের ভৌগোলিক বা সার্বভৌম সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলের মধ্যে এ ধরণের বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

**৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী?**

অথবা, **পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দুই প্রকার, যথা–

**১। পাইকারী ব্যবসায় ঃ** উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে একযোগে প্রচুর পরিমাণে পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে অল্প অল্প করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করাকে পাইকারী ব্যবসায় বলে।

**১। খুচরা ব্যবসায় ঃ** পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ভোগকারী ক্রেতাসাধারণের নিকট বিক্রয় করাকে খুচরা ব্যবসায় বলে।

**৪। পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।** [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-২০১০, ২০১৩(T)]

**উত্তর ঃ** পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | পাইকারী ব্যবসায় | খুচরা ব্যবসায় |
|---|---|---|
| ১। সংগঠন প্রকৃতি | পাইকারী ব্যবসায় একটি বৃহদায়তনের ব্যবসায় সংগঠন। | খুচরা ব্যবসায় একটি ক্ষুদ্রায়তনের কারবার সংগঠন। |
| ২। বণ্টন প্রণালিতে অবস্থান | পণ্য বণ্টন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে এর অবস্থান। | খুচরা ব্যবসায়ের অবস্থান পাইকার এবং ভোক্তাদের মধ্যবর্তী স্থানে। |
| ৩। মূলধন | এরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয়। | অপেক্ষাকৃত কম মূলধন নিয়েই খুচরা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা যায়। |
| ৪। মালিকানা | পাইকারী ব্যবসায় এক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী কোম্পানিরূপে গড়ে ওঠতে পারে। | অধিকাংশ খুচরা ব্যবসায়ই এক মালিকানা কারবারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। |

| পার্থক্যের বিষয় | পাইকারী ব্যবসায় | খুচরা ব্যবসায় |
|---|---|---|
| ৪। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ | পাইকারী ব্যবসায়ী একত্রে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। | খুচরা ব্যবসায়ী কম পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে এবং কম পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করে। |
| ৫। পণ্যের প্রকার | পাইকারগণ সাধারণত একটি বা দু'টি পণ্য নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। | খুচরা ব্যবসায়ীগণ ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। |
| ৬। পণ্য সংগ্রহ ও বণ্টন | পাইকারী ব্যবসায়ীগণ উৎপাদক বা আমদানিকারকের নিকট হতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট সরবরাহ করে। | খুচরা ব্যবসায়ীরা পাইকারদের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। |
| ৭। পণ্যমূল্য | পাইকারী ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। | পণ্যের খুচরা মূল্য সর্বদাই পাইকারী মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। |

**৫। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর** সাধারণভাবে বাণিজ্য যখন দুটো দেশের মধ্যে সংঘটিত হয় তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ দু'দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হলে তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়।

**অধ্যাপক কিন্ডাল বার্জারের মতে,** "দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবা কর্মের লেনদেনকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়।"

সুতরাং বলা যায় যে, দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান হলে তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

**৬। আমদানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, **আমদানি বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর** বিদেশ হতে পণ্য ক্রয় করে তা স্বদেশে আনয়ন করার কার্য প্রক্রিয়াকে আমদানি ব্যবসায় বা বাণিজ্য বলে। আমদানি ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিদেশ হতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয়। তাই বলা চলে যখন কোন দেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে থাকে তখন তাকে আমদানি ব্যবসায় বলে।

**৭। রপ্তানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর** সাধারণ অর্থে স্বদেশ হতে বিদেশে পণ্য প্রেরণের নামই রপ্তানি। ব্যাপক অর্থে কোন দেশ যখন তার দেশে উৎপাদিত বা উদ্বৃত্তপণ্য অন্য কোন দেশে বিক্রয় করে তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বা রপ্তানি ব্যবসায় বলে। মোট কথা, এক দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য ও সেবাসামগ্রী অন্য দেশে বিক্রয় করাই হল রপ্তানি ব্যবসায়।

**৮। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কী?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১০]

**উত্তর** এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত আমদানিকৃত পণ্য পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায় আমদানিকারক পুনরায় রপ্তানিকারকে পরিণত হয়। সাধারণত এ ধরণের ব্যবসায়ে যারা নিয়োজিত থাকে তারা এক দেশ থেকে কমমূল্যে পণ্য আমদানি করে তা পুনরায় তৃতীয় কোন দেশে অধিক মূল্যে রপ্তানি করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, কোন দেশ যখন রপ্তানির উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে উক্ত আমদানিকৃত পণ্য পুনরায় অন্য আরেকটি দেশে রপ্তানি করে তখন তা পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলে অভিহিত হবে।

**৯। মুক্ত বাণিজ্য কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯]

**উত্তর** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য আমদানি বা রপ্তানির উপর কোনরূপ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধ আরোপিত থাকে না তখন তাকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ এক দেশের সাথে অপর দেশের বাণিজ্যে যখন আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন শুল্ক ধার্য করা হয় না এবং আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না সেই বাণিজ্যকে অবাধ বা মুক্ত বাণিজ্য বলা হয়। অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী সরকার দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী এবং বিদেশী দ্রব্যকে একই দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

**১০। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ।** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১২]

**উত্তর** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

২। এ বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

৩। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা যায়।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পোয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করা যায়।

৫। দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক।

**১১। প্রত্যয়পত্র কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে।** [বাকাশিবো-২০০৫, ১৩]
**অথবা, প্রত্যয়ন পত্রের গুরুত্ব লেখ।**

**উত্তর** ফরমায়েশপত্র পাবার পর রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র খোলার অনুরোধ জানায়। অতঃপর এ পর্যায়ে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র খোলার ব্যবস্থা করে এবং এর একটি কপি রপ্তানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এরূপ প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়, যদি আমদানিকারক পণ্যমূল্য পরিশোধ না করে তবে ব্যাংক নিজে পরিশোধ করবে।

**১২। বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪টি সুবিধা লিখ।** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাগুলোর মধ্যে ৪টি সুবিধা নিম্নে দেয়া হল–

১। অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা।

২। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার।

৩। বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ ও

৪। আন্তঃ আঞ্চলিক পণ্য বিনিময়।

**১৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৬, ০৯, ১১]

**উত্তর**

১। দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্মাদির লেনদেন করা।

২। উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক রাখা।

৩। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয়।

৪। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৫। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।

৬। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৭। দেশীয় চাহিদা পূরণ ও ঝুঁকি হ্রাস।

**১৪। পাইকারি ব্যবসায়ের কার্যাবলি উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৬, ১১]

**উত্তর**

১। পণ্যদ্রব্য ক্রয়

২। পণ্যদ্রব্য বিক্রয়

৩। গুদামজাতকরণ

৪। পরিবহন

৫। ঝুঁকি গ্রহণ

৬। অর্থসংস্থান

৭। হিসাবরক্ষণ

৮। তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দান।

**১৫। খুচরা ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর**

১। অল্প পুঁজি দ্বারা ব্যবসায় করা যায়।

২। যেকোন স্থানে ব্যবসায় তৈরি করা যায়।

৩। বিভিন্ন ধরনের বা বিচিত্র পণ্যের সমাবেশ ঘটায়।

৪। ভোক্তার চাহিদানুযায়ী পণ্য বিক্রয়।

৫। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

**১৬। পণ্য ক্রয়ের পঞ্চ 'R' নীতিগুলো বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১০, ১১]

**উত্তর** পণ্য ক্রয়ের পঞ্চ 'R' নীতিগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল–

(i) Right source : সঠিক উৎস থেকে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

(ii) Right quality : অবশ্যই পণ্যের মান বিবেচনা করতে হবে।

(iii) Right price : উপযুক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

(iv) Right time : সঠিক সময়ে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

(v) Right quantity : সঠিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

**১৭। ক্রয় বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলি বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর** ক্রয় বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলি বর্ণনা করা হল–

(i) পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা,

(ii) কাঁচামাল ক্রয়ের উৎস অনুসন্ধান,

(iii) কাঁচামালের মূল্য নির্ধারণ,

(iv) ফরমায়েশ প্রদান,

(v) লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়।

## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.১ ও ৪.১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.১ ও ৪.১.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়? অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.১ ও ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.৮.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৫, ১২]

**উত্তর সংকেত** ৪.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। পাইকারী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** ৪.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পার্থক্য দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-১০]

**উত্তর সংকেত** ৪.৪ ও ৪.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** ৪.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝ? বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** ৪.৪ ও ৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। আমদানি ব্যবসায় কাকে বলে? বিদেশ হতে পণ্য আমদানি পদ্ধতি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.৬ এর ১ ও ৪.৭ এর ক অংশ দ্রষ্টব্য।

১১। রপ্তানি ব্যবসায় কী? পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৪.৬ এর ২ ও ৪.৭ এর খ অংশ দ্রষ্টব্য।

১২। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝ? পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কেন সংঘটিত হয়?

**উত্তর সংকেত** ৪.৬ নং অনুচ্ছেদ এর ৩ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

১৩। বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১৩]

**উত্তর সংকেত** ৪.৪ ও ৪.৮ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

*******

# অধ্যায়-৫

# যোগাযোগের মৌলিক ধারণা
# (Basic Concepts of Communication)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৫.০ সূচনা; ৫.১ যোগাযোগ ও কারবার যোগাযোগের সংজ্ঞা; ৫.২ কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের পরিধি বা আওতা ৫.৩ ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি; ৫.৪ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানসমূহ*

## ৫.০ সূচনা (Introduction) ঃ

মানব জীবনে যোগাযোগ একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি মানব জীবনের একটি জন্মপ্রসূত প্রক্রিয়া এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই যোগাযোগের মাধ্যমেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনেই নয়; পারিবারিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যোগাযোগ কার্যক্রম বিস্তৃত। বস্তুত যোগাযোগ একটি সর্ববিস্তৃত কার্যক্রম। যোগাযোগ ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকার কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

## ৫.১ যোগাযোগ ও কারবার যোগাযোগের সংজ্ঞা (Define Communication & Business Communication) ঃ

**যোগাযোগ (Communication) ঃ** যোগাযোগ শব্দটি ইংরেজি 'Communication' শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ। Communication শব্দটি ল্যাটিন 'Communis' শব্দ হতে এসেছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে Common বা সাধারণ। এ অর্থে যোগাযোগ বলতে Commonness প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ একে অন্যের সাথে সাধারণ বোঝাপড়া বা একাত্মতা প্রকাশ করাকে বুঝায়। এদিক থেকে বিচার করলে পারস্পরিক বোধগম্যের নিমিত্তে তথ্যাদির আদান-প্রদানই হল যোগাযোগ।

কেউ কেউ মনে করেন, Communication শব্দটি প্রাচীন ফরাসি 'Communer' শব্দ থেকে এসেছে। Communer শব্দের অর্থ 'To share' অর্থাৎ অংশগ্রহণ করা। এ অর্থগত দিক থেকে যোগাযোগ বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ (to participate in) করাকে বুঝায়। বস্তুত যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নের লক্ষ্যে একজন ব্যক্তি অন্যজনের চিন্তাধারা, ভাব, অনুভূতি বা কর্মপ্রক্রিয়ায় সমভাবে অংশগ্রহণ করে সাধারণ বোঝাপড়া বা বোধগম্যতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

**অধ্যাপক লুইস এ. এলেন (L. A. Allen)** বলেন, "একে অন্যের মনে বোধ জাগ্রত করার নিমিত্তে যে সব কার্য সম্পাদন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এদের সমষ্টিই হল যোগাযোগ।"

**দি আমেরিকান সোসাইটি অব ট্রেনিং ডিরেক্টরস্**-এর মতে, "পারস্পরিক সমঝোতা ও আস্থা অর্জন অথবা উন্নত মানব সম্পর্ক অর্জনের লক্ষ্যে চিন্তাধারা বা তথ্যাদির বিনিময় বা আদান-প্রদানই হচ্ছে যোগাযোগ।"

মূলত যোগাযোগ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য বা সংবাদ এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হয়। কোন বিষয়ে তথ্য, ভাব বা সংবাদের বিনিময় বা আদান-প্রদান পারস্পরিক কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চিঠিপত্র, আভাস বা আকার-ইংগিতে হতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাধারা, ভাব বা অনুভূতি, আবেগ, মতামত, তথ্য ইত্যাদির বিনিময় হলে তাকে যোগাযোগ বলা হবে।

সুতরাং, পারস্পরিক সমঝোতা ও বোধগম্যতা আনয়নের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা ভাবের বিনিময় বা আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে।

**● যোগাযোগের কতিপয় সংজ্ঞা ঃ**

১। **নিউম্যান ও সামার**-এর মতে, "দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ভিতর তথ্য, ধারণা, মতামত বা আবেগ-অনুভূতির বিনিময় প্রক্রিয়াই হচ্ছে যোগাযোগ।"

২। **ইলিয়ট জ্যাকার** বলেন, "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রেরিত বা সংক্রমিত অনুভূতি, মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের সমষ্টিকে যোগাযোগ বলে।" (Communication is the sum total of directly and indirectly, consciously or unconciously transmitted feelings, attitudes and wishes.)

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **National Society for the Study of Communication** -এর মতে, "যোগাযোগ হচ্ছে তথ্য, চিন্তা, মত বা অনুভূতির পারস্পরিক আদান-প্রদান।" (Commincation is the exchange of facts, thoughts and opinions.)

৪। **মারফি এবং প্যাক** বলেন, "যোগাযোগ হল জনগণের মধ্যে ধারণা বা তথ্য বিনিময়ের একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া।" (Communication is a two way process of exchanging ideas or information between human beings.)

৫। **অধ্যাপক চার্লস কুলি**-এর মতে "যোগাযোগ হল এমন একটি তথ্য প্রেরণ, জ্ঞাপন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানব সম্পর্ক জীবন্ত ও উন্নত হয় এবং যা মানব মনের সমস্ত চিন্তা ও ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।"

৬। **অধ্যাপক ম্যাক ফারল্যান্ড**-এর ভাষায়, "যোগাযোগ হল জনসাধারণের মধ্যে অর্থসমূহের (Meaning) অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা চিন্তাধারা প্রেরণের প্রক্রিয়া বিশেষ।"

৭। **গেরী ডেসলার** বলেন, "তথ্যের বিনিময় এবং অর্থ বা ভাবের আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে।" (Communication is the exchange of information and the transmission of meaning.)

৮। **American Management Association**-এর মতে, "ভাবের আদান-প্রদান সংক্রান্ত যে কোন ধরনের ব্যবহারকেই যোগাযোগ বলা হয়।"

**কারবার যোগাযোগ (Business communication) ঃ** কারবার যোগাযোগ যোগাযোগের একটি শাখা। সাধারণভাবে বলতে গেলে কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হয় তখন তাকে কারবার যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়। কারবার যোগাযোগ প্রধানত পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন, বণ্টন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদির বিনিময় বা আদান-প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত। কারবারি বা ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়তই ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে কারবারি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-চেতনা, মতামত, তথ্য, ভাব বা অনুভূতির বিনিময় করতে হয়। মোট কথা, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের বা বাইরের যে কোন পক্ষের সাথেই তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হোক না কেন এর বিষয়বস্তু কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত হলেই তাকে কারবার যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়।

**নিম্নে কারবার যোগাযোগের কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ**

১। **বি. লরেন্স (B. Lawrence)**-এর মতে, "কারবার যোগাযোগ হচ্ছে বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত ধারণার প্রকাশ, পরিবেশন, গ্রহণ ও বিনিময় প্রক্রিয়া।" (Business communication is the expression, channelling. receiving and interchanging of ideas in commerce and industry.)

২। **অধ্যাপক ডব্লিউ. এইচ. মেনিং (Prof. W.H. Meaning)**-এর ভাষায়, "কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে এতদ্‌সম্পর্কিত ধারণা, সংবাদ ও মতামত বিনিময়কে কারবার যোগাযোগ বলে।" (The exchange of ideas, news & views in connection with the business among the related parties is called business Communication.)

৩। **অধ্যাপক জে. হাস্ট (Prof. J. Hust)** বলেন, "সুচারুরূপে কারবার পরিচালনা ও সংগঠনের নিমিত্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ভিতর যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে কারবার যোগাযোগ বলে।"

৪। **অধ্যাপক জে. টেরি এর মতে,** "কারবার যোগাযোগ হল ব্যবস্থাপনীয় কার্যাবলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লুব্রিকেন্ট"।

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায়িক লক্ষ্যার্জনের নিমিত্তে সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে কারবার পরিচালনার জন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বাইরের দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাব, তথ্য বা সংবাদাদির আদান-প্রদান হলে তাকে কারবার যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলে।

## ৫.২ কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের পরিধি বা আওতা বা কার্যাবলি (Scope or Function of Business Communication ) ঃ

আধুনিক ব্যবসায় জগতে যোগাযোগের পরিধি বা আওতা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিটি স্তরেই যোগাযোগ বহুলভাবে ব্যবহৃত। যোগাযোগ ব্যবস্থা কারবারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বণ্টন এবং উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়ক সমুদয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি কারবারী কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সাথেও যোগাযোগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মোট কথা, কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে যোগাযোগ এর পরিধি বিস্তৃত করে রেখেছে।

ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের পরিধিকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

**১। সম্পদ আহরণ (Collection of Resources) ঃ** কারবারের উৎপাদনকার্য আরম্ভ করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজনীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ও জনশক্তির দরকার হয়। উৎপাদনের জন্য এসব বস্তুগত ও জনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেই সেগুলো সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যোগাযোগের মাধ্যমেই বিভিন্ন উৎস থেকে এ সকল সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। কাজেই দেখা যায়, পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণ আহরণের ক্ষেত্রে যোগাযোগ কার্যক্রম বিস্তৃত।

**২। উৎপাদন (Production) ঃ** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ নির্ভর। পণ্য উৎপাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত মাল-মসলা ও জনশক্তিকে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিতকরণে এবং পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার আবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগই একমাত্র বাহন। তাছাড়া, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মজুতকরণ, যন্ত্রপাতির বিন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। কাজেই উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের আওতাভুক্ত। যোগাযোগ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুসংহত করে কারবারী প্রতিষ্ঠানকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

**৩। বণ্টন (Distribution) ঃ** কারবার যোগাযোগের আওতা কেবলমাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত নয়; উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ প্রক্রিয়া বিস্তৃত। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের পর ভোক্তাদের নিকট এর বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কেননা, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানো না গেলে উৎপাদকের উদ্দেশ্য যেমন অর্জিত হয় না, তেমনি ভোক্তার চাহিদাও মেটে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে বণ্টন কার্যকে সহজ করে তোলে।

**৪। উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়ক কার্যকলাপ (Aids to Production and Distribution) ঃ** ব্যবসায়িক যোগাযোগ উৎপাদন ও বণ্টন কার্যের পাশাপাশি উৎপাদন ও বণ্টন কার্যে সহায়ক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ভোগকারীর নিকট বণ্টনের সময় পণ্যের পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগের সাহায্য নিতে হয়। যেমন– উৎপাদনকার্য চালানোর জন্য কাঁচামাল আনয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ভোগকারীর নিকট প্রেরণের জন্য পরিবহণের প্রয়োজন হয়। আবার উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত এসব কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘরের দরকার হয়। যোগাযোগের মাধ্যমেই এসব সম্ভব। তাছাড়া, উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ে। ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেই এ অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। উপরন্তু ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য বীমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করতেও যোগাযোগের সাহায্য নিতে হয়। মোট কথা, উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়ক যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদনে যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় তা কারবার যোগাযোগের আওতাভুক্ত।

**৫। কারবার গবেষণা (Business Research) ঃ** কারবারি সংগঠনকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি, কৌশল ও ধারণা উদ্ভাবনের আবশ্যক হয় এবং এজন্য বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম চালাতে হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা এ ধরনের গবেষণামূলক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য। কারবার গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়, যেমন– উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যোগাযোগ বিরাজমান।

**৬। প্রচার (Publicity) ঃ** বর্তমান ব্যবসায় জগতে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে প্রচার একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম যার দ্বারা গ্রাহকদের কারবারের পণ্যদ্রব্য ও সেবা বিক্রয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা হয়। পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের প্রচারের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়িক যোগাযোগের আওতা বিস্তৃত।

**৭। কারবার ব্যবস্থাপনা (Business Management) ঃ** কারবারকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থাপনাই মূল চালিকাশক্তি। ব্যবস্থাপককে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত যেসব কার্য সম্পাদন করতে হয় তার প্রতিটি পদক্ষেপই যোগাযোগ নির্ভর। যোগাযোগ কারবার ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি যথা– পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, নির্দেশনা-সমন্বয় সাধন, প্রেষণা-প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। তাই কারবার ব্যবস্থাপনার সমুদয় কর্মপ্রক্রিয়াই যোগাযোগের অধীন।

**৮। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে (Employer-Employee Relations) ঃ** সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক কারবারের সফলতার পূর্বশর্ত। এ সম্পর্ক যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়। যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চললে শ্রমিক-কর্মীদের অসুবিধা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা অবহিত হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। এমনিভাবে প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাজেই উন্নত শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার জন্য যোগাযোগের ব্যবহার অপরিহার্য।

**৯। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) ঃ** বর্তমানে যোগাযোগ কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে দেশ-দেশান্তরে। যোগাযোগের মাধ্যমেই এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সংঘটিত হচ্ছে এবং এর বদৌলতেই আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে একটি দ্রব্য উৎপাদিত হলেও অন্য প্রান্তের ভোক্তারা তা নিজের স্থানে বসে ক্রয় করতে ও ভোগ করতে পারছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, যোগাযোগ কারবারের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই জড়িত। কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের যতগুলো ক্ষেত্র আছে এবং সেগুলোর সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জড়িত সে সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের আওতা বা পরিধি বিস্তৃত। বস্তুত কারবার যোগাযোগের আওতা কারবারের প্রতিটি স্তরে ব্যাপৃত। বর্তমানে কারবারের আয়তন ও কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করছে।

## ৫.৩ ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি বা প্রয়োজনীয়তা (Objectives or Importance of Business Communication) ঃ

কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহের মধ্যে তথ্য, ভাব বা সংবাদাদির আদান-প্রদানের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করাই কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে **চেস্টার আই, বার্নার্ড (Chester I. Burnerd)** বলেছেন, "যোগাযোগ হচ্ছে কারবার পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু।" মূলত যোগাযোগের মাধ্যমেই কারবারি বা ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদাদি সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নিশ্চিত করে থাকে।

কারবারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য

(খ) ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্য-সম্পাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য এবং

(গ) অন্যান্য উদ্দেশ্য।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

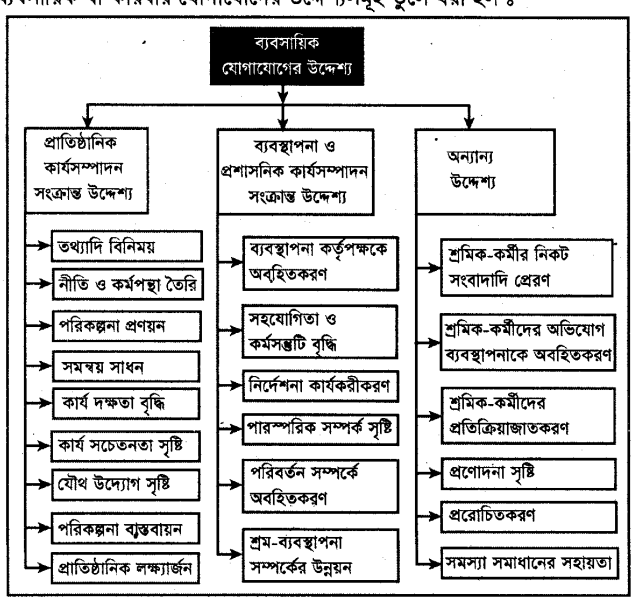

**(ক) প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলি (Objectives relating to Organisational Activities) ঃ**

**১। তথ্যাদির বিনিময় (To Exchange Information) ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে তথ্য বা সংবাদাদির বিনিময় বা আদান-প্রদান প্রয়োজন। ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো কারবারি কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা সংবাদাদির বিনিময় করা।

**২। নীতি ও কর্মপন্থা তৈরি (To Make Policies and Procedures of Work) ঃ** ব্যবসায় বা কারবারি প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের নীতিমালা ও কর্মপন্থা তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের মাধ্যমেই এসব তথ্য ও উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা হয়।

**৩। পরিকল্পনা প্রণয়ন (To Make Plan) ঃ** কারবারের ইপ্সিত লক্ষ্যার্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যক। যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রণয়নের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে।

**৪। সমন্বয় সাধন (To Co-ordinate) ঃ** কারবার যোগাযোগের আরেকটি উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মীদেরকে সুসংগঠিত করে তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে।

**৫। কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি (To Increase Efficiency of Work) ঃ** কর্মীরা যাতে অধিকতর দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলাও কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে নানাবিধ তথ্যের যোগান দিয়ে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

**৬। কার্য সচেতনতা সৃষ্টি (To Create Consciousness of Work) ঃ** দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন কর্মীর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু হলে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য-সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের একটি উদ্দেশ্য।

**৭। যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টি (To Create Joint Effort) ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা ব্যবস্থাপনার একার পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপায়ে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করাও কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্য।

**৮। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (To Implement Plans) ঃ** কারবারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিত করে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

**৯। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন (To Achieve Organisational Goal) ঃ** প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সুসংগঠিত করে তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কারবারের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন করা কারবার যোগাযোগের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

**(খ) ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলি (Objectives relating to Managerial and Administrative Works) ঃ**

**১। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ (To Inform Management Authority) ঃ** ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যই যোগাযোগ কেন্দ্রিক। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থাপকীয় কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা করা যোগাযোগের লক্ষ্য।

**২। সহযোগিতা ও কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি (To Increase Coordination and Job Satisfaction) ঃ** কারবার যোগাযোগের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিটি কর্মীর মধ্যে সহযোগিতা ও কর্মসন্তুষ্টি আনয়ন এবং তা বৃদ্ধি করা যাতে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্য কাম্য গতিতে চলতে পারে।

**৩। নির্দেশনা কার্যকরীকরণ (To Implement Direction) ঃ** যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই যে কোন প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ অধঃস্তন কর্মীদেরকে জ্ঞাত করানো হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। কাজেই যে কোন প্রশাসনিক নির্দেশাবলিকে কার্যকরীকরণের সহায়তা করাও যোগাযোগের একটি উদ্দেশ্য।

**৪। পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি (To Create Relative Relationship) ঃ** ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকবৃন্দ, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং শ্রমিক-কর্মীসহ সকল স্তরের ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তা অটুট রাখা।

**৫। পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণ (To Inform Alternation or Changes) ঃ** কারবারের স্বার্থে ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ও নীতিমালার কোন পরিবর্তন ঘটানো হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য।

**৬। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন (To Improve Employer-Employee Relations) ঃ** উন্নত শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান করে শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো যায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা ও বজায় রাখা যোগাযোগের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

**(গ) ব্যবসায়িক যোগাযোগের অন্যান্য উদ্দেশ্য (Other Objectives of Business Communication) ঃ**

**১। শ্রমিক-কর্মীর নিকট সংবাদাদি প্রেরণ (To Send Messages or Informations to Employee) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট থেকে কার্যাদেশ, পরামর্শ, উপদেশাবলি এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বা সংবাদাদি শ্রমিক-কর্মীদের নিকট যথাযথভাবে প্রেরণ করাও যোগাযোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

**২। শ্রমিক-কর্মীদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনাকে অবহিতকরণ (To Inform Employees Complaints to Management) ঃ** কারবার যোগাযোগের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনের নিম্নস্তরের কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা যাতে সেগুলোর সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

**৩। শ্রমিক-কর্মীদের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাতকরণ (To Inform Employees Reaction) ঃ** ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের আর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মপন্থা, নীতিমালা, প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মচারীদের মনোভাব কী বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কী রকম তা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অবহিত করা।

**৪। প্রণোদনা সৃষ্টি (To Create Motivation) ঃ** কর্মীরা যাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে সেজন্য প্রণোদনা দান করাও কারবার যোগাযোগের একটি লক্ষ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপকদের সাথে শ্রমিক কর্মীদের সংযোগ সাধন করে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনার সৃষ্টি করে।

**৫। প্ররোচিতকরণ (To Persuade) ঃ** কারবারের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী ও কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বাইরের বিভিন্ন পক্ষ, যেমন– গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও ভোক্তাদেরকে প্ররোচনা দানের প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্ররোচিত করে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা হয়।

**৬। সমস্যা সমাধানে সহায়তা (To Facilitate Solving Problems) ঃ** কারবারি প্রতিষ্ঠানের উন্নত কার্য পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা ও সমস্যাবলি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাও কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের উদ্দেশ্য।

উপরালোচিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগ একটি কারবারি সংগঠনকে সাফল্যের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পারে। মোট কথা, যোগাযোগের মাধ্যমেই কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে

## ৫.৪ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানসমূহ (Essential Elements of Communication Process) ঃ

প্রাথমিক দৃষ্টিতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক, সংবাদ বা তথ্য এবং যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক। এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় আরও কতকগুলো উপাদান জড়িত থাকে যার কোন একটির অনুপস্থিতিতে যোগাযোগ কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এগুলোকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক ধাপ বা পদক্ষেপও বলা হয়ে থাকে। কেননা এ উপাদানগুলোর সমন্বয়েই যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

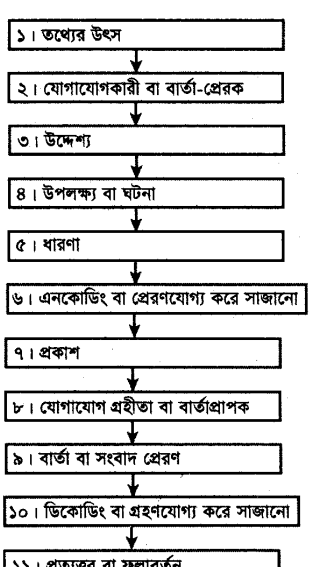

**যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ**

**১। তথ্যের উৎস (Sources of information) ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম উপাদান হল তথ্যের উৎস। প্রতিটি যোগাযোগেরই একটি উৎস থাকে। এ উৎস কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, কিংবা অন্য কোন কিছু হতে পারে। তথ্যের উৎস হতেই যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কাজেই একে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

**২। যোগাযোগকারী বা বার্তা-প্রেরক (Message sender) ঃ** যে ব্যক্তি বা পক্ষ সংবাদ বা তথ্য অন্য ব্যক্তি বা পক্ষের নিকট প্রেরণ করে তাকে যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক বলা হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তিনিই উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তথ্যের উৎস থেকে ধারণা সংগ্রহ করে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন।

**৩। উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ** যোগাযোগকারী কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেই সংবাদ বা তথ্য যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন প্রকার যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। প্রতিটি যোগাযোগের ক্ষেত্রেই সংবাদ বা তথ্য প্রেরণের একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকবে।

**৪। উপলক্ষ্য বা ঘটনা (Occation) ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উপলক্ষ্য বা ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন যোগাযোগ স্থাপনের পশ্চাতে কোন বিশেষ উপলক্ষ্য বা ঘটনা কাজ করে।

**৫। ধারণা (Assumption) ঃ** যোগাযোগের বার্তার বিষয়বস্তুই হচ্ছে ধারণা। এটি যোগাযোগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক তার আবেগ, অনুভূতি বা ধারণা যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তা প্রাপকের নিকট প্রেরণ করে। এই ধারণার মাঝেই বার্তা প্রেরকের মনের ভাব বা ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

**৬। এনকোডিং বা প্রেরণযোগ্য করে সাজানো (Encoding) ঃ** এটি হচ্ছে বার্তার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের একটি মানসিক প্রক্রিয়া। বার্তাপ্রেরক তার ধারণা কীভাবে প্রাপকের নিকট উপস্থাপন করবে এবং কীভাবে প্রেরণ করলে তা প্রাপকের নিকট সহজবোধ্য হবে সে সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণই হচ্ছে এনকোডিং। এক্ষেত্রে বার্তা প্রেরক তার ধারণা বা অনুভূতিকে বোধগম্য সংকেতে রূপান্তর করে প্রেরণযোগ্য করে সাজায়।

**৭। প্রকাশ (Publish) ঃ** বার্তা প্রেরক তার ধারণা বার্তা প্রাপকের নিকট বোধগম্য করে তোলার নিমিত্ত সুবিধাজনক কোন মাধ্যম বা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে বার্তা প্রেরক মৌখিক কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, লিখিত চিঠিপত্র ও নির্দেশিকা ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন।

তাছাড়া অঙ্গভঙ্গি, নীরবতা, ধ্বনি, শব্দ কিংবা অন্য কোন সংকেত বা প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদির মাধ্যমেও ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন।

**৮। যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক (Message receiver) ঃ** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক যে ব্যক্তি বা পক্ষের নিকট সংবাদ বা বার্তা প্রেরণ করে তাকে যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি বা যিনি সংবাদ গ্রহণ করেন বা যাকে উদ্দেশ্য করে সংবাদ প্রেরণ করা হয় তিনি তা গ্রহণ করলে বার্তাপ্রাপক হিসেবে পরিগণিত হন। যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপকের অনুপস্থিতিতে যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন হতে পারে না।

**৯। বার্তা বা সংবাদ প্রেরণ (Send information) ঃ** যোগাযোগকারী তার বার্তা বা সংবাদ একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। বার্তা প্রেরণের এই চ্যানেল বা গমনাগমন পথ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যে কোন পদ্ধতির হতে পারে। অফিসিয়াল নিয়ম-কানুন বা রীতিনীতি অনুযায়ী বার্তা প্রেরিত হলে তাকে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং অফিসিয়াল নিয়মনীতি-বহির্ভূত চ্যানেলকে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি বলা হয়।

**১০। ডিকোডিং বা গ্রহণযোগ্য করে সাজানো (De-coding) ঃ** বার্তা প্রেরকের নিকট হতে নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে সংবাদ বা তথ্য বার্তা প্রাপকের নিকট পৌছানোর পর প্রাপক উক্ত তথ্যকে তার নিজস্ব ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য করে সাজান, একেই ডিকোডিং বলা হয়। যোগাযোগের সফলতার জন্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ডিকোডিং অপরিহার্য।

**১১। প্রত্যুত্তর বা ফলাবর্তন (Feed back) ঃ** এটা যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বার্তা প্রাপকের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। যোগাযোগকারী সংবাদ বা তথ্য প্রেরণের পর বার্তাপ্রাপক প্রাপ্ত সংবাদ বা বার্তার বিষয়বস্তুর আলোকে যে সাড়া প্রদান করেন তাই প্রত্যুত্তর। যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক তার অভীপ্সানুযায়ী প্রত্যুত্তর প্রদান করলেই যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

উপরোক্ত উপাদানগুলো যে কোন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় থাকা অপরিহার্য। তবে এর কোন একটি উপাদান এককভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতা আনয়নে এদের সকলের উপস্থিতি আবশ্যক।

# অনুশীলনী-৫

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। ইংরেজি Communication শব্দটি কোন্ দেশিয় শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** ইংরেজি Communication শব্দটি ল্যাটিন 'Communis' শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

**২। যোগাযোগ কী?**

**অথবা, যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও।** [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর ঃ** দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ধারণা, মতামত বা আবেগ অনুভূতির বিনিময় প্রক্রিয়াই হচ্ছে যোগাযোগ।

**৩। কীভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর ঃ** কোন বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান বা বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

**৪। যোগাযোগ কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগের পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ যোগাযোগকারী বার্তা প্রেরণের পর যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক তার অভীপ্সা অনুযায়ী প্রত্যুত্তর প্রদান করলেই যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়।

**৫। যোগাযোগকারী বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** যে ব্যক্তি বা পক্ষ সংবাদ বা বার্তা অন্যকে প্রেরণ করে তাকে যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক বলা হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তিনিই উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাকে কেন্দ্র করেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৬। মানুষ কেন কীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে?**

**উত্তর ঃ** মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই যোগাযোগ নির্ভর। যোগাযোগ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার কথাও কল্পনা করা যায় না। তাই মানুষ তার প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে তথ্য বা ভাবের পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

**৭। বাণিজ্যিক যোগাযোগে কয়টি পক্ষ থাকে উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক তথা যে কোন যোগাযোগে দু'টি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সংবাদ বা তথ্য প্রেরণ করে এবং অন্য পক্ষ উক্ত সংবাদ বা তথ্য গ্রহণ করে।

**৮। যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর ঃ** একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাধারা, ভাব, আবেগ, অনুভূতি, মতামত, তথ্য ইত্যাদির বিনিময় হলে তাকে যোগাযোগ বলা হয়।

**৯। যোগাযোগের সম্পূর্ণতা কীভাবে আনয়ন করা যায়?**

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তন প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে যোগাযোগে পরিপূর্ণতা আনয়ন করা যায়। বার্তাপ্রেরক বার্তা প্রেরণের পর বার্তাগ্রাহক সংবাদ বা তথ্য গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিক্রিয়া জানালেই যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

**১০। ব্যক্তিগত জীবনে যোগাযোগ প্রয়োজন হয় কেন?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিটি মানুষ তার জাগ্রত সময়ের পুরোভাগই কারও না কারও সাথে কথাবার্তা বলে, আকার-ইঙ্গিতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ স্থাপন করে তার প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকে। মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়াই যোগাযোগের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষকে তার জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই যোগাযোগের মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাই ব্যক্তিগত জীবনে যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

**১১। এনকোডিং (Encoding) কী?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৪]

**অথবা, এনকোডিং বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর ঃ** যে প্রক্রিয়ার বার্তা প্রেরক তার ধারণা কীভাবে বার্তা প্রাপকের নিকট উপস্থাপন করবে এবং প্রেরণ করলে তা বার্তা প্রাপকের নিকট সহজবোধ্য হবে সে সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছে এনকোডিং।

**১২। ডিকোডিং কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** যে নির্দিষ্ট মাধ্যমে তথ্য বা সংবাদ প্রাপকের নিকট পৌছানোর পর তিনি তা নিজের ধ্যান-ধারণা বা বোধগম্য বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য করে সাজান, একে ডিকোডিং বলে।

**১৩। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর ঃ** যে প্রক্রিয়ায় তথ্য বা সংবাদ প্রেরকের নিকট থেকে গ্রাহক বা প্রাপকের নিকট পৌছে সে প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ প্রক্রিয়া বলে।

**১৪। ব্যবসায়ের যোগাযোগের কার্যাবলি বলতে কী বুঝ?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য বা লক্ষ্যে যোগাযোগ বিভিন্ন কার্যসম্পাদন করে তাকে যোগাযোগের কার্যাবলি বলে।

**১৫। প্রত্যুত্তর/ফলাবর্তন কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** এটি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ। যোগাযোগকারী সংবাদ বা তথ্য প্রেরণের পর বার্তা প্রাপক প্রাপ্ত সংবাদ বা বার্তার বিষয়বস্তু যে প্রতিক্রিয়ায় সাড়া প্রদান করে তাকে ফলাবর্তন বলে।

**১৬। সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ কার্যসম্পাদনের জন্য কী কী মৌলিক পদক্ষেপ বা উপাদান থাকা প্রয়োজন?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক উপাদান বা পদক্ষেপ থাকা প্রয়োজন ঃ

১। যোগাযোগকারী
২। উদ্দেশ্য
৩। উপলক্ষ্য বা ঘটনা
৪। ধারণা
৫। মাধ্যম
৬। চ্যানেল
৭। যোগাযোগ গ্রহীতা
৮। ফলাবর্তন।

**১৭। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান কয়টি ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান ৩টি, যথা– সংবাদ প্রেরক, সংবাদ প্রেরণ এবং সংবাদ গ্রহীতা।

**১৮। বাণিজ্যিক যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১৩(T)]

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক যোগাযোগকারী মৌখিক কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, লিখিত চিঠিপত্র ও নির্দেশিকা ইত্যাদি মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে।

## ▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** সাধারণ অর্থে যোগাযোগ বলতে তথ্য বা সংবাদ বিনিময়কে বুঝায়। একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষ তাদের মধ্যে কোন তথ্য বা সংবাদের আদান-প্রদান করলে তাকে যোগাযোগ বলে অভিহিত করা হয়। এর সাহায্যে সংবাদ প্রেরক ও পাঠক পারস্পরিকভাবে চিন্তা-চেতনা, মতামত, ঘটনা, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি বিনিময় করে থাকে।

মূলত যোগাযোগ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য বা সংবাদ এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হয়। প্রেরক প্রাপকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করলে অথবা প্রাপক সংবাদ প্রাপ্তির পর প্রেরককে তার প্রতিক্রিয়া জানালে 'যোগাযোগ'-এর সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাধারা, ভাব বা অনুভূতি, আবেগ, মতামত, তথ্য ইত্যাদির বিনিময় হলে তাকেই যোগাযোগ বলে।

**২। কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, পরি-২০১০, ০৯, ১১]

**উত্তর** কারবার যোগাযোগ যোগাযোগের একটি শাখা। সাধারণভাবে বলতে গেলে কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হয় তখন তাকে কারবার যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়। কারবারি বা ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়তই ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে কারবারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কার্যরত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-চেতনা, মতামত, তথ্য, ভাব বা অনুভূতির বিনিময় করতে হয়।

সুতরাং, ব্যবসায়িক লক্ষ্যার্জনের নিমিত্ত ও সুষ্ঠুভাবে কারবার পরিচালনার জন্য কারবারি প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বাইরের দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাব, তথ্য বা সংবাদাদির আদান-প্রদান হলে তাকে কারবার যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলে।

**৩। যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১৩(T)]

**উত্তর** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক তার ধারণা বার্তাপ্রাপকের নিকট বোধগম্য করে তোলার নিমিত্তে সুবিধাজনক কোন মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে যোগাযোগকারী মৌখিক কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, লিখিত চিঠিপত্র ও নির্দেশিকা ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন।

তাছাড়া অঙ্গভঙ্গি, নীরবতা, ধ্বনি, শব্দ কিংবা অন্য কোন সংকেত বা প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদির মাধ্যমেও ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

**৪। ব্যবসায়িক যোগাযোগ কীভাবে সংঘটিত হয়?**

**উত্তর** সাধারণত এক ব্যক্তির নিকট হতে অন্য ব্যক্তির নিকট তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ কার্য সংঘটিত হয়। ব্যবসায়িক যোগাযোগও এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বা সংবাদাদির আদান-প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে যোগাযোগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার সুবিধামত মাধ্যমে সংবাদ বা তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রাপকের নিকট অর্থাৎ বার্তাগ্রাহকের নিকট প্রেরণ করে। বার্তাপ্রাপক বা সংবাদ গ্রহীতা উক্ত সংবাদ বা তথ্যের আলোকে সাড়া প্রদান করলেই যোগাযোগ কার্য সম্পূর্ণ হয়।

**৫। যোগাযোগকে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্র বলা হয় কেন?**

**উত্তর** আধুনিক ব্যবসায় জগতে যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায় পরিচালনার প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কাজে এবং বিশেষ করে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যোগাযোগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কারবার ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যকরী পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারীদের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে তথ্যাদির ঊর্ধ্বগমন, নিম্নগমন ও আন্তঃগমন যোগাযোগের প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত; আর এর ওপরই নির্ভর করে ব্যবসায়ের সার্বিক সাফল্য। মূলত যোগাযোগই ব্যবসায় পরিচালনার ভিত্তি। যোগাযোগ ব্যতীত কোন ব্যক্তি ব্যবসায় কার্য চালাতে পারে না। যোগাযোগ হচ্ছে ব্যবসায় পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। ব্যবসায়ের সমুদয় কার্যকলাপই যোগাযোগ নির্ভর। তাই যোগাযোগকে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

**৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে যোগাযোগ কী ভূমিকা পালন করে?** [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর** যোগাযোগ ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির পথ উন্মোচন করে। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক জানা-শোনা ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগের মাধ্যমে এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সংঘটিত হচ্ছে, হচ্ছে সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার বিনিময়। দেশ-বিদেশের সাথে কারবারি লেনদেনের সম্প্রসারণ এবং সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার বিনিময়ের ফলে বহির্বিশ্বের সাথে স্থাপিত হচ্ছে সম্প্রীতির সম্পর্ক। এভাবে যোগাযোগ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৭। বাণিজ্যিক যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১২]

**উত্তর** কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেকোন পক্ষের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ বা তথ্য বিনিময় হলে তাকে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বলে।

**৮। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপ কী কী?** [বাকাশিবো-২০০১, ০৫, ০৯, ১৪]

**উত্তর** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

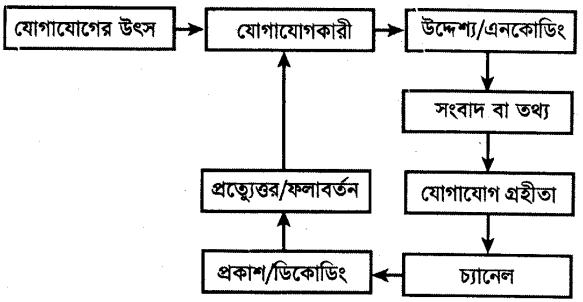


## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। যোগাযোগ (Communication) বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। যোগাযোগের কার্যাবলি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৯, পরি-১০, ১২]

**উত্তর সংকেত** ৫.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। কারবার যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও। যোগাযোগের আওতা নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫]

**উত্তর সংকেত** ৫.১ ও ৫.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যবসায়িক বা কারবার বা বাণিজ্যিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** ৫.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
[বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** ৫.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। কারবার যোগাযোগ কী? কারবার যোগাযোগের অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর সংকেত** ৫.১ ও ৫.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। কারবার যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** ৫.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

*******

# অধ্যায়-৬

# যোগাযোগ মডেল ও ফলাবর্তন (Communication Model & Feedback)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৬.০ সূচনা; ৬.১ যোগাযোগ মডেলের সংজ্ঞা; ৬.২ যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কার্যাবলি; ৬.৩ ফলাবর্তনের সংজ্ঞা; ৬.৪ কার্যকর ফলাবর্তনের নীতিমালা; ৬.৫ সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন কি অপরিহার্য*

## ৬.০ সূচনা (Introduction) ঃ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংবাদ বা তথ্য প্রেরকের কাছ থেকে কতকগুলো ধাপ বা স্তর অতিক্রম করে সংবাদ প্রাপক বা বার্তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছায় এবং সংবাদ প্রাপকের নিকট হতে পুনরায় ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদটির প্রত্যুত্তর প্রেরকের নিকট ফেরত আসে। এভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সহজ ও সার্থক উপলব্ধির জন্য যোগাযোগ মডেলের উদ্ভব হয়েছে। যোগাযোগ মডেল বস্তুত যোগাযোগ প্রক্রিয়ারই চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন।

যোগাযোগের পরিপূর্ণতার জন্য ফলাবর্তনের আবশ্যকতা রয়েছে। অধিকাংশ যোগাযোগেই ফলাবর্তন একটি অপরিহার্য প্রত্যাশা। যোগাযোগকারী যার সাথে যোগাযোগ করেন তার কাছ থেকে একটি উত্তর আশা করেন। এ উত্তর ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন। এ কারণে যোগাযোগে প্রত্যুত্তর বা ফলাবর্তনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।



## ৬.১ যোগাযোগ মডেলের সংজ্ঞা (Definition of Communication Model) ঃ

ইংরেজি মডেল (Model) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল নকশা, ছাঁচ যার আদলে কোন কিছু তৈরি করা হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মডেল শব্দটি অনেকটা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নকশা বা রৈখিক উপস্থাপনকে যোগাযোগ মডেল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগকারী বা সংবাদ প্রেরক, সংবাদ বা তথ্য, প্রেরণ মাধ্যম বা চ্যানেল, যোগাযোগ গ্রহীতা বা সংবাদ প্রাপক, ফলাবর্তন ইত্যাদি অনেকগুলো উপাদান জড়িত থাকে। এ উপাদানগুলো যখন নকশাকারে রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে যোগাযোগ মডেল বলে। অর্থাৎ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নকশা বা রৈখিক উপস্থাপনকে যোগাযোগ মডেল বলা হয়। যোগাযোগ মডেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলোকে ক্রমধারা অনুযায়ী রেখাচিত্র, তীরচিত্র নির্দিষ্ট ছকে বা অন্য কোন উপায়ে দৃশ্যমান করে তোলা হয়। এতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সংবাদের উৎস থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রতিটি উপাদান রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। যোগাযোগ মডেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে শুধু চিত্রায়িত করা হয়, সংবাদ বা তথ্যের পূর্ণ বিবরণ বা ব্যাখ্যা এতে থাকে না।

সুতরাং বলা যায়, যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে যখন রেখাচিত্র, তীর চিত্র বা অন্য কোন উপায়ে চিত্রায়িত করে উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে যোগাযোগ মডেল বলে।

## ৬.২ যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কার্যাবলি (Basic Functions of Communication Model) ঃ

যোগাযোগ মডেল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার চিত্রগত রূপ। এর মাধ্যমে সহজভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করা যায়।

নিম্নে যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কার্যাবলি আলোচনা করা হল ঃ

**১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দান (Instruction about communication process) ঃ** যোগাযোগ মডেলে সংবাদ বা তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত উপাদানগুলো প্রদর্শিত হয় যা থেকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। তাই বলা যায়, যোগাযোগ মডেল যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

**২। গবেষণা কার্যে সহায়তা (Help research function) ঃ** যোগাযোগ মডেলের আর একটি মৌলিক কাজ হল যোগাযোগ বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা করা। যোগাযোগ মডেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যে উপাদানগুলো প্রদর্শিত হয়, গবেষকগণ তা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে, সহজেই যোগাযোগের উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে পারে।

**৩। পূর্বাভাস প্রদান (Further information) ঃ** যোগাযোগ মডেল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সফলতা বা বিফলতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দান করে। এ মডেলের মাধ্যমে বিশেষ কোন যোগাযোগের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত তিনটি মৌলিক কার্য যোগাযোগ মডেলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। মি. জে. মিলার (J. Miller) নামে একজন বিশেষজ্ঞ যোগাযোগ মডেলের এ. তিনটি মৌলিক কাজের উল্লেখ করেছেন।

## ৬.৩ ফলাবর্তনের সংজ্ঞা (Definition of Feedback) ঃ

'ফলাবর্তন' শব্দের ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Feedback যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহারের জন্য ফেরত পাঠান। যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'ফলাবর্তন' বলতে বার্তাপ্রেরকের নিকট হতে প্রেরিত সংবাদ বা তথ্য বার্তাপ্রাপকের প্রতিউত্তরসহ পুনরায় বার্তাপ্রেরকের নিকট ফিরে আসাকে বুঝায়।

মূলত ফলাবর্তন দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি কৌশল। এর মাধ্যমে বার্তা প্রাপক তার মনের প্রতিক্রিয়া প্রেরককে অবহিত করে থাকে। বার্তাপ্রাপক সংবাদ বা তথ্য গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিক্রিয়া যখন প্রেরকের নিকট বার্তারূপে পাঠায় তখন তাকে ফলাবর্তন বলে। প্রেরক কর্তৃক প্রাপকের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা তথ্য তখনই ফলপ্রসু হয় যখন প্রাপক প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার প্রতিক্রিয়া প্রেরককে অবহিত করে।

**প্রামাণ্য সংজ্ঞা ঃ**

১। **Wofford ও তাঁর সহযোগীদের** মতে, "ফলাবর্তন এক ধরনের তথ্য যা তথ্য প্রেরককে প্রাপকের উপর তার প্রেরিত সংবাদ বা যোগাযোগের প্রভাব মূল্যায়ন করার সুযোগ করে দেয়।"

২। **D. B. Curtis ও অন্যান্যদের ভাষায়,** "Feedback may be defined as a cycle involving an initial stimulas statement from one person, followed by a response from a second person, leading to a response from the first."

৩। ডঃ এম. এ: মান্নান বলেন, "ফলাবর্তন একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যা একজন ব্যক্তির নিকট হতে শুরু হয়ে অন্য ব্যক্তির প্রতি উত্তরসহ প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে আসে।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ফলাবর্তন হল বার্তাপ্রাপক বা সংবাদ গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যুত্তর। ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাপ্রাপক উভয়েই সংবাদ বা তথ্যাদির বিনিময় করে থাকেন। নিম্নের চিত্রে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দেখানো হল ঃ

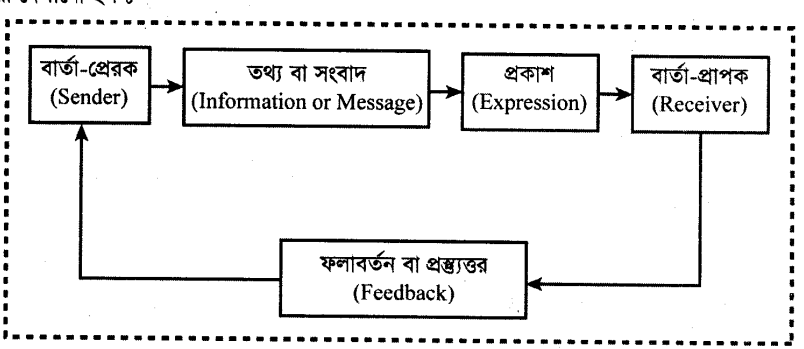


চিত্র ঃ ৬.১ ফলাবর্তন-প্রক্রিয়া

ফলাবর্তন সাধারণত অন্তঃব্যক্তিক (Intrapersonal) ও আন্তঃব্যক্তিক (Interpersonal) এই দু'ধরনের হয়ে থাকে। কোন বিষয়ে ব্যক্তির হাবভাব, চালচলন, আচারব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া বুঝানো হলে তাকে অন্তঃব্যক্তিক ফলাবর্তন বলা হয়। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়কৃত তথ্যের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আন্তঃব্যক্তিক ফলাবর্তন।

## ৬.৪ কার্যকর ফলাবর্তনের নীতিমালা (Principles of Effective Feedback) ঃ

পরিপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু অনেক সময় যোগাযোগে ফলাবর্তন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা যায় না। ফলাবর্তনের কার্যকারিতা মূলত কতিপয় নীতির সুষ্ঠু প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে। কার্যকর ফলাবর্তনের উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বর্ণনাত্মকতার নীতি
২। সুনির্দিষ্টতার নীতি
৩। প্রার্থিতার নীতি
৪। সুস্পষ্টতার নীতি
৫। অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারের নীতি
৬। দ্রুত প্রেরণের নীতি
৭। যুক্তিযুক্ততার নীতি
৮। সংক্ষিপ্ততার নীতি
৯। আন্তরিকতার নীতি
১০। সম্পূর্ণতার নীতি।

ফলাবর্তনের কার্যকারিতা আনয়নে সহায়ক এসব নীতির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

**১। বর্ণনাত্মকতার নীতি (Principles of Descriptiveness) ঃ** কার্যকর ফলাবর্তনের জন্য প্রত্যুত্তর বর্ণনামূলক হওয়া আবশ্যক। এতে যোগাযোগকারী যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট থেকে পরিষ্কারভাবে প্রেরিত বার্তার প্রতিক্রিয়া জানতে পারে। বর্ণনামূলক ফলাবর্তন প্রক্রিয়ায় বার্তাগ্রাহক বা যোগাযোগ গ্রহীতা তার মনোভাব বা মতামত অকপটে ও খোলাখুলিভাবে বার্তা-প্রেরক বা যোগাযোগকারীর নিকট প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

**২। সুনির্দিষ্টতার নীতি (Principle of Definiteness) ঃ** যোগাযোগে ফলাবর্তন সাধারণ (General) না হয়ে সুনির্দিষ্ট (Specific) হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ বার্তাগ্রাহক তার মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে উপস্থাপন না করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগাযোগকারীকে জানাতে হবে। এতে যোগাযোগকারীর পক্ষে বার্তাগ্রাহকের মনোভাব বুঝা সহজ হয়।

**৩। প্রার্থিতার নীতি (Principle of Solicitation) ঃ** ফলাবর্তন আরোপিত (Imposed) না হয়ে প্রার্থিত (Solicited) হলে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রেরিত সংবাদ, তথ্য বা বার্তা সম্পর্কে বার্তাগ্রাহক যদি স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে তাহলে ফলাবর্তন অধিক কার্যকরী হবে। তাই যোগাযোগকারীকে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যাতে বার্তা-গ্রাহক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে এগিয়ে আসে।

**৪। সুস্পষ্টতার নীতি (Principle of Clarity) ঃ** কার্যকর ফলাবর্তনের জন্য সুস্পষ্টতার নীতি প্রতিপালন করা উচিত। অর্থাৎ বার্তাগ্রাহককে তার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে প্রত্যুত্তর প্রদান করতে হবে। এটি যোগাযোগকারীর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক। দ্ব্যর্থতাবোধক বা অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ফলাবর্তনের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে।

**৫। অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারের নীতি (Principle of use of Informal Channel) ঃ** ফলাবর্তনকে নিশ্চিত ও অধিক কার্যকর করার জন্য আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলও ব্যবহার করতে হবে। কেননা, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

**৬। দ্রুত প্রেরণের নীতি (Principle of Earliest Opportunity) ঃ** ফলপ্রসূ ও কার্যকর ফলাবর্তনের একটি অন্যতম নীতি হল যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে প্রাপ্ত বার্তার প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করা। কারণ, ফলাবর্তন বিলম্বে প্রেরিত হলে তা অন্যের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তা যোগাযোগের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে ফলাবর্তনের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

**৭। যুক্তিযুক্ততার নীতি (Principle of Logical ensurance) ঃ** যোগাযোগের ফলাবর্তন বা প্রতি-উত্তর যুক্তিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা যুক্তিনির্ভর বক্তব্য সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকে। কার্যকর ফলাবর্তনের জন্য যুক্তিযুক্ততার নীতি অনুসরণ করা দরকার।

**৮। সংক্ষিপ্ততার নীতি (Principle of Conciseness) ঃ** ফলাবর্তন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। এতে যোগাযোগকারী খুব তাড়াতাড়ি বার্তাগ্রাহকের প্রতিক্রিয়া বুঝতে সক্ষম হয়। ফলে ফলাবর্তনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

**৯। আন্তরিকতার নীতি (Principle of Cordiality) ঃ** ফলাবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি হল আন্তরিকতার নীতি। এর মাধ্যমে যোগাযোগের প্রতি-উত্তরকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

**১০। সম্পূর্ণতার নীতি (Principle of Completeness) ঃ** কার্যকর ফলাবর্তনের আরেকটি প্রধান নীতি হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। প্রত্যুত্তর অসম্পূর্ণ হলে যোগাযোগকারীর পক্ষে গ্রাহকের মনোভাবের পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ফলাবর্তনের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা যায়, ফলাবর্তনকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু করার মাধ্যমে সফল ও সার্থক যোগাযোগ নিশ্চিত করার নিমিত্ত উপরোক্ত নীতিমালাগুলো মেনে চলা আবশ্যক।

## ৬.৫ সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন কি অপরিহার্য (Is Feedback Essential for Effective Communication Process) ঃ

সফল বা কার্যকরী যোগাযোগের জন্য ফলাবর্তন খুবই প্রয়োজনীয়। ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে যোগাযোগ অপূর্ণ থেকে যায়। সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তনের অপরিহার্যতা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

**১। যোগাযোগের পরিপূর্ণতা (Complete communication) ঃ** ফলাবর্তন যোগাযোগ পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। কেননা, এর মাধ্যমে বার্তা-প্রেরক তার প্রেরিত বার্তা-সম্পর্কে প্রাপকের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে।

**২। বার্তার প্রত্যক্ষণ অনুধাবন (Estimate receivers motive) ঃ** বার্তাপ্রেরকের প্রেরিত বার্তা বা সংবাদটি প্রাপকের নিকট কীভাবে প্রত্যক্ষিত হয়েছে তা ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝা যায়।

**৩। পরিস্থিতির সার্বিক হৃদয়ঙ্গম (Understand total situation) ঃ** ফলাবর্তন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপক তার অনুভূতি প্রেরকের নিকট প্রকাশ করে থাকে। এতে প্রেরকের পক্ষে পরিস্থিতির সার্বিক হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হয়।

**৪। ভাব বিনিময় (Exchange concetp) ঃ** ফলাবর্তন যোগাযোগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষসমূহের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেয়।

**৫। সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ (Taking proper action) ঃ** প্রাপক সংবাদের উত্তরে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দ্বারা তার মতামত প্রেরককে জানালে প্রেরক তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

**৬। সফলতা সম্পর্কে ধারণা (Estimate about success) ঃ** ফলাবর্তন ব্যবস্থা সংবাদ প্রেরককে যোগাযোগের সফলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম।

**৭। মাধ্যমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন (Evaluation effectiveness) ঃ** ফলাবর্তন সংবাদ বা তথ্য প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও পরিমাপ করতে সহায়তা করে।

**৮। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি (Create democratic ervironment) ঃ** ফলাবর্তন ব্যবস্থায় বার্তা-প্রেরক ও বার্তাপ্রাপক নিজ নিজ মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা যোগাযোগের সফলতার জন্য অপরিহার্য।

**৯। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Prompt decision making) ঃ** আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন তথ্যাদির বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে।

**১০। সঠিক লক্ষ্যার্জন (Achieve right goal) ঃ** ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুল যোগাযোগকে শুদ্ধ করা যায়। এতে বার্তাপ্রেরক ও বার্তা-গ্রাহক সঠিক লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সফল ও পরিপূর্ণ যোগাযোগের জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য। প্রেরক কর্তৃক প্রাপকের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা তথ্য তখনই ফলপ্রসু হয় যখন প্রাপক প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার প্রতিক্রিয়া প্রেরককে অবহিত করে। সুতরাং, ফলাবর্তন ব্যতীত কার্যকর যোগাযোগ সম্পাদিত হতে পারে না।

## অনুশীলনী-৬

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগ মডেল কী?** [বাকাশিবো-২০০৬, ১০, পরি-২০১১]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ মডেল হচ্ছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রৈখিক বা চিত্রগত উপস্থাপন। এতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলোকে নকশা করে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

**২। যোগাযোগ মডেলে কী সংবাদ বা তথ্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা থাকে?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ মডেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে শুধু চিত্রায়িত করা হয়, সংবাদ বা তথ্যের পূর্ণ বিবরণ বা তথ্য এতে থাকে না।

**৩। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ ৩টি, যথা–

১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দান;

২। গবেষণা কার্যে সহায়তা এবং

৩। যোগাযোগ বিষয়ক পূর্বাভাস প্রদান।

**৪। ফলাবর্তনের ইংরেজি "Feedback" শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?**

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তনের ইংরেজি 'Feedback' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহারের জন্য ফেরত পাঠানো।

**৫। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৮, ১২]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন বলতে বার্তা প্রেরকের নিকট হতে প্রেরিত সংবাদ বা তথ্য বার্তাপ্রাপকের প্রতি-উত্তরসহ পুনরায় বার্তা প্রেরকের নিকট ফিরে আসাকে বুঝায়।

**৬। ফলাবর্তন সাধারণত কয় ধরনের হয় এবং কী কী?**

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তন সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা–

১। অন্তঃব্যক্তিক (Intrapersonal) এবং

২। আন্তঃব্যক্তিক (Interpersonal)।

**৭। ফলাবর্তন কীভাবে যোগাযোগের পরিপূর্ণতা দান করে?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তন প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক তার প্রেরিত বার্তা সম্পর্কে প্রাপকের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে। ফলে যোগাযোগের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।

**৮। উত্তম যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে বা যোগাযোগের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন করতে হলে কতকগুলো শর্ত পালন করতে হয়, এসব গুণাবলি সম্মিলিত যোগাযোগকে উত্তম যোগাযোগ বলে।

**৯। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কী জানা যায়?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রাপকের মনোভাব জানা যায়।

**১০। ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রেরক কী জানতে পারে?**

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রেরক গ্রাহকের মতামত জানতে পারে।

**১১। ফলাবর্তন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে সহায়তা করে?**

**উত্তর** সঠিক ফলাবর্তন ব্যবস্থাপনা দ্বারা বার্তা প্রেরক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

**১২। যোগাযোগ মডেলে কি তথ্যের পূর্ণ বিবরণ থাকে?**

**উত্তর** যোগাযোগ মডেলে তথ্যের পূর্ণ বিবরণ থাকে না। এতে শুধু মাত্র যোগাযোগ প্রক্রিয়া চিত্রায়ন করা হয়।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগ মডেল কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নকশা বা রৈখিক উপস্থাপনকে যোগাযোগ মডেল বলে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগকারী বা সংবাদ প্রেরক, সংবাদ বা তথ্য, প্রেরণ মাধ্যম বা চ্যানেল যোগাযোগ গ্রহীতা বা সংবাদ প্রাপক ইত্যাদি অনেকগুলো উপাদান জড়িত থাকে। এ উপাদানগুলো যখন নকশাকারে রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে যোগাযোগ মডেল বলা হয়ে থাকে।

**২। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজগুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৫]

**অথবা, যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর** যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজগুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। যোগাযোগ মডেল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে।

২। এটি যোগাযোগ বিষয়ক গবেষণা কাজে গবেষককে সহায়তা করে।

৩। যোগাযোগ মডেল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সফলতা বা বিফলতা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করে।

**৩। ফলাবর্তন (Feedback) বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০১, ০৪, ০৫, ০৭, পরি-২০১০, ১১]

**অথবা, ফলাবর্তন কাকে বলে?**

**উত্তর** ফলাবর্তন বলতে বার্তা প্রেরকের নিকট হতে প্রেরিত সংবাদ বা তথ্য বার্তা প্রাপকের প্রতি-উত্তরসহ পুনরায় বার্তা প্রেরকের নিকট ফিরে আসাকে বুঝায়। এটি মূলত দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি কৌশল। এর মাধ্যমে বার্তা প্রাপক তার মনের প্রতিক্রিয়া প্রেরককে অবহিত করে থাকে। বার্তাপ্রাপক সংবাদ বা তথ্য গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিক্রিয়া যখন প্রেরকের নিকট বার্তারূপে পাঠান তখন তাকে ফলাবর্তন বলে। ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাপ্রাপক উভয়েই সংবাদ বা তথ্যাদির বিনিময় করে থাকেন।

**৪। চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দেখাও।** [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর** নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দেখানো হল ঃ

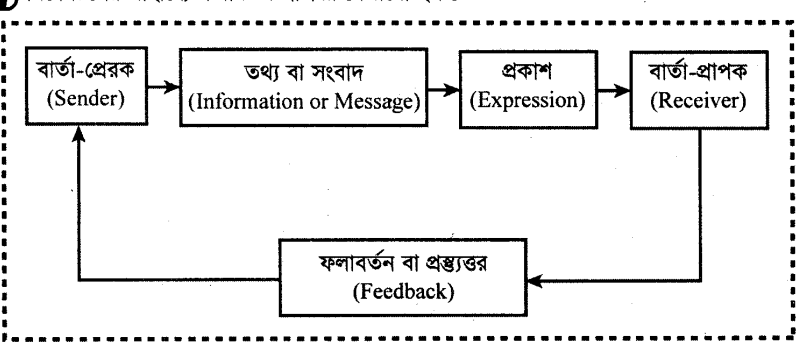

**৫। কার্যকর ফলাবর্তনের উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ কী?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর** কার্যকর ফলাবর্তনের উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ নিম্নরূপ–

১। বর্ণনাত্মকতার নীতি
২। সুনির্দিষ্টতার নীতি
৩। প্রার্থিতার নীতি
৪। সুস্পষ্টতার নীতি
৫। অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারের নীতি
৬। দ্রুত প্রেরণের নীতি
৭। যুক্তিযুক্ততার নীতি
৮। সংক্ষিপ্ততার নীতি
৯। আন্তরিকতার নীতি
১০। সম্পূর্ণতার নীতি।

**৬। যোগাযোগের আধুনিক মডেলটির চিত্র দেখাও।** [বাকাশিবো-২০১০, ১১]

**উত্তর**

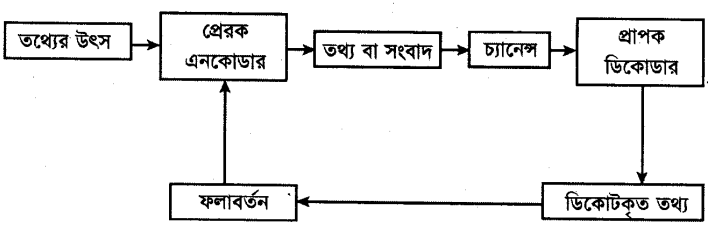


## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। যোগাযোগ মডেলের সংজ্ঞা দাও। এর মৌলিক কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৬.১ ও ৬.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। ফলাবর্তনের সংজ্ঞা দাও। তুমি কী মনে কর সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য?
অথবা, "পরিপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য – ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** ৬.৩ ও ৬.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ফলাবর্তন কী? চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। কার্যকর ফলাবর্তনের নীতিমালা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** ৬.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

********

# অধ্যায়-৭

# যোগাযোগের প্রকারভেদ
# (Types of Communication)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৭.০ সূচনা; ৭.১ যোগাযোগের প্রকারভেদ; ৭.২ উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ও নিম্নগামী যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য; ৭.৩ দ্বি-মুখী যোগাযোগ'-এর অর্থ ও সংজ্ঞা; ৭.৪ দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ; ৭.৫ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা; ৭.৬ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ; ৭.৭ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পার্থক্য*

## ৭.০ সূচনা (Introduction) ঃ

একটি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ সম্বন্ধেও ধারণা থাকা প্রয়োজন। যোগাযোগ বিভিন্ন ধরনের বা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা আকার-আকৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্য-প্রকৃতি প্রভৃতি অনুসারে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য বা বার্তার গমনাগমন পথ দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত, আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ কিংবা মুক্ত যে কোন রকম হতে পারে। যোগাযোগের বার্তার এই গমনাগমন পথ বা বার্তা প্রবাহের উপর ভিত্তি করে যোগাযোগ প্রক্রিয়া নিম্নগামী, উর্ধ্বগামী, সমান্তরাল, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইত্যাদি যে কোন ধরনের হতে পারে। অত্র অধ্যায়ে যোগাযোগের বিভিন্ন ধরন বা প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## ৭.১ যোগাযোগের প্রকারভেদ (Different Types of Communication) ঃ

কারবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, আয়তন,কার্য-প্রকৃতি প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। চিত্রে [চিত্র ঃ ৭.১] যোগাযোগের প্রকারভেদ বা বিভিন্ন প্যাটার্ন দেখানো হলো ঃ

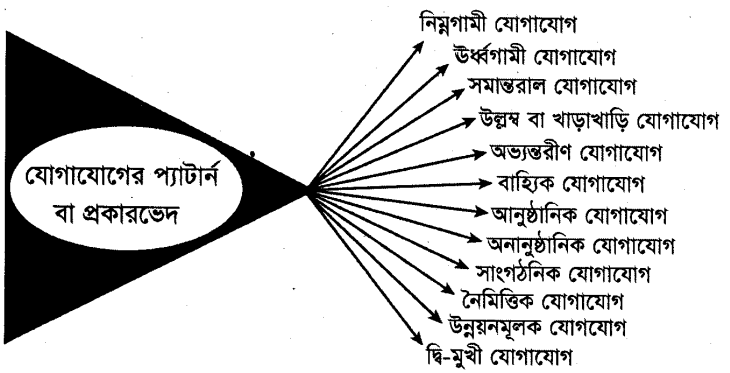


চিত্র ঃ ৭.১ যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন

নিম্নে যোগাযোগের বিভিন্ন ধরন বা প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

**১। নিম্নগামী যোগাযোগ (Downward communication) ঃ** যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংবাদ বা তথ্যাদি উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিম্নগামী বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপক বা পরিচালকদের নিকট হতে বিভিন্ন নির্দেশ, কর্মসূচি বা চিঠিপত্র অধীনস্থদের নিকট প্রেরিত হয়। নিম্নগামী যোগাযোগে বার্তাপ্রেরক বার্তাপ্রাপকের উপরে অবস্থান করে। পার্শ্বে [চিত্রঃ ৭.২] রেখা চিত্রের সাহায্যে নিম্নগামী যোগাযোগ দেখানো হল।

চিত্র ঃ ৭.২ নিম্নগামী যোগাযোগ

**২। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ (Upward communication) ঃ** সংগঠন কাঠামোর নিচের স্তর হতে যোগাযোগ উপরের স্তরে প্রবাহিত হলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে। এ প্রকার যোগাযোগ কাঠামোতে প্রেরক প্রাপকের নিচে অবস্থান করে। এরূপ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অধীনস্থ কর্মীরা তাদের রিপোর্ট, প্রস্তাব, অভাব, অভিযোগ, বাস্তব সমস্যাদি এবং সম্ভাব্য সমাধান, ইত্যাদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করে। পার্শ্বে রেখা চিত্রের [চিত্রঃ ৭.৩] সাহায্যে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ দেখানো হল।

চিত্র ঃ ৭.৩ উর্ধ্বগামী যোগাযোগ

**৩। সমান্তরাল যোগাযোগ (Parallel communication) ঃ** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত একই পদমর্যাদা সম্পন্ন বা একই পদে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে। যেমন– উৎপাদন বিভাগ ও ক্রয় বিভাগের মধ্যে স্থাপিত যোগাযোগ।

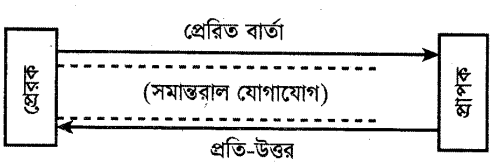


চিত্র ঃ ৭.৪ সমান্তরাল যোগাযোগ

**৪। উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ (Horizontal communication) ঃ** দু'জন পৃথক পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে যোগাযোগ সংগঠিত হয় তাকে লম্বিক বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ বলে। তবে এক্ষেত্রে একজনের পদমর্যাদা আরেকজনের চেয়ে উচ্চমানের হয়। নিচের চিত্রের [চিত্র ঃ ৭.৫] সাহায্যে লম্বিক যোগাযোগ দেখানো হল ঃ

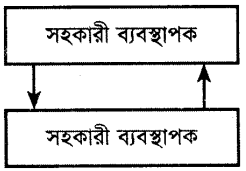


চিত্র ঃ ৭.৫ খাড়াখাড়ি যোগাযোগ

**৫। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ (Internal communication) ঃ** একই প্রতিষ্ঠানের চাকুরিরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগ সমান্তরাল, লম্ব, ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী হতে পারে।

**৬। বাহ্যিক যোগাযোগ (External communication) ঃ** প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা পক্ষের সঙ্গে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে। একটি প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা পক্ষ, যেমন– দেনাদার, গ্রাহক, ব্যাংকার, বীমা কোম্পানি, শেয়ারহোল্ডার, পরিবহণ সংস্থা প্রভৃতির সাথে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

**৭। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Formal communication) ঃ** কোন প্রতিষ্ঠানের যে কোন তথ্য বা বার্তা যদি অফিসিয়াল কায়দা বা রীতিনীতি অনুযায়ী বিনিময় হয়, তবে তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। এ রকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের নীতি, পলিসি, কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। নিম্নগামী, ঊর্ধ্বগামী, সমান্তরাল ও লম্বিক যোগাযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংঘটিত হতে পারে।

**৮। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal communication) ঃ** যে সমস্ত যোগাযোগে কোন অফিসিয়াল রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় না অর্থাৎ বার্তা বা সংবাদ প্রেরণে কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় না, তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। সাধারণত খাওয়ার টেবিলে, খেলার মাঠে বা চলার পথে এ ধরনের যোগাযোগ সংগঠিত হয়ে থাকে।

**৯। সাংগঠনিক যোগাযোগ (Structural communication) ঃ** কারবার সংগঠন বা সংস্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে সাংগঠনিক যোগাযোগ বলে। এ রকম যোগাযোগ আইনগত দলিলপত্র, কাঠামোগত চিত্র নির্ধারণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পলিসি প্রণয়ন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

**১০। নৈমিত্তিক বা রুটিন যোগাযোগ (Routine communication) ঃ** প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে সমস্ত তথ্য বা বার্তার আদান-প্রদান করা হয়, তাকে রুটিন যোগাযোগ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যের নির্দেশাবলি প্রদান, টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি রুটিন যোগাযোগের মধ্যে পড়ে।

**১১। বিশেষায়িত বিভাগীয় যোগাযোগ (Specialized departmental communication) ঃ** একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর বিশেষায়িত বিভাগসমূহের যে সমস্ত তথ্যের আদান-প্রদান হয়, তাকে বিশেষায়িত বিভাগীয় যোগাযোগ বলে। যেমন– হিসাব বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ ইত্যাদি বিভাগসমূহের মধ্যে রিপোর্ট, স্মারকলিপি ও চিঠিপত্রের যে আদান-প্রদান হয় তাকে বিশেষায়িত বা বিশেষ বিভাগীয় যোগাযোগ বলে।

**১২। উন্নয়নমূলক যোগাযোগ (Communication of development) ঃ** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন, সুনাম বৃদ্ধি, গণসংযোগ উন্নত করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত,বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে উন্নয়নমূলক যোগাযোগ বলে।

**১৩। দ্বি-মুখী যোগাযোগ (Two-way communication) ঃ** প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ নীতি ইত্যাদি যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধস্তনদের নিকট পৌঁছানো এবং অধস্তনদের নিকট হতে এর প্রতি উত্তর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরিত হয় তাকে দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলে। মূলত এটা ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী যোগাযোগের একটি সমন্বিত কৌশল বা রূপ।

## ৭.২ উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ও নিম্নগামী যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Upward Communication & Downward Communication) ঃ

নিম্নগামী যোগাযোগ এবং উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের এ পদ্ধতি দুটো একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রক্রিয়া ও প্রকৃতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে নিম্নগামী যোগাযোগ ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

| পার্থক্যের ক্ষেত্র | উর্ধ্বগামী যোগাযোগ | নিম্নগামী যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর উচ্চস্তর হতে যখন কোন তথ্য বা সংবাদ নিম্নস্তরে প্রেরিত হয়, তখন তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলে। | সংগঠন কাঠামোর নিম্নস্তর হতে যখন কোন তথ্য বা সংবাদ উচ্চস্তরে ধাবিত হয়, তখন তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলা হয়। |
| ২। প্রকৃতি | নিম্নগামী যোগাযোগ সর্বদাই নির্দেশ-সূচক। এর মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরকে অবহিত করে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করে। | উর্ধ্বগামী যোগযোগ কার্যত পরামর্শমূলক। এর মাধ্যমে অধস্তন কর্মচারীরা তাদের অভাব-অভিযোগ বা সুপারিশ ইত্যাদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করে। |
| ৩। গতি | নিম্নগামী যোগাযোগে বার্তা উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। তাই এর গতি স্বাভাবিক। | উর্ধ্বগামী যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তা নিচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। তাই এর গতি স্বাভাবিক নয়, বিপরীতমুখী। |
| ৪। ব্যবহার | প্রতিষ্ঠানে নিম্নগামী যোগাযোগই বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। কেননা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ নিম্নস্তরে প্রেরণ করতে হয়। | উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম দেখা যায়। |
| ৫। কর্তৃত্ব হস্তান্তর | নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা যায়। | উর্ধ্বগামী যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের প্রশ্নই ওঠে না। |
| ৬। উদ্যোগ | নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন উপরস্থ কর্মকর্তা। | উর্ধ্বগামী যোগাযোগের তথ্য প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন নিম্নপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। |
| ৭। উদ্দেশ্য | নিম্নগামী যোগাযোগের উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের জানানো। | উর্ধ্বগামী যোগাযোগের উদ্দেশ্য হল কর্মীদের বক্তিগত চাহিদা ও অসুবিধাসমূহ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া। |



## ৭.৩ 'দ্বি-মুখী যোগাযোগ'-এর অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning & Definition of 'Two-way Communication')

'দ্বি-মুখী যোগাযোগ' কথাটির দ্বারা যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রবাহকে বুঝিয়ে থাকে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তাপ্রেরক কোন সংবাদ বা তথ্য বার্তাগ্রাহকের নিকট পাঠায়, বার্তাগ্রাহক তা পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া অর্থবোধক প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে প্রেরককে জানায়। একেই দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলা হয়। মূলত তা ফলাবর্তন (Feedback) প্রক্রিয়ারই নামান্তর। দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সংবাদ বা তথ্যাদির আদান-প্রদান ঘটে। বস্তুত এটি যোগাযোগের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে যোগাযোগের উভয় পক্ষকে অর্থাৎ বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহককে সংযুক্ত করে যোগাযোগ প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনেকে দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগের সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কোন সংবাদ, তথ্য, নির্দেশ, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি অধস্তন কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করেন এবং সংবাদ প্রাপক অর্থাৎ অধস্তন কর্মচারীগণ উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত সংবাদ বা তথ্যের প্রতিক্রিয়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ব্যক্ত করে। এভাবে যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রবাহ সংঘটিত হয় এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে দ্বি-মুখী যোগাযোগ উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ই সংঘটিত হয় না, সমান্তরাল যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ও তা সংঘটিত হতে পারে। এখানে চিত্রের মাধ্যমে দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রবাহ দেখানো হল ঃ

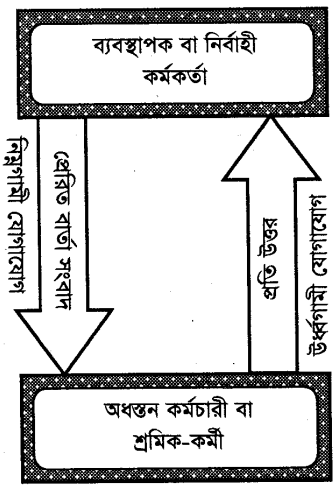


চিত্র ঃ ৭.৬ (ক) দ্বি-মুখী যোগাযোগ

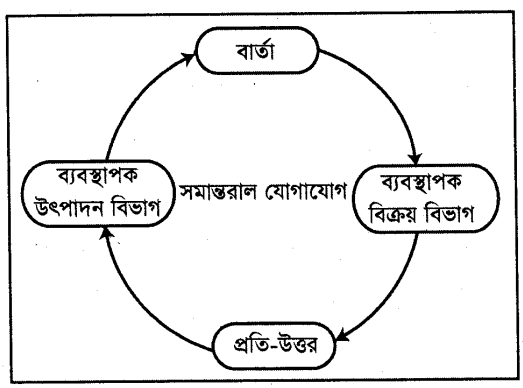


চিত্র ঃ ৭.৭ (খ) দ্বি-মুখী যোগাযোগ

মোট কথা, দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একদিকে বার্তাপ্রেরক তার সংবাদ বা তথ্য বার্তাগ্রাহকের নিকট প্রেরণ করে এবং অপরদিকে প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে বার্তাগ্রাহক তার প্রতিক্রিয়া বার্তা প্রেরককে জানায়। যোগাযোগের বার্তা এভাবে সংগঠন কাঠামোর উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তরে এবং নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে অথবা সমান্তরালভাবে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে অবাধে প্রবাহিত হলেই যোগাযোগের সফলতা আসে। দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে তাই পরিপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

## ৭.৪ দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of Two-way Communication) ঃ

### ৭.৪.১ সুবিধাসমূহ (Advantages) ঃ

দ্বি-মুখী যোগাযোগ একটি পরিপূর্ণ ও কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি। অন্য যে কোন প্রকার যোগাযোগের চেয়ে এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অধিক সুবিধা ভোগ করা যায়। দ্বি-মুখী যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

**১। তথ্যের সাবলীল গতি (Smooth motion of information) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক তার সংবাদ বা তথ্য বার্তাগ্রাহকের নিকট প্রেরণের পর প্রত্যুত্তরের আকারে তা বার্তাগ্রাহকের নিকট থেকে বার্তা প্রেরকের নিকট ফিরে আসে। ফলে যোগাযোগের তথ্য প্রবাহের সাবলীলতা বজায় থাকে এবং যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

**২। তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা (Assurance of receiving information) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থায় বার্তাপ্রেরক তথ্য বা সংবাদ বার্তাগ্রাহকের নিকট পাঠানোর পর গ্রাহক তার প্রতিক্রিয়া ফলাবর্তনের মাধ্যমে জানায়। এতে বার্তাপ্রেরক তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করে।

**৩। নির্দেশ কার্যকরীকরণ (Make command effective) ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী প্রবাহ বিদ্যমান থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রেরিত আদেশ-নির্দেশ কার্যকরীকরণ সহজ হয়। প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মচারীগণ নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ ভালভাবে বুঝতে না পারলে যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রক্রিয়ার দ্বারা উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট থেকে তা বুঝে নিয়ে নির্দেশকে সহজে কার্যকর করতে পারে।

**৪। পরামর্শ প্রদানে উৎসাহিতকরণ (Encourage to advice) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অস্তন কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ থাকে। ফলে অধস্তন কর্মীরা নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে উৎসাহ বোধ করে।

**৫। কার্য-সন্তুষ্টি বৃদ্ধি (Increase satisfaction from work) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেমন প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অধস্তন কর্মীদেরকে অবহিত করেন, অধস্তন কর্মচারীরাও তেমনি তাদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। এতে কর্মীদের হতাশা দূর হয় এবং কার্যসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

**৬। গ্রাহকের প্রতিক্রিয়ায় উপলব্ধি (Realize reaction of client) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বার্তাপ্রেরক অতি দ্রুত গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া জেনে নিয়ে যোগাযোগের ফলাফল পরিমাপ করতে পারে। ফলে যোগাযোগে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলে তার পক্ষে দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

**৭। উন্নত সম্পর্ক স্থাপন (Establish good relation) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কেননা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী প্রবাহ বিদ্যমান থাকলে বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকদের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান ঘটে এবং উভয় পক্ষই পরস্পরকে বুঝতে পারে। ফলে তাদের মধ্যে উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

**৮। কার্যকর প্রণোদনা ও শিল্প সম্পর্ক (Effective motivation & industrial relation) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ কর্মীদেরকে প্রণোদনা দান করে উন্নত শিল্পসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এতে প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কার্যপরিবেশ বজায় থাকে এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

যোগাযোগ প্রকাশন

**৯। বিষয়বস্তুর বাস্তবায়ন (Done subject matter) ঃ** যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রবাহের দ্বারা এর বিষয়বস্তুর সহজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। কারণ দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বার্তাসমূহ কার্যে রূপায়িত হল কিনা তা সহজেই বুঝা যায়।

**১০। দ্রুত কার্য সম্পাদন (Promt function doing) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকলে অধস্তন কর্মীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রেরিত নির্দেশ, কর্মসূচি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা যায়।

**১১। যোগাযোগের সফলতা (Success in communication) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক ও প্রাপক দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের নিজ নিজ অনুভূতি পরস্পরের নিকট তুলে ধরতে পারে যা যোগাযোগের সফলতা নিশ্চিত করে।

## ৭.৪.২ অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ (Disadvantages or Limitations) ঃ

দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুবিধ সুবিধা থাকলেও এর কতকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে দ্বি-মুখী যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ বর্ণিত হল ঃ

**১। ধীরগতিসম্পন্ন ও ব্যয়বহুল (Slow & expensive) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংবাদ বা তথ্যাদি বার্তাপ্রেরকের নিকট থেকে গ্রাহকের নিকট প্রেরণের পর প্রেরিত তথ্যের প্রত্যুত্তর পুনরায় বার্তাপ্রেরকের নিকট ফিরে আসতে অনেক সময় লাগে। ফলে যোগাযোগের গতিময়তা নষ্ট হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

**২। প্রেরকের ব্যক্তিত্বে আঘাত (Hit personality of sender) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ অনেক সময় যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরকের ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে। কারণ এ ব্যবস্থায় বার্তাপ্রাপক বা যোগাযোগ গ্রহীতা তথ্যের ভুল-ত্রুটি সরাসরি প্রেরকের সামনে তুলে ধরে তার বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ইত্যাদির সমালোচনা করে। এতে যোগাযোগের প্রতি সে অনীহা প্রকাশ করতে পারে।

**৩। একজনের কাজে অন্যজনের হস্তক্ষেপ (Dominate one person to another) ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী প্রবাহের কারণে অনেক সময় একে অন্যের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। ফলে কার্যক্ষেত্রে বিরক্তিকর ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

**৪। অবাধ্যতার মনোভাব সৃষ্টি (Create insubordination) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মীদের মধ্যে অবাধ্যতার (Insubordination) মনোভাব সৃষ্টি করে। ফলে কর্মীরা ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

**৫। জ্ঞান বা ধারণাগত অমিল (Cognitive dissonance) ঃ** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরকের মূল্যবোধ এবং যোগাযোগগ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপকের মূল্যবোধের ভিন্নতার কারণে এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে জ্ঞান বা ধারণাগত অনৈক্য (Cognitive dissonance) বা অমিল দেখা দিতে পারে। এই ধারণাগত অমিল যোগাযোগের কার্যকারিতা হ্রাস করে।

**৬। তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা (Wrong explanation) ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রেরিত সংবাদ বা তথ্যের ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে, যা যোগাযোগের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে।

**৭। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর বাস্তবায়নে জটিলতা (Complexity in important matter) ঃ** অনেক সময় দ্বি-মুখী যোগাযোগে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়। মূলত নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যের গতি মন্থর হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

## ৭.৫ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা (Define formal & informal Communication) ঃ

### ৭.৫.১ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Formal Communication) ঃ

পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী বা অফিসিয়াল নিয়মকানুন মেনে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অনুসরণ করে কোন তথ্য বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা বিভাগসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে আদান-প্রদান করা হলে তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। এটা মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়ালী অনুমোদিত তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তথ্যাদি বিনিময়কালে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে এরূপ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

চিত্রে (চিত্র ঃ ৭.৮) সংগঠন চার্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল দেখানো হল ঃ

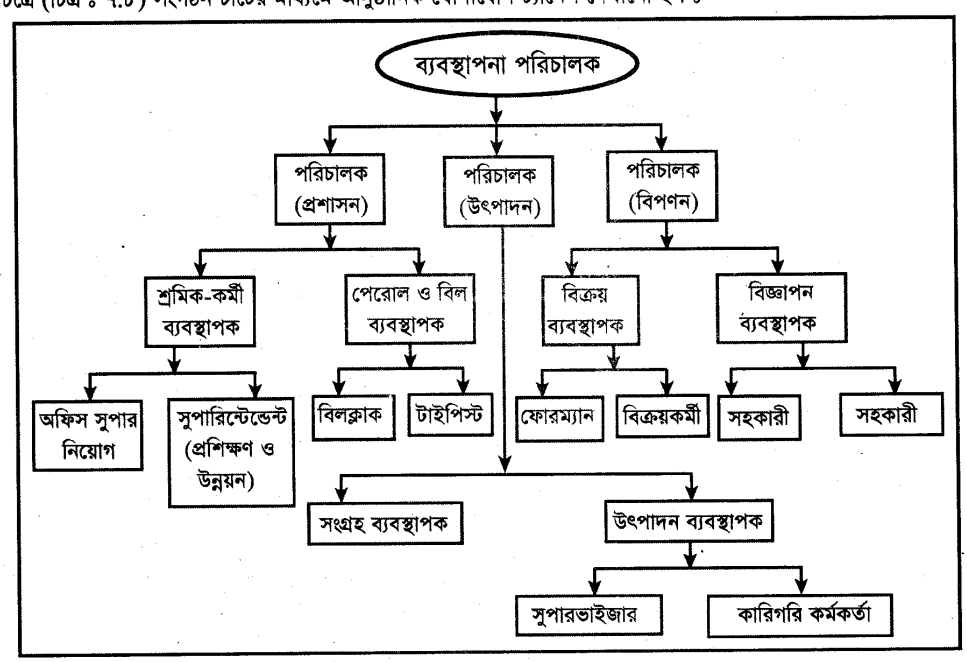


চিত্র ঃ ৭.৮ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ তথ্যাদি বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এরূপ যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার হতে পারে। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংগঠনের উদ্দেশ্যে, নীতি, পলিসি, কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য অধস্তন কর্মচারীদেরকে লিখিত আদেশ, নির্দেশ প্রদান করেন এবং কর্মচারীরাও তাদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, মতামত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নিকট পেশ করে। আবার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে লিখিত আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন পক্ষ, যেমন– ক্রেতা, বিক্রেতা, দেনাদার, পাওনাদার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তথ্যাদির বিনিময় হয়।

### ৭.৫.২ অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal Communication) ঃ

যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যাদির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতা বা অফিসিয়াল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় না, তাকে অনানুষ্ঠানিক বা অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এ যোগাযোগ কার্যক্রম অফিসিয়ালী অনুমোদিত নয় এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে তা করা হয় না। কোন প্রাতিষ্ঠানিক কায়দা বা নিয়ম-কানুন ছাড়াই কোন ব্যক্তি যে কোন সময় অন্য কোন ব্যক্তির সাথে এ প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বস্তুত নানা প্রকার সামাজিক নিয়ম-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সাধারণত খেলার মাঠে, ভ্রমণকালে, খাওয়ার টেবিলে, একসাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করার সময়, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- অফিস থেকে ফেরার পথে দু'জন কর্মচারী গাড়িতে বসে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই প্রাতিষ্ঠানিক কোন বিষয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভাব বা তথ্যাদির বিনিময় করতে পারেন।

কারবারি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বাস্তবায়নে সহায়ক। তবে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি অনুসরণের জন্য বাধ্যবাধকতা না থাকায় এতে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।

## ৭.৬ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of formal & informal Communication) ঃ

### ৭.৬.১ অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ (Advantages of formal communication) ঃ

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ এখানে আলোচনা করা হল ঃ

**১। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা (Easy communication) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ একটি সহজ যোগাযোগ পদ্ধতি। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অধস্তন কর্মচারীদেরকে নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে আদেশ-নির্দেশ প্রেরণ করতে পারেন এবং কর্মচারীরাও তাদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, মতামত ইত্যাদি উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মাধ্যমে সহজেই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট পেশ করতে পারে।

**২। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase organisational efficiency) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কায়দায় যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে করা হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

**৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাবলি ও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি সুষ্ঠু ও নিশ্চিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। এর ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই সুষ্ঠু ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

**৪। দ্রুত কার্যসম্পাদন (Promt done activities) ঃ** নিম্নগামী আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সরাসরি ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরকে সরবরাহ করে দ্রুত কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে।

**৫। সমন্বয় সাধন (Co-ordination) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ নিম্নগামী, উর্ধ্বগামী ও সমান্তরালভাবে হতে পারে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন সহজতর হয়।

**৬। স্থায়ী রেকর্ড (Fixed record) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিতভাবে হয়ে থাকে এবং যোগাযোগ লিপিগুলো সর্বদাই নথিবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে প্রয়োজনের সময় সহজেই তা খুঁজে বের করা যায়।

**৭। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের রূপরেখা নির্দেশ (Fixup the area of duties & responsibilities) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট রূপরেখা নির্দেশ করে। ফলে প্রত্যেকেই যার যার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

৮। **শৃঙ্খলা রক্ষা (Establish system) ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও বজায় রাখতে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সহায়তা করে। কারণ এতে প্রত্যেক কর্মী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে বলে সবাই নিজ নিজ কাজের প্রতি যত্নবান হয়। ফলে প্রতিটি কাজকর্মে শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

৯। **ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কম (Possibility of few error) ঃ** প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয় বলে এতে ভুল- ত্রুটির সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

১০। **নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি (Increase dependability) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, কৌশল, কর্মসূচি ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠনের সকল স্তরে প্রেরণ করা হলে তা অধিক কার্যকরী হয়।

## ৭.৬.২ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Formal Communication) ঃ

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও এর কতকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **কর্তৃত্বধর্মী যোগাযোগ পদ্ধতি (Autocratic process of communication) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মূলত কর্তৃত্বধর্মী যোগাযোগ পদ্ধতি। এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণই সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের নিকট বার্তা প্রেরণ করে থাকে, যা অনেকাংশে প্রভুত্বমূলক কর্তৃত্বের জন্ম দেয়।

২। **অনমনীয়তা (Lack of flexibility) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ অনমনীয় প্রকৃতির। কেউ ইচ্ছা করলেই এতে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। এমনকি প্রয়োজনের সময়ও এতে পরিবর্তন আনয়ন কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠিন্য বৃদ্ধি পায় এবং উদ্দেশ্য অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩। **আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল (Formal & expensive) ঃ** এ প্রকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হয় বলে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, বিবিধ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক খরচও বৃদ্ধি পায়।

৪। **সময়ের অপচয় (Waste time) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের কঠোর নিয়মনীতি ও আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজাল পেরিয়ে যোগাযোগের তথ্য উদ্দীষ্ট স্থানে পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় লাগে। এতে একদিকে সময়ের অপচয় হয় এবং অন্যদিকে নির্বাহীদের কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

৫। **আন্তরিকতার অভাব (Lack of sincere) ঃ** এরূপ যোগাযোগ আন্তরিকতা বিবর্জিত। প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মকানুন ও রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হয় বলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬। **ব্যক্তিগত উদ্যম বিনষ্ট (Loss personal initiative) ঃ** নির্ধারিত পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কার্য সম্পাদিত হয় বলে এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে কিছু করতে পারে না। এতে কর্মীদের উদ্যম বিনষ্ট হয়।

## ৭.৬.৩ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ (Advantages of Informal Communication) ঃ

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংবাদ, তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানে কতিপয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এখানে এর সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (Easy explanation) ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত কোন তথ্য কর্মীদের নিকট বোধগম্য না হলে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের দ্বারা সহজেই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

২। **আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বিকল্প (Alternative of formal commumication) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থাপনা কোন সংবাদ বা তথ্য কর্মীদের নিকট আদান-প্রদানে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সংবাদ বা তথ্য আদান-প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৩। **বার্তার দ্রুত প্রচার (Promt publishing) ঃ** এ প্রক্রিয়ায় বার্তা বা সাংবাদাদি আদান-প্রদানে কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে বার্তার দ্রুত প্রচার সম্ভব হয়।

৪। **অভাব-অভিযোগ পেশ (Submit complain) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মীরা তাদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি অতি সহজে মৌখিকভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়।

৫। **কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase efficiency in work) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ খোলামেলাভাবে যে কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। এতে কার্য সম্পাদন সহজতর হয় এবং কার্যদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

**৬। সহযোগিতা ও সমন্বয় (Co-operate & co-ordination) ঃ** এ ব্যবস্থায় সহজেই কর্মীরা তাদের আবেগ, অনুভূতি, মতামত ইত্যাদির পারস্পরিক বিনিময় করতে পারে। এতে কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন সহজতর হয়।

**৭। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন (Develop employee & employer relationship) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনার মধ্যে সৃষ্ট যে কোন বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝি সহজেই নিরসন করা যায়। ফলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

**৮। যোগাযোগের নমনীয়তা (Flexibility in communication) ঃ** এরূপ যোগাযোগ প্রচলিত নিয়মকানুন অনুসরণের কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না বলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

## ৭.৬.৪ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Informal Communication) ঃ

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। এর প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

**১। তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা (Possibility in meaning change) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রায়শই যোগাযোগের বিষয়বস্তু বা তথ্যে বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ফলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

**২। গুজবের জন্ম (Create rumour) ঃ** এরূপ যোগাযোগ অনেক সময় মিথ্যা ও গুজবের জন্ম দেয় এবং তা দ্রুত ছড়াতে সাহায্যে করে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

**৩। তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস (Lack of secrecy) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে পারস্পরিক খোলামেলা আলোচনার জন্য তথ্যের গোপনীয়তা নষ্ট হয়।

**৪। ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি (Mis-understanding) ঃ** এরূপ যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না বলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

**৫। কষ্টসাধ্য নিয়ন্ত্রণ (Difficult in control) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় না বলে এটা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

**৬। সমঝোতা বিনষ্ট (Disarrangement) ঃ** এরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা একদিকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত হানে এবং অন্যদিকে কর্মীদের মধ্যে অবাধ্যতার সৃষ্টি করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি হয় যা পারস্পরিক সমাঝোতা বিনষ্ট করে।

**৭। অবাঞ্ছিত বিরোধ সৃষ্টি (Create discrimination) ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে অনেক সময় দলাদলি ও অবাঞ্ছিত বিরোধের সৃষ্টি করতে পারে।



## ৭.৭ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পার্থক্য (Distinction between Formal and Informal Communication) ঃ

আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ উভয়ই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে একটি অন্যটির বিপরীত। এখানে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের তুলনামূলক পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী বা অফিসিয়াল কায়দা-কানুন মেনে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। | যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যাদির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতা বা অফিসিয়াল নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় না তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। |
| ২। উৎপত্তি | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক হতে সৃষ্ট। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক হতে সৃষ্ট। |
| ৩। অফিসিয়াল স্বীকৃতি | অফিসের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন মেনে চলে বলে এটা অফিসিয়ালী স্বীকৃত। | অফিসিয়াল নিয়মকানুন ছাড়াই যোগাযোগ সম্পাদিত হয় বলে এটা অফিসিয়ালী স্বীকৃত নয়। |
| ৪। পদ্ধতি | এ যোগাযোগের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে। | এ যোগাযোগের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। |
| ৫। যোগাযোগের বিষয়বস্তু | প্রতিষ্ঠানের গুরত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন– পরিকল্পনা, কর্মসূচি, নীতিমালা ইত্যাদি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রেরণের জন্য আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হয়। | সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। |

| পার্থক্যের বিষয় | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ৬। ক্ষমতা | এ যোগাযোগে ক্ষমতার ব্যবহার সহজতর। | এ যোগাযোগে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। |
| ৭। কর্তৃত্ব অর্পণ | অধীনস্ত কর্মীর নিকট কর্তৃত্ব অর্পণে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ফলদায়ক। | কর্তৃত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের বাস্তব কার্যকারিতা নেই। |
| ৮। সমন্বয় সাধন | আন্তঃবিভাগীয় কাজে সমন্বয় সাধনে এ যোগাযোগ ব্যবহৃত হয়। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ সমন্বয় সাধনে ব্যবহৃত হয় না। |
| ৯। শৃঙ্খলা রক্ষা | এ যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কষ্টকর। |
| ১০। বাধ্যবাধকতা | প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ অনুসরণ করতে বাধ্য। | এ যোগাযোগে বাধ্যতামূলকভাবে কোন কিছু অনুসরণ করতে হয় না। অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে বাধ্যবাধকতা নেই। |
| ১১। তথ্য বিকৃতি | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা কম। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা বেশি। |
| ১২। গুজব ছড়ানো | এ যোগাযোগে গুজব ছড়ানোর সুযোগ কম। | এক্ষেত্রে গুজব ছড়ানোর সুযোগ বেশি থাকে। |
| ১৩। ভুলত্রুটি | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে। | এ যোগাযোগে ভুল-ত্রুটির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। |
| ১৪। স্থায়ী সূত্র | এ যোগাযোগ সাধারণত লিখিতভাবে হয়ে থাকে বলে স্থায়ী সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে কোন রেকর্ড থাকে না বলে ভবিষ্যৎ সূত্র হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য। |
| ১৫। সময় ও ব্যয় | সুনির্দিষ্ট পন্থায় লিখিত আকারে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় বলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। | এতে সময় ও ব্যয় খুব কম। |
| ১৬। ব্যক্তিগত | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ নেই। | অনানুষ্ঠানিক যোগযোগ ব্যক্তিগত পর্যায়ে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক। |
| ১৭। আন্তরিকতা | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে আন্তরিকতার ছোঁয়া কম। | এতে আন্তরিকতার প্রকাশও বৃদ্ধি পায়। |
| ১৮। প্রভুত্ব প্রদর্শন | এ যোগাযোগে প্রভুত্ব প্রদর্শনের সুযোগ বেশি। | এ যোগাযোগে প্রভুত্ব প্রদর্শনের সুযোগ কম। |
| ১৯। পরিবর্তনশীলতা | এতে পরিবর্তনশীলতা খুব কম। কেননা ঘন ঘন নিয়মনীতি পরিবর্তন করা যায় না। | এতে নিয়মনীতি যে কোন সময় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। |
| ২০। গোপনীতা রক্ষা | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে সংবাদ ও তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে সংবাদ ও তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। |
| ২১। তথ্যের সঠিক প্রেরণ | এ যোগাযোগের মাধ্যমে তথাদি সুষ্ঠু ও নিশ্চিতভাবে সঠিক ব্যক্তির নিকট সঠিক সময়ে পৌঁছে। | এ যোগাযোগে নিশ্চিতভাবে তা সম্ভব নয়। |
| ২২। ভুল বুঝাবুঝি | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে দায়িত্ব ও কর্তব্যের নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকায় এতে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির তেমন অবকাশ থাকে না। | এতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না বলে যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট পক্ষ-সমূহের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। |
| ২৩। কার্যকারিতা | আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বেশি। | অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের কার্যকারিতা কম। |

# অনুশীলনী-৭

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কী?**

**উত্তর** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংবাদ বা তথ্যাদি যখন সংগঠন কাঠামোর নিচের স্তর হতে উপরের স্তরে প্রবাহিত হয় তখন তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে অভিহিত করা হয়।

**২। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কেন প্রয়োজন?**

**উত্তর** প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পর্কিত রিপোর্ট, সমস্যা, প্রস্তাব, সুপারিশ, কর্মীদের অনুভূতি, অভাব-অভিযোগ, মতামত ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জানার জন্য উর্ধ্বগামী যোগাযোগের প্রয়োজন হয়।

**৩। সমান্তরাল যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৮, ১৩]

**উত্তর** সমান্তরাল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত একই পদমর্যাদাসম্পন্ন বা সমসাময়িক পদে অধিষ্ঠিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্থাপিত হয়।

**৪। নিম্নগামী যোগাযোগে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কী কী বিষয় নিয়ে অধস্তনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন?**

**উত্তর** নিম্নগামী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অধস্তনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন।

**৫। নিম্নগামী যোগাযোগে কেন কর্তৃত্ব ডিঙ্গানো যায় না?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** নিম্নগামী যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাংগঠনিক কাঠামোতে কর্তৃত্ব স্তরের সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকে বলে কর্তৃত্ব ডিঙ্গানো যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারি অন্য একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে ডিঙ্গিয়ে কোন তথ্য বা সংবাদাদি পরিবেশন করতে পারে না।

**৬। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৩(T), ১৪]

**উত্তর** নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন হাত ঘুরে ঘুরে কর্মীদের কাছে পৌছে। ফলে এক্ষেত্রে যোগাযোগের বার্তা যদি লিখিত না হয়, তাহলে তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

**৭। কোন্ ধরনের যোগাযোগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়?** [বাকাশিবো-২০০৬, ১২]

**উত্তর** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থায় বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহক নিজ নিজ মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় বলে এ ধরনের যোগাযোগে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

**৮। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের একই পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ হলে তাকে কী ধরনের যোগাযোগ বলে?**

**উত্তর** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের একই পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে।

**৯। সংবাদ বা তথ্যের দ্বি-মুখী প্রবাহ কোন ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয়?**

**উত্তর** সংবাদ বা তথ্যের দ্বি-মুখী প্রবাহ উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। তবে সমান্তরাল যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ও তা সংঘটিত হতে পারে।

**১০। বার্তাপ্রেরক বার্তাগ্রাহকের উপরে অবস্থান করলে কোন্ ধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর** বার্তাপ্রেরক বার্তাগ্রাহকের উপরে অবস্থান করলে নিম্নগামী যোগাযোগের সৃষ্টি হয়।

**১১। বার্তাপ্রেরক বার্তাগ্রাহকের নিচে অবস্থান করলে কোন ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়?**

**উত্তর** বার্তাপ্রেরক বার্তাগ্রাহকের নিচে অবস্থান করলে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

**১২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী যদি নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করে তবে কোন্ ধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর** উপ-সহকারী প্রকৌশলী যদি নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করে তবে উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সৃষ্টি হবে।

**১৩। কোন্ যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মীদেরকে কার্যসম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়?**

**উত্তর** নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মীদেরকে কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।

**১৪। নিম্নগামী যোগাযোগ নির্দেশ সূচক হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-১০, ১১]

**উত্তর** নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারিদেরকে অবহিত করে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করে বলে নিম্নগামী যোগাযোগকে নির্দেশ সূচক বলা হয়।

**১৫। উল্লম্ব যোগাযোগের সংজ্ঞা লিখ?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** যে ক্ষেত্রে যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতা উভয়পক্ষের মধ্যে একজনের পদমর্যাদা আরেকজনের চেয়ে উচ্চতর হয় সেক্ষেত্রেই উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

**১৬। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে সংঘটিত হয়?** [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর** প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

**১৭। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়?**

**উত্তর** প্রাতিষ্ঠানিক কায়দায় ও পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কার্য সম্পাদিত হয় বলে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

**১৮। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে না কেন?**

**উত্তর** প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয় বলে এতে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে না।

**১৯। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগকে স্বৈরাচারী বা প্রভুত্বব্যঞ্জক যোগাযোগ বলা হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬]

**উত্তর** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণই সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের নিকট বার্তা প্রেরণ করে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে তা অনুসরণ করতে হয়। তাই আনুষ্ঠানিক যোগাযোগকে স্বৈরাচারী বা প্রভুত্বব্যঞ্জক যোগাযোগ বলা হয়ে থাকে।

**২০। 'অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংবাদ বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব'- এ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সংবাদ বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

**২১। কোন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কীভাবে বার্তার দ্রুত প্রচার সম্ভব হয়?**

**উত্তর** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তা বা সংবাদাদি আদান-প্রদানে কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে বার্তার দ্রুত প্রচার সম্ভব হয়।

**২২। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যম বিনষ্ট করে– ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর** নির্ধারিত পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কার্য সম্পাদিত হয় বলে এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে কিছু করতে পারে না। এতে কর্মীদের উদ্যম বিনষ্ট হয়। তাই বলা হয় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যম বিনষ্ট করে।

**২৩। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়?**

**উত্তর** বার্তা প্রেরক বার্তা গ্রাহকের নিচে অবস্থান করলে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ প্রকার যোগাযোগ বার্তা প্রেরক গ্রাহকের নিচে অবস্থান করে।

**২৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ক্ষেত্রে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি লংঘন করতে পারে না কেন?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর ঃ** আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাঠামোতে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও তারা নিয়মনীতি লঙ্ঘন করতে পারে না।

**২৫। খোলা দরজা নীতি কী?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর ঃ** এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে কর্মী প্রয়োজনে উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে খোলাখুলি বা স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারে। একে খোলা দরজা নীতি বলে।

**২৬। কোন ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**২৭। কোন ধরনের যোগাযোগে অফিসিয়াল স্বীকৃতি নেই?**

**উত্তর ঃ** অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগে কোন অফিসের নিয়মকানুন মানা হয় না বিধায় অআনুষ্ঠানিক যোগাযোগের কোন অফিসিয়াল স্বীকৃতি নেই।

**২৮। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা কোন ধরনের যোগাযোগ বৃদ্ধি করে?**

**উত্তর ঃ** যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। ফলে এতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন কী কী?**

**উত্তর ঃ** প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, আয়তন, কার্য-প্রকৃতি প্রভৃতি অনুসারে যোগাযোগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্নগুলো নিম্নরূপ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। নিম্নগামী যোগাযোগ | ২। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ | ৩। সমান্তরাল যোগাযোগ |
| ৪। উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ | ৫। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ | ৬। বাহ্যিক যোগাযোগ |
| ৭। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ | ৮। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ | ৯। সাংগঠনিক যোগাযোগ |
| ১০। নৈমিত্তিক বা রুটিন যোগাযোগ | ১১। বিশেষায়িত যোগাযোগ | ১২। উন্নয়নমূলক যোগাযোগ। |

**২। নিম্নগামী যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর ঃ** যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংবাদ বা তথ্যাদি উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলে তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলা হয়। এরূপ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর উচ্চস্তর হতে সংবাদ বা তথ্য নিম্নস্তরে প্রেরিত হয়। এ যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারিদেরকে অবহিত করে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করে।

**। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** সংগঠন কাঠামোর নিম্নস্তর হতে যখন তথ্য বা সংবাদ উচ্চস্তরে ধাবিত হয়, তখন তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অধস্তন কর্মচারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। রবার্ট ক্রেটনার (Kreitner)-এর মতে, "Upward Communication refers to a process of systematically encouraging subordinates to share with management their feelings and ideas."

উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মাধ্যমে অধস্তন কর্মচারিরা সাধারণত তাদের অভাব-অভিযোগ, বাস্তব সমস্যা, প্রস্তাব, সুপারিশ, অনুভূতি ইত্যাদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে থাকে।

**৪। সমান্তরাল যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৭, পরি-১০, ১৪(T)]

**উত্তর ঃ** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত একই পদমর্যাদা সম্পন্ন বা সমপদে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে। যেমন– উৎপাদন বিভাগ ও ক্রয় বিভাগের মধ্যে স্থাপিত যোগাযোগ।

**৫। দ্বি-মুখী যোগাযোগ কী?** [বাকাশিবো-২০০৭, পরি-১০, ১১]

**উত্তর** 'দ্বি-মুখী যোগাযোগ' কথাটির দ্বারা যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রবাহকে বুঝিয়ে থাকে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তাপ্রেরক কোন সংবাদ বা তথ্য বার্তাগ্রাহকের নিকট পাঠায়, বার্তাগ্রাহক তা পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া অর্থবোধক প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে প্রেরককে জানায়। একেই দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলা হয়। মূলত তা ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার নামান্তর। দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে তথ্যাদির আদান-প্রদান ঘটে। এরূপ যোগাযোগ উর্ধ্বগামী, নিম্নগামী ও সমান্তরাল যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হতে পারে।

**৬। অফিসিয়াল যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** অফিসিয়াল নিয়মনীতি বা কায়দা-কানুন মেনে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে কোন তথ্য বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা বিভাগসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে আদান-প্রদান করা হলে তাকে অফিসিয়াল যোগাযোগ বা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাবলি ও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যবস্থাপকের কাছে উত্থাপিত হয়ে থাকে। এ যোগাযোগের বার্তাসমূহের গমনাগমের পথ নির্দিষ্ট থাকে। প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন– পরিকল্পনা, কর্মসূচি, নীতিমালা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে প্রেরণের জন্য অফিসিয়াল যোগাযোগ করা হয়ে থাকে।

**৭। কোন্ ধরনের ক্ষেত্রে উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ সংঘটিত হয়?**

**উত্তর** যে ক্ষেত্রে যোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় পৃথক মর্যাদা সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ সংঘটিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে পারে। উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। উল্লম্ব যোগাযোগে যোগাযোগ-সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের একজনের পদমর্যাদা আরেকজনের চেয়ে উচ্চতর হয়। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, যে ক্ষেত্রে যোগাযোকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতা উভয়পক্ষের মধ্যে একজনের পদমর্যাদা আরেকজনের চেয়ে উচ্চতর হয় সেক্ষেত্রেই উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি যোগাযোগ সংঘটিত হবে।

**৮। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়-এর কারণ কী?** [বাকাশিবো-২০০৫, ১৩(T)]

**উত্তর** উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ব্যবস্থায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া এ যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদিত রিপোর্ট, সমস্যা, প্রস্তাব, সুপারিশ, মতামত ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। উল্লিখিত কারণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

**৯। দ্বি-মুখী যোগাযোগ পৃথক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়-কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তাপ্রেরক কোন সংবাদ বা তথ্য বার্তা গ্রাহকের নিকট পাঠায়, বার্তাগ্রাহক তা পাবার পর তার প্রতিক্রিয়া অর্থবোধক প্রতুত্তরের মাধ্যমে প্রেরককে জানায়। একেই দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলা হয়ে থাকে। বস্তুত দ্বি-মুখী যোগাযোগ পৃথক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়। 'দ্বি-মুখী যোগাযোগ' কথাটির দ্বারা মূলত যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রবাহকে বুঝিয়ে থাকে। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের মধ্যে সংবাদ বা তথ্যাদির আদান-প্রদান ঘটে, যা ফলাবর্তন প্রক্রিয়ারই নামান্তর। এটি সংবাদ বা তথ্যের আদান-প্রদানের সাথে জড়িত উভয় পক্ষের যোগাযোগের পরিপূর্ণতা আনয়নে সাহায্য করে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, দ্বি-মুখী যোগাযোগ পৃথক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়, বরং একে একটি পরিভাষক বলা যায়।

**১০। অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়ে থাকে?**

**উত্তর** কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা বা অফিসিয়াল নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই অনুষ্ঠান বর্জিত বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোন প্রকার সাংগঠনিক, সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গল্প-গুজবের মাধ্যমে যোগাযো কারী এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

**১১। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫, ১০]

**উত্তর ঃ** পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বা অফিসিয়াল কায়দা-কানুন মেনে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অনুসরণ করে কোন তথ্য বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা বিভাগসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে আদান-প্রদান করা হলে তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। এটা মূলত প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়ালী অনুমোদিত তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তথ্যাদি বিনিময়কালে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে এরূপ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**১২। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর ঃ** যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যাদির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতা বা অফিসিয়াল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় না, তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। আনুষ্ঠানিক নিয়ম-নীতি বা কায়দা-কানুন ছাড়াই কোন ব্যক্তি যে কোন সময় অন্য কোন ব্যক্তির সাথে এ প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সাধারণত খেলার মাঠে, ভ্রমণকালে, খাওয়ার টেবিলে, একসাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করার সময়, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে।

**১৩। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে তথ্যের বিকৃতি বা গুজবের জন্ম দেয়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ১১]

**উত্তর ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা বা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মানা হয় না এবং কোন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করা হয় না। অফিসিয়াল নিয়মকানুন ও সাংগঠনিক কাঠামোর বেড়াজালে আবদ্ধ না থাকার জন্য অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকে। ফলে অনেক সময় নানা কারণে তথ্য সম্পর্কে মিথ্যা ও গুজব ছড়িয়ে পড়তে পারে বা তথ্যের বিকৃতি ঘটাতে পারে।

**১৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি লংঘন করতে পারে না কেন?**

**উত্তর ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট রূপরেখা নির্দেশ করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট থাকে বলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজে কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং তারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি লংঘন করতে পারে না।

**১৫। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় কেন?**

**উত্তর ঃ** আনুষ্ঠানিক যোগাযোগকে আন্তরিকতা বিবর্জিত যোগাযোগ বলা যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মকানুন ও রীতি-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হয় বলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

**১৬। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে?**

**উত্তর ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে কর্মীরা তাদের অভাব-অভিযোগ ও পরামর্শ অতি সহজে ও নির্ভয়ে উপরওয়ালার নিকট তুলে ধরতে পারে। এতে কর্মীদের হতাশা দূর হয় এবং কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

**১৭। দ্বি-মুখী যোগাযোগের পাঁচটি সুবিধা লেখ।** [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগের পাঁচটি সুবিধা নিম্নে দেয়া হল–

১। **তথ্যের সাবলীল গতি ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক তার সংবাদ বা তথ্য বার্তাগ্রাহকের নিকট প্রেরণের পর প্রত্যুত্তরের আকারে তা বার্তাগ্রাহকের নিকট থেকে বার্তা প্রেরকের নিকট ফিরে আসে। ফলে যোগাযোগের তথ্য প্রবাহের সাবলীলতা বজায় থাকে এবং যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

২। **তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থায় বার্তাপ্রেরক তথ্য বা সংবাদ বার্তাগ্রাহকের নিকট পাঠানোর পর গ্রাহক তার প্রতিক্রিয়া ফলাবর্তনের মাধ্যমে জানায়। এতে বার্তাপ্রেরক তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করে।

৩। **নির্দেশ কার্যকরীকরণ ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী প্রবাহ বিদ্যমান থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রেরিত আদেশ-নির্দেশ কার্যকরীকরণ সহজ হয়। প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মচারীগণ নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ ভালভাবে বুঝতে না পারলে যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রক্রিয়ার দ্বারা উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট থেকে তা বুঝে নিয়ে নির্দেশকে সহজে কার্যকর করতে পারে।

৪। **পরামর্শ প্রদানে উৎসাহিতকরণ ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ থাকে। ফলে অধঃস্তন কর্মীরা নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে উৎসাহ বোধ করে।

৫। **কার্য-সন্তুষ্টি বৃদ্ধি ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেমন প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অধস্তন কর্মীদেরকে অবহিত করেন, অধস্তন কর্মচারীরাও তেমনি তাদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। এতে কর্মীদের হতাশা দূর হয় এবং কার্যসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

**১৮। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ পদ্ধতিগুলো কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** উর্ধ্বগামী যোগাযোগের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতিবেদন
২। পরামর্শ
৩। অভিযোগ বক্স
৪। সম্মেলন
৫। প্রত্যক্ষ তথ্য বিনিময়
৬। খোলা দরজা নীতি
৭। সভা সমিতি
৮। কাউন্সেলিং
৯। যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

**১৯। লম্বিক যোগাযোগ এবং সমান্তরাল যোগাযোগ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ১১]

**উত্তর ঃ** **লম্বিক যোগাযোগ ঃ** যদি দুই জন পৃথক পদ মর্যাদাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ সংগঠিত হয়, তবে তাকে লম্বিক যোগাযোগ বলে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে লম্বিক যোগাযোগ দেখানো হল ঃ

সহকারী ব্যবস্থাপক ⇄ বিভাগীয় ব্যবস্থাপক

**সমান্তরাল যোগাযোগ ঃ** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত একই পদ মর্যাদাসম্পন্ন বা একই পদে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে সমান্তরাল যোগাযোগ দেখানো হল ঃ

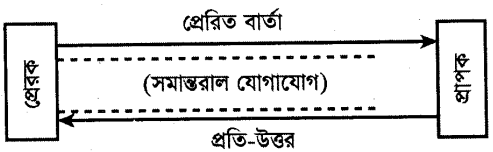


**২০। আজকাল অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০০৫, ১১, ১৩]

**উত্তর ঃ** অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হল ঃ

১। সহজে ও খোলামেলাভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।
২। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন।
৩। উর্ধ্বতন ও অধঃস্তনদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি।
৪। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প সময়ে কার্য সম্পাদন।

**২১। আজকাল দ্বি-মুখী যোগাযোগের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন?** [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর ঃ** আজকাল দ্বি-মুখী যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। যোগাযোগের সাবলীল প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।
২। বার্তা প্রেরক ও বার্তা গ্রাহককে সংযুক্ত করে পরিপূর্ণতা লাভ করে।
৩। তথ্য প্রেরক ও গ্রাহকের দক্ষতা বৃদ্ধি।
৪। প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে।
৫। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

২২। **উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধাগুলো লেখ।** [বাকাশিবো-২০০৮, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর ঃ** উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ–

(i) উর্ধ্বগামী যোগাযোগে গণতান্ত্রিক চর্চার কার্যকর ব্যবহার হয়।
(ii) এরূপ যোগাযোগে অধীনস্থদের নিকট থেকে ফলাবর্তন পাওয়া যায়।
(iii) এরূপ যোগাযোগে অধীনস্থরা তাদের অনুভূতি ও ধারণা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে।
(iv) এরূপ যোগাযোগে অধীনস্থ কর্মীরা উদ্যোগী হয়।
(v) এতে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। যোগাযোগ কী কী ধরনের হতে পারে? বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর সংকেত** ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। চিত্রের সাহায্যে যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। দ্বি-মুখী যোগাযোগ (Two-way Communication) কী?

**উত্তর সংকেত** ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১০]

**উত্তর সংকেত** ৭.৪.১ ও ৭.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। নিম্নগামী যোগাযোগ ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-১০]

**উত্তর সংকেত** ৭.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। যোগাযোগের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে? আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** ৭.৫.১ ও ৭.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** ৭.৬.১ ও ৭.৬.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৭.৫.২ ও ৭.৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** ৭.৬ ও ৭.৬.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ১০]

**উত্তর সংকেত** ৭.৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। 'অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ তথ্যের গুজব, অসত্য ও বিকৃতি ছড়ায়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৯]

**উত্তর সংকেত** ৭.৬.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

********

# অধ্যায়-৮

# যোগাযোগ পদ্ধতি
## (Methods of Communication)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৮.০ সূচনা; ৮.১ যোগাযোগ পদ্ধতির সংজ্ঞা; ৮.২ বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতি; ৮.৩ মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ; ৮.৪ লিখিত যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ; ৮.৫ মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য*

### ৮.০ সূচনা (Introduction) ঃ

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য, ভাব বা অনুভূতি একজনের নিকট থেকে অন্যজনে আদান-প্রদান হয় অর্থাৎ বিনিময় ঘটে। কোন বিষয়ে তথ্য বা ভাবের এই আদান-প্রদান বা বিনিময় পারস্পরিক কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চিঠিপত্র, আভাস বা আকার-ইঙ্গিত, চেহারার ভাব-ভঙ্গি কিংবা অন্য কোন সংকেতের মাধ্যমে হতে পারে। এগুলোকে ভাব বা তথ্য প্রেরণের বাহন বলা হয়ে থাকে। ভাব প্রকাশের এসব বাহন বা মাধ্যমকেই সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়। কোন ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে যোগাযোগ পদ্ধতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

### ৮.১ যোগাযোগ পদ্ধতির সংজ্ঞা (Definition of Communication Method) ঃ

যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত উপায় বা মাধ্যমকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলা হয়। অর্থাৎ যে কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে বা যে মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন করা হয়, তাকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলে। কোন ব্যক্তি তার ভাব, অনুভূতি চিন্তাধারা ইত্যাদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রেরণ বা প্রকাশ করতে যে সব মাধ্যম বা সংকেত ব্যবহার করে এবং উক্ত অন্য ব্যক্তি যে উপায় বা মাধ্যম ব্যবহার করে প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করে সেগুলোকেই যোগাযোগ পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়।

একজন ব্যক্তি সাধারণত ভাষার মাধ্যমে তার ভাব, অনুভূতি, মনোভাব ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। কাজেই, ভাষা হচ্ছে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন। যোগাযোগ পদ্ধতি মূলত এই ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। কেউ কারো সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে ভাষার সাহায্য নিতে হয়। এই ভাষা শাব্দিক এবং শব্দ বহির্ভূত উভয় প্রকারের হতে পারে। অর্থাৎ শব্দের সাহায্য ছাড়াও আকার-ইঙ্গিত, ইশারা, ভাবভঙ্গি বা অন্য কোন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং, যোগাযোগ কার্য তথা তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানে ব্যবহৃত শাব্দিক এবং শব্দ বহির্ভূত ভাষা বা সাংকেতিক চিহ্নকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলা হয়। তবে ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রধানত শব্দের মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, নির্দেশনা, পরামর্শ, সুপারিশ, কর্মীদের দাবি-দাওয়া মীমাংসা ইত্যাদি কাজে যে যোগাযোগ করতে হয় তা শব্দের মাধ্যমেই করা হয়।

### ৮.২ বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতি (Various Methods of Communication) ঃ

ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগের পদ্ধতিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

১। আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগ (Verbal Communication) এবং

২। অনাক্ষরিক বা শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ (Non-Verbal Communication)।

শব্দের সাহায্যে যোগাযোগ করা হলে তাকে আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগ এবং শব্দের সাহায্য ছাড়া যোগাযোগ স্থাপিত হলে তাকে অনাক্ষরিক বা শব্দবহির্ভূত যোগাযোগ বলে।

আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

(ক) মৌখিক বা বাচনিক যোগাযোগ (Oral Communication) এবং

(খ) লিখিত যোগাযোগ (Written Communication)।

অনাক্ষরিক বা শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন–

(ক) চাক্ষুষ বা দৃষ্টিলব্ধ যোগাযোগ (Visual Communication)

(খ) শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ (Audio-Visual Communication)

(গ) অঙ্গ-ভঙ্গি বা অঙ্গ-সঞ্চালন যোগাযোগ (Gesture Method)

(ঘ) নীরবতা যোগাযোগ (Passive means)

(ঙ) লৈখিক যোগাযোগ (Graphic Method)

(চ) কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication through action)

(ছ) অনুমান বা ভাবার্থের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication by implification)

(জ) স্পর্শের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication by touch) ইত্যাদি।

নিম্নে ছকের সাহায্যে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখানো হল ঃ

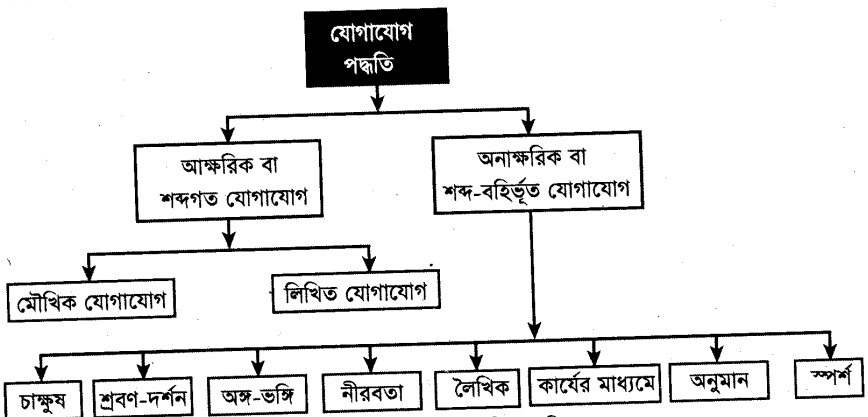


চিত্র ঃ ৮.১ যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি

**১। মৌখিক যোগাযোগ (Oral Communication) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি পারস্পরিক মৌখিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক যখন মৌখিকভাবে কথার মাধ্যমে তার মনের ভাব, তথ্য বা সংবাদ যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপকের নিকট প্রেরণ করে এবং যোগাযোগ গ্রহীতাও মৌখিক ভাষার মাধ্যমে তার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, তখন তাকে মৌখিক যোগাযোগ বলা হয়। আজকাল কারবারি যোগাযোগের অধিকাংশই মৌখিকভাবে সংঘটিত হয়। মৌখিক যোগাযোগে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং প্রেরকের বার্তা প্রাপকের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা বোধগম্য তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কথোপকথন, সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, বক্তৃতা, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স, দুরালাপনী, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি মৌখিক যোগাযোগের অন্যতম উপায়।

**২। লিখিত যোগাযোগ (Written Communication) ঃ** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক যখন তার মনের ভাব, অনুভূতি, তথ্য বা সংবাদ লিখিতভাবে বার্তাপ্রাপকের নিকট প্রেরণ করে, তখন তাকে লিখিত যোগাযোগ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বার্তাপ্রেরক বার্তার বিষয়বস্তু ভাষার সাহায্যে কাগজে-কলমে লিখে বার্তাপ্রাপকের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। যোগাযোগ লিপি, নির্দেশিকা, রিপোর্ট, বুলেটিন, বিজ্ঞপ্তি, স্মারকলিপি প্রভৃতি লিখিত যোগাযোগের বিভিন্ন উপায়। লিখিত যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগের মত প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয় না এবং এতে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না। তবে লিখিত বলে এটা সংরক্ষণযোগ্য এবং এতে তথ্যের বিকৃতি ঘটে না। কারবারি জগতে ব্যবসায়িক যোগাযোগের একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে লিখিত যোগাযোগ জনপ্রিয়।

**৩। চাক্ষুষ বা দৃষ্টিলব্ধ যোগাযোগ (Visual Communication) ঃ** অবলোকন বা চোখে দেখার মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাকে চাক্ষুষ বা দৃষ্টিলব্ধ যোগাযোগ বলে। চাক্ষুষ পদ্ধতিতে ছবি, চার্ট, ম্যাপ, ডায়াগ্রাম, চিত্র বা নকশার সাহায্যে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। যোগাযোগ গ্রহীতা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হলে এ পদ্ধতির যোগাযোগ অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে যে কোন ধরনের তথ্য বা সংবাদ ছবি বা দর্শনীয় বস্তুর সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে চাক্ষুষ পদ্ধতি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহের ওঠানামা ও দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি অবস্থা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**৪। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ (Audio-Visual Communication) ঃ** মৌখিক, লিখিত এবং চাক্ষুষ যোগাযোগ পদ্ধতির সংমিশ্রণে এ যোগাযোগ সাধিত হয়। যোগাযোগের এ পদ্ধতিতে একই সময়ে বার্তার বিষয়বস্তু লিখিত ভাষা, মৌখিক শব্দ এবং দর্শনীয় বস্তু, যেমন– ছবি, চিত্র, ম্যাপ, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে বার্তাপ্রাপক একই সাথে ছবি দেখে এবং শব্দ শুনে বার্তার বিষয়বস্তু সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এটি যোগাযোগের একটি আধুনিক পদ্ধতি। যোগাযোগের এ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম' এ জাতীয় যোগাযোগ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত।

**৫। অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গসঞ্চালন যোগাযোগ (Gesture Method) ঃ** শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে যে যোগাযোগ কার্য সম্পাদন করা হয়, তাকে অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ-সঞ্চালন যোগাযোগ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে যোগাযোগকারী আকার, ইঙ্গিত, ইশারা ইত্যাদি প্রদর্শন করে মনের ভাব প্রকাশ করে। যেমন– কোন বিষয়ে সম্মতি প্রকাশের জন্য মাথা নাড়ানো, তিরস্কার জানানোর উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন, জয়সূচক সংকেত (Symbol) ব্যবহারে দুই-আঙ্গুল দেখানো, যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশের হাত দেখানো ইত্যাদি এ পদ্ধতির উদাহরণ। অঙ্গ-সঞ্চালন সাধারণত যোগাযোগের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**৬। নীরবতা যোগাযোগ (Passive means) ঃ** অনেক সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে নীরবতাও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যের অর্থবোধক অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন– প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের চিন্তামগ্ন মুখাবয়ব দেখে কর্মচারীরা বুঝতে পারে যে, তিনি হয়তো কোন সমস্যায় পড়েছেন। আবার ব্যবস্থাপকের রাগান্বিত মুখাকৃতি দেখে কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কার্যে মনোনিবেশ করে।

**৭। লৈখিক যোগাযোগ (Graphic Method) ঃ** এ পদ্ধতিতে যোগাযোগকারী লেখচিত্র বা ছবির সাহায্যে তার মনের ভাব যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট উপস্থাপন করে থাকে। অনেক সময় শব্দ বা ভাষার ব্যবহার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক হয় না; সে সকল ক্ষেত্রে লৈখিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষ ফলদায়ক। তবে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের সকল প্রকার তথ্য উপস্থাপন করা যায় না।

**৮। কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication through Action) ঃ** কাজ বা মানুষের আচার-আচরণ যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। কোন কাজের মাধ্যমে যখন মানুষ তার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তখন তাকে কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ বলা হয়। যেমন– কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী কর্মকর্তা যদি একনিষ্ঠভাবে তাঁর কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়, তাহলে অধস্তন কর্মচারীরাও তাঁকে অনুসরণ করে কর্তব্যপরায়ণ হতে পারে।

**৯। অনুমান বা ভাবার্থের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication by Implification) ঃ** এ পদ্ধতিতে বার্তাপ্রেরক বার্তা-গ্রাহকের নিকট সরাসরি কোন তথ্য বা সংবাদ পাঠায় না। বার্তাপ্রেরকের ব্যক্তিত্ব, চালচলন, হাবভাব প্রভৃতির উপর অনুমানের ভিত্তিতে বার্তাগ্রাহক তথ্য সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করে থাকেন।

**১০। স্পর্শের মাধ্যমে যোগাযোগ (Communication by Touch) ঃ** স্পর্শের মাধ্যমেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে স্পর্শ করে সেক্ষেত্রে স্পর্শকারী বার্তাপ্রেরক হিসেবে বার্তাগ্রাহকের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও চেহারার ভাবভঙ্গি (Facial Expressions), চাহনি বা চোখে চোখে তাকানো (Eye Contact), মুচকি হাসি ও ভ্রুকুটি (Smilies and Frowns) ইত্যাদি অনাক্ষরিক বা শব্দ-বহির্ভূত যোগাযোগের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## ৮.৩ মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of Oral Communication) ঃ

### ৮.৩.১ সুবিধাসমূহ (Advantages) ঃ

যোগাযোগকে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পদ্ধতিতে যোগাযোগকারী প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ গ্রহীতার সাথে আলাপ-আলোচনা বা কথাবার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করে এবং যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট থেকে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর লাভ করে থাকে। আজকাল কারবারি জগতে সর্বাধিক ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে মৌখিক যোগাযোগের জুড়ি নেই।

নিম্নে যোগাযোগের এসব সুবিধাগুলোর বর্ণনা প্রদান করা হল ঃ

**১। সহজ পদ্ধতি (Esay Method) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ অত্যন্ত সহজ। এ পদ্ধতিতে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। বার্তাপ্রেরক ইচ্ছা করলেই বার্তাগ্রাহকের সাথে যে কোন সময় বার্তা বা তথ্যাদির বিনিময় করতে পারে।

২। **বক্তব্য অনুধাবনের সুবিধা (Easy understanding of Context)** ঃ মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রোতার পক্ষে বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ। এ ব্যবস্থায় শ্রোতা কোন তথ্য না বুঝতে পারলে সাথে সাথে বক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারে।

৩। **প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সৃষ্টি (To Create Direct Relationship)** ঃ মৌখিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ-গ্রহীতার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হয়। এক্ষেত্রে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা সম্প্রীতি আনয়নে সহায়ক।

৪। **প্রতিক্রিয়া অনুধাবন (To understand Reaction)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে বার্তাপ্রেরক তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে। এতে বার্তাপ্রেরক বা যোগাযোগকারী যোগাযোগের সফলতা বা ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হয়।

৫। **সময়ের অপচয় রোধ (To restrain wastage of Time)** ঃ এ পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে মুখোমুখিভাবে বা টেলিফোনের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের লোকদের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। এতে যোগাযোগকারীর মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না।

৬। **তথ্যের পরিবর্তনযোগ্যতা (Changeability of Information)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে তথ্য বা বার্তা পরিবর্তনের সুযোগ আছে। যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতি বা অবস্থায় প্রয়োজনবোধে এ যোগাযোগ পরিবর্তন করা যায়। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা বা সময়ের প্রয়োজন হয় না।

৭। **তথ্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধন (Correction of mistake of Information)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে তথ্যে কোন রকম ভুল-ত্রুটি বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে বা বক্তব্যের কোন কিছু বাদ পড়লে তা সহজেই সাথে সাথে সংশোধন করা যায়। ফলে নির্ভুলভাবে এ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

৮। **অশিক্ষিতের জন্য উপযোগী (Suitable for Illiterate)** ঃ অশিক্ষিত ব্যক্তি কোন কিছু লিখতে পড়তে পারে না বলে তাদের নিকট মৌখিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করলে তা সহজেই বুঝতে পারে। তাই অশিক্ষিতের জন্য এটা উপযোগী ও ফলদায়ক।

৯। **তথ্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (Complete description of Information)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে বক্তা বা বার্তাপ্রেরক তার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারেন। ফলে এ পদ্ধতিতে তথ্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান সম্ভব।

১০। **ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস (Reduce Misunderstanding)** ঃ সামনাসামনি কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা মৌখিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলে তাতে বক্তব্যের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ কম থাকে।

১১। **ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা (To establish Unanimity)** ঃ যে কোন বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌখিক যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মৌখিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক এবং বার্তাগ্রাহক উভয়েই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সৃষ্ট মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

১২। **সহজ সমন্বয় সাধন (Ease of Co-ordination)** ঃ মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে অতি সহজে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন করা যায়।

১৩। **কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি (To create Motivation)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সরাসরি আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রীত হয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করে থাকে।

১৪। **ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি (Individual Satisfaction)** ঃ শ্রোতার সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে বক্তা বা বার্তাপ্রেরক তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। ফলে যোগাযোগের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তা উপলব্ধি করতে পারে এবং এতে তার ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

১৫। **গোপনীয়তা রক্ষা (Maintaining Secrecy)** ঃ মৌখিক যোগাযোগে জড়িত পক্ষ অর্থাৎ বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহক ইচ্ছা করলে অতি সহজেই বার্তার বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন।

১৬। **তথ্যের বিকৃতি রোধ (To restrain destortion of Information)** ঃ মৌখিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রেরক ও তথ্যগ্রাহক উভয়েই সামনাসামনি কথাবার্তা বলে তথ্যের বিনিময় করে। এতে তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

১৭। **বিরোধ নিষ্পত্তি (Settlement of Dispute)** ঃ মৌখিকভাবে দ্বি-পক্ষীয় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক জটিল বিরোধের সহজে নিষ্পত্তি করা যায়।

**১৮। দীর্ঘসূত্রতা পরিহার (To avoid Procrastination) ঃ** মৌখিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে অতি দ্রুত তথ্যাদির আদান-প্রদান সম্ভব হয়। কাজেই অন্যান্য যোগাযোগের তুলনায় মৌখিক যোগাযোগে অতি সহজেই তথ্যের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা যায়।

**১৯। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন (To develop Employee-Management Relation) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কর্মীরা সরাসরিভাবে ব্যবস্থাপকের নিকট তাদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি জানতে পারেন এবং সেই প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

**২০। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন (To achieve Organisational Goal) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে সহায়ক। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, যা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনকে সহজ করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মৌখিক বা বাচনিক যোগাযোগ অত্যন্ত সহজ এবং এর মাধ্যমে মনের ভাবকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রাহকের সামনে তুলে ধরা যায়। তাই এ যোগাযোগ সমাজের সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বার্তা আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট জনপ্রিয়।

## ৮.৩.২ মৌখিক যোগাযোগের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ (Demerits or disadvantages of Oral Communication) ঃ

মৌখিক যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে সফলতা আনতে পারে না। এর বহুবিধ সুবিধার পাশাপাশি অনেকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে এর অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

**১। সংরক্ষণের অযোগ্য (Not preservable) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ লিখিতভাবে করা হয় না বলে এর কোন রেকর্ড থাকে না এবং তা সংরক্ষণও করা যায় না। ফলে যোগাযোগের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে পরবর্তীকালে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

**২। তথ্য বিকৃতি (Distorted meaning) ঃ** মৌখিক যোগাযোগে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। কারণ এতে তথ্য পরিবেশনে মৌখিক কথাবার্তার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় বলে পরবর্তীতে এর প্রকৃত অর্থের বিকৃতি ঘটার অবকাশ থেকে যায়।

**৩। অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা (Possibility of wrong explanation) ঃ** এরূপ যোগাযোগে যেহেতু তথ্যকে সংরক্ষণ করা যায় না, সেহেতু ভবিষ্যতে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহক তথ্য সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের অপব্যাখ্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

**৪। স্বল্পস্থায়ী পদ্ধতি (Short term method) ঃ** মৌখিক যোগাযোগ লিপিবদ্ধ থাকে না বিধায় এবং মানুষের স্মরণশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য বহুদিন যাবৎ তা মনে রাখা সম্ভব নয় বলে এটাকে দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

**৫। মূল বিষয়ের বিচ্যুতি (Error in subject matter) ঃ** মৌখিক যোগাযোগে অনেক সময় বার্তার বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে গিয়ে বক্তা সৌকর্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। এতে গুরুত্বহীন বিষয়ের অবতারণা হয় এবং মূল বিষয়ের বিচ্যুতি ঘটে। ফলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়।

**৬। গুরুত্বহীনতা (Less important) ঃ** বক্তব্য মৌখিক হওয়ার কারণে বার্তাগ্রাহক বা শ্রোতা প্রায়শই এর গুরুত্ব দিতে চায় না। ফলে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহেলোর বস্তুতে পরিণত হয়।

**৭। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব (Delay in decision) ঃ** মৌখিক যোগাযোগে শ্রোতা অনেক সময় বক্তাকে অহেতুক বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করে। ফলে বক্তাকে দীর্ঘক্ষণ তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

**৮। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জটিলতা (Complexity in decision) ঃ** সংগঠনের কতিপয় সিদ্ধান্ত যেমন ঃ বদলি, ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ, পদাবনতি ইত্যাদি অপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে মৌখিক যোগাযোগ সফল মাধ্যম নয়। লিখিত যোগাযোগ এক্ষেত্রে অধিকতর সুফল প্রদান করে থাকে।

**৯। নির্দেশনার ক্ষেত্রে অকার্যকর (Failure in direction) ঃ** ঘোষণা, নির্দেশনা ইত্যাদি লিখিত না হলে কার্যকর করা যায় না। এক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগ অকেজো।

**১০। আইনগত ভিত্তিহীনতা (No legal validity) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের প্রামাণ্য কোন রেকর্ড না থাকায় এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। তাই এরূপ যোগাযোগের বিষয়বস্তু আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়।

**১১। ব্যয় সাপেক্ষ (Expensive) ঃ** এরূপ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিসীমার মধ্যে স্বল্পব্যয়ী হলেও দূরবর্তী স্থানের লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে সেখানে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি বাবদ অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এমনকি টেলিফোনে কথা বললেও প্রচুর অর্থের অপচয় হয়।

**১২। মন্থর গতি (Slow motion) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের গতি প্রায়শই মন্থর হয়। কারণ এরূপ যোগাযোগে মূল বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে যোগাযোগকারী যোগাযোগ গ্রহীতার ব্যক্তিগত কুশলাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। এতে যোগাযোগে মন্থর গতির সৃষ্টি হয়।

**১৩। গোপনীয় বিষয় ফাঁস (Lack of secrecy) ঃ** মানুষ সাধারণত কথা বলার সময় অসাবধান থাকে। ফলে অসতর্ক মুহূর্তে বা অসাবধানতা বলে প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

**১৪। অস্বীকার করার প্রবণতা (Tendency of deny) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের বেলায় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি স্বীয়স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন সময় বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করতে পারে। কেননা, এর কোন লিখিত রেকর্ড থাকে না।

**১৫। অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা (Discussion unimpontant topics) ঃ** মৌখিক যোগাযোগে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা স্থান পায়। এতে অহেতুক সময়ের অপচয় হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটে।

**১৬। বিরক্তির উদ্রেক (Unwanted situation) ঃ** এরূপ যোগাযোগের আর একটি বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যারা কথা বলায় অপটু এবং যাদের গলার স্বর কর্কশ অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের মাধুর্য নেই তাদের বক্তব্য শ্রোতাদের নিকট বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে পারে। ফলে যোগাযোগের সফলতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

**১৭। অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ (Influence on vested interest) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা চলাকালে তৃতীয় কোন ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হাজির হতে পারে এবং উভয়ের পারস্পরিক কথাবার্তায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

**১৮। দুর্বল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ (Expression of weak personality) ঃ** দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা মৌখিক যোগাযোগে অংশগ্রহণ করলে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা হতে তার ব্যক্তিত্বের দুর্বল দিক শ্রোতার কাছে ধরা পড়ে এবং সমাজে তার সম্মান ক্ষুণ্ন হয়।

**১৯। কার্যকরীকরণে বাধা (Problems due to denial) ঃ** মৌখিক যোগাযোগে বক্তার আবেগ, বাচন ও প্রকাশভঙ্গি, স্বর ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে তা কার্যকর করা দুঃসাধ্য।

উপসংহারে বলা যায় যে, মৌখিক যোগাযোগের উপরোক্ত অসুবিধাসমূহের কারণে কতিপয় ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যোগাযোগ স্থাপনকালে যোগাযোগকারী এবং যোগাযোগ গ্রহীতা উভয়েই সতর্কতা অবলম্বন করলে এ সমস্ত অসুবিধাগুলো অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে এবং এতে মৌখিক যোগাযোগের সফলতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে।

## ৮.৪ লিখিত যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of Written Communication) ঃ

### ৮.৪.১ সুবিধাসমূহ (Advantages) ঃ

আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এর সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

**১। সংরক্ষণসাধ্য (Preservable) ঃ** মানুষ তার স্মৃতিপটে সবকিছু ধরে রাখতে পারে না। যোগাযোগের বার্তা লিখিত হলে তা দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে যে কোন সময় যোগাযোগের বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয়। ফলে কাউকে আর স্মৃতির মহড়া দিতে হয় না।

**২। জটিল বিষয়ের উপস্থাপন (Persentation of Complicated Matter) ঃ** লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে অতি সহজেই জটিল বিষয়াদির খুঁটিনাটি উপস্থাপন করা যায়। ফলে যোগাযোগের বিষয়বস্তু গ্রাহকের নিকট স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। কাজেই, বক্তব্যের জটিলতা এড়াতে লিখিত যোগাযোগ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

**৩। প্রামাণ্য দলিল (Authoritative Document) ঃ** মৌখিক কথাবার্তা আইনের চোখে মূল্যহীন বিধায় কোন বিষয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হলে প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করতে হয়। লিখিত যোগাযোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, লিখিত যোগাযোগের বিষয়বস্তুকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আদালতে পেশ করা যায়।

**৪। সহজে বোধগম্য (Easy to Understand) ঃ** লিখিত যোগাযোগ সহজেই বোধগম্য হয়। কেননা, যোগাযোগের বার্তা লিখিত হলে বার বার তা পাঠ করে বার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়।

**৫। স্থায়ী সূত্র (Permanent Reference) ঃ** লিখিত যোগাযোগের নথি রাখা হয় বলে এর স্থায়ী রেকর্ড থাকে। ফলে ভবিষ্যতে একে সূত্র বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**৬। তথ্যের বিকৃতি রোধ (Restraining distortion of Information) ঃ** যোগাযোগের বিষয়বস্তু লিখিত হলে তা বিকৃতির কোন সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। এতে এর অপব্যবহার রোধ হয়।

**৭। অপব্যাখ্যা রোধ (Restraining of Misinterpretation) ঃ** লিখিত যোগাযোগের বক্তব্য লিখিত থাকে বলে তা পরিবর্তন করা যায় না। ফলে কেউ ইচ্ছা করলেই এর অপব্যাখ্যা করতে পারে না।

**৮। শুদ্ধতা যাচাই (Determining Accuracy) ঃ** যোগাযোগের বার্তা লিখিত থাকলে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এর শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। এ কারণে লিখিত যোগাযোগ বার্তাপ্রেরক ও বার্তাপ্রাপক উভয়েরই আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়।

**৯। সময় ও অর্থের অপচয় হ্রাস (Reducing Wastage of Time and Money) ঃ** লিখিত যোগাযোগে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতাকে একত্রিত হতে হয় না। তাছাড়া, মৌখিক যোগাযোগের মত এরূপ যোগাযোগে অনাবশ্যকীয় কথাবার্তার কোন অবকাশ নেই। ফলে এতে সময় ও অর্থের অপচয় কম হয়।

**১০। ঝুঁকি নিরসন (Removing Risk) ঃ** কারবারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। কারবারের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ সংরক্ষিত রেকর্ড হিসেবে ভবিষ্যতের আর্থিক ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসনে সহায়তা করে।

**১১। বক্তব্য পেশের সুবিধা (Easy presentation) ঃ** অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় বক্তব্য সাজিয়ে গুটিয়ে বলতে পারে না কিন্তু লেখার মাধ্যমে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ছাত্রকে যদি তার পাঠ্য বইয়ের কিছু জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সে তা ভালভাবে বলতে পারে না, অথচ পরীক্ষার খাতায় ঠিকই সুন্দরভাবে লিখতে পারে। সুতরাং বলা যায়, লিখিত যোগাযোগ বক্তব্য পেশের সুবিধা দান করে।

**১২। কর্তৃত্বার্পণের সুবিধা (Convenience to delegate Authority)ঃ** ব্যবস্থাপনার জন্য কর্তৃত্বার্পণ অপরিহার্য। কারণ ব্যবস্থাপককে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে হয়। আর এই কর্তৃত্বার্পণকে কার্যকর করতে লিখিত যোগাযোগ আবশ্যক। কারণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখিত থাকলে কর্মচারীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের আওতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

**১৩। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ (Effective Control) ঃ** প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় লিখিত যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সীমা নির্দিষ্ট ও লিখিত থাকে বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সে অনুযায়ী কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

**১৪। বাহুল্য বর্জন (Avoiding Abundance) ঃ** বাহুল্য বর্জিত বক্তব্য সকলের নিকট পছন্দনীয়। লিখিত যোগাযোগে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা লিখে বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষিপ্তাকারে মূল বিষয়বস্তুকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

**১৫। তথ্যের সঠিকতা (Authenticity) ঃ** লিখিত যোগাযোগে তথ্যের সঠিকতা রক্ষা করা যায়। কেননা, এরূপ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগকারী ধীরেসুস্থে চিন্তাভাবনা করে যোগাযোগের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে বক্তব্যের খসড়া প্রণয়ন করতে পারেন। কাজেই এতে সঠিকভাবে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

**১৬। তথ্য অস্বীকারের প্রবণতা রোধ (Protect deny information) ঃ** লিখিত যোগাযোগে সবকিছুই লিখিত থাকে বলে কেউ ইচ্ছা করলেই যেমন তথ্যের পরিবর্তন করতে পারে না, তেমনি লিখিত বক্তব্যকে অস্বীকারও করতে পারে না। এমনকি কোন জটিল পরিস্থিতিতে আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করার জন্যও কোন তথ্যকে অস্বীকার করার সুযোগ এতে নেই। ফলে যোগাযোগের সফলতা নিশ্চিত হয়।

**১৭। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ (Effective for Important Matters) ঃ** প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন– উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নীতিমালা, পদ্ধতি ও নির্দেশাবলি প্রদান ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ অধিকতর ফলপ্রসু। কারণ, এগুলো লিখিত হলে অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

**১৮। উত্তম প্রচার মাধ্যম (Best media for Publicity) ঃ** লিখিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার প্রচারকার্যে কার্যকর ভূমিকা রাখে। লিখিত চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, ফিচার, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচার কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠান তার পণ্য বা সেবার চাহিদা ও সুনাম বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দ্বারা নিজস্ব ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

**১৯। নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ঃ** লিখিত কাগজপত্র নির্ভরযোগ্য। কেননা, কেউ ইচ্ছা করলেই তা অস্বীকার করতে পারে না। এমন কী অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও লিখিত দলিলপত্রের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে।

**২০। গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability) ঃ** এটা সংরক্ষণের সুবিধা থাকায় এবং নির্ভরযোগ্য বলে সকলের নিকটই গ্রহণযোগ্য। মোট কথা, এর গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি।

**২১। বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার (Uses as alternative Method) ঃ** লিখিত যোগাযোগ ব্যক্তিগত সংযোগের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা কথাবার্তা ঘুচিয়ে বলতে পারে না, যাদের গলার স্বর কর্কশ কিংবা কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাদের জন্য লিখিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করাই শ্রেয়।

## ৮.৪.২ লিখিত যোগাযোগের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ (Disadvantages or Demerits of Written Communication) ঃ

লিখিত যোগাযোগ ত্রুটিবিহীন সুযোগ-সুবিধার ঝুঁড়িই নয়; কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিও রয়েছে। নিম্নে এর অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

**১। ব্যয়সাধ্য (Expensive) ঃ** লিখিত যোগাযোগের বেলায় যোগাযোগের বার্তা বা বিষয়বস্তু লেখার জন্য আনুষঙ্গিক কাগজ, কলম, কালি, টাইপরাইটার, কম্পিউটার, সাইক্লোস্টাইল, প্রিন্টিং মেশিন ইত্যাদি এবং অতিরিক্ত লোকজন প্রয়োজন হয়। এ সবগুলোর জন্যই অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হয়। তাই লিখিত যোগাযোগ ব্যয়সাধ্য।

**২। সময় সাপেক্ষ (Time Consuming) ঃ** লিখিত যোগাযোগ স্থাপনের সময় বেশি লাগে। কারণ, কোন বিষয় লিখতে গেলে চিন্তা করতে হয় এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এতে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

**৩। তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তরের অভাব (Lack of quick Response) ঃ** লিখিত যোগাযোগে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, এতে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাপ্রাপকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না বলে বার্তা বা তথ্যের আদান-প্রদানে সময় বেশি লাগে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে প্রাপককে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে তারপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হয়। ফলে এরূপ যোগাযোগে প্রত্যুত্তর দেরিতে আসে।

**৪। দীর্ঘসূত্রতা (Sluggishness) ঃ** লিখিত যোগাযোগ আমলাতান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট এবং এটা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য (Red tapism) বৃদ্ধি করে। কোন বার্তা লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হলে তা ফাইলবদ্ধভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে উদ্দীষ্ট স্থানে পৌছায়। তাছাড়া অনেক সময় জরুরি চিঠিপত্র ও নির্দেশাবলি ফাইলবন্দি অবস্থায় অনেকদিন পড়ে থাকে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

**৫। তথ্যের তড়িৎ ব্যাখ্যার অভাব (Lack of quick Interpretation) ঃ** লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য বা নির্দেশাবলির অনেক সময় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু মৌখিক যোগাযোগের মত এক্ষেত্রে কোন সংবাদ বা তথ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা তাৎক্ষণিকভাবে বা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না।

**৬। অশিক্ষিতের নিকট মূল্যহীন (Worthless to Illiterate) ঃ** যোগাযোগ গ্রহীতা অশিক্ষিত হলে লিখিত যোগাযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের পক্ষে লিখিত বার্তা পড়ে তার মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগই সুফল দিতে পারে। তাই অশিক্ষিতদের নিকট লিখিত যোগাযোগ অনুপযোগী।

**৭। নমনীয়তার অভাব (Lack of Flexibility) ঃ** লিখিত যোগাযোগের বার্তা ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন করা যায় না। এর বিষয়বস্তুতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন হয়। ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে এটা দ্রুত খাপ খাওয়াতে পারে না।

**৮। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা (Comprising Unnecessary Elements) ঃ** কারবার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত লোকদের অনেকেই নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য এবং অন্যের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ লিপিতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা লিখে থাকে। এতে যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে পড়ে।

**৯। ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব (Lack of Personal Relationship) ঃ** লিখিত যোগাযোগ বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে না। কাজেই যোগাযোগ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রের অন্তরায়স্বরূপ।

**১০। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কঠিন (Difficult to Estabilish Unanimity) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ে বার্তা-প্রেরক ও বার্তাগ্রাহক পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই ঐকমত্যে পৌছতে পারে। কিন্তু লিখিত যোগাযোগে এরূপ সুযোগ না থাকায় কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সময়সাপেক্ষ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

**১১। তথ্য পরিবেশনে মন্থরতা (Slow motion for data presentation) ঃ** লিখিত যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগের ন্যায় দ্রুত স্থাপন করা যায় না। এরূপ যোগাযোগে বার্তা ধীরগতিতে উদ্দীষ্ট স্থানে পৌছায়। ফলে অনেক সময় যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

**১২। প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষণ করা যায় না (Failure in observed reaction) ঃ** লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা বা সংবাদ প্রাপকের নিকট কীভাবে প্রত্যক্ষিত হয়েছে এবং প্রেরিত বার্তার ব্যাপারে প্রাপকের মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয় তা বুঝা যায় না, যা মৌখিক যোগাযোগে প্রাপকের চেহারার ভাবভঙ্গি দেখে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

**১৩। গোপনীয়তা রক্ষার অভাব (Lack of maintaining Secrecy)ঃ** লিখিত যোগাযোগে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। যোগাযোগের বার্তা কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে বলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যে কোন সময় বাইরের লোকজনও কারবারের গোপন তথ্য জেনে ফেলতে পারে।

**১৪। বক্তব্য সংশোধনের অসুবিধা (Drawbacks of Correction of Message) ঃ** লিখিত যোগাযোগের একটি বড় ধরনের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এ যোগাযোগে বক্তব্যের কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা যায় না। ভুল সংশোধন করতে হলে আবার নতুন করে যোগাযোগ করতে হয়।

**১৫। স্থান ও অর্থের অপচয় (Wastage of Place and Money) ঃ** লিখিত কাগজপত্র নথিবদ্ধ করে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে জায়গা ও অর্থের যথেষ্ট অপচয় হয়।

লিখিত যোগাযোগের উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে এবং সাধারণ প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ যোগাযোগ পদ্ধতিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়।

## ৮.৫ মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Oral and Written Communication) ঃ

কোন কারবার প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতিই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন প্রকৃতির হলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | মৌখিক যোগাযোগ | লিখিত যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ১। তথ্য উপস্থাপন প্রক্রিয়া | মৌখিক যোগাযোগে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। | লিখিত যোগাযোগে কাগজে-কলমে লিখিতভাবে তথ্যের উপস্থাপন করা হয়। |
| ২। বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের সম্পর্ক | মৌখিক যোগাযোগে বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। | লিখিত যোগাযোগে বার্তা-প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। |
| ৩। আনুষ্ঠানিকতা | মৌখিক যোগাযোগে সাধারণত কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না; অনানুষ্ঠানিকভাবেই এ যোগাযোগ সংঘটিত হয়। | লিখিত যোগাযোগের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। |
| ৪। সংরক্ষণ-যোগ্যতা | মৌখিক যোগাযোগের কোন রেকর্ড থাকে না বিধায় তা সংরক্ষণ করা হয় না। | লিখিত যোগাযোগের স্থায়ী রেকর্ড থাকে বলে তা সংরক্ষণ করা যায়। |

| পার্থক্যের বিষয় | মৌখিক যোগাযোগ | লিখিত যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ৫। প্রামাণ্য দলিল | সংরক্ষণযোগ্যতার অভাবে মৌখিক যোগাযোগ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য। | লিখিত যোগাযোগ সংরক্ষণযোগ্য বলে একে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। |
| ৬। আইনগত মূল্য | মৌখিক যোগাযোগ আদালতে প্রমাণ করা যায় না বলে আইনের চোখে মূল্যহীন। | লিখিত যোগাযোগ আদালতে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। |
| ৭। নির্ভরযোগ্যতা | মৌখিক যোগাযোগের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা যায় না; কারণ, যোগাযোগকারী বার্তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পারে। | লিখিত কাগজপত্র নির্ভরযোগ্য। যোগাযোগকারী ইচ্ছা করলেই তা অস্বীকার করতে পারে না। |
| ৮। ব্যয় | মৌখিক যোগাযোগে তেমন খরচ পড়ে না। | লিখিত যোগাযোগে কাগজ, কলম, কালি, কম্পিউটার, টাইপ-রাইটার ইত্যাদি ব্যবহারের দরুন অনেক খরচ পড়ে। |
| ৯। সময়ক্ষেপণ | মৌখিক যোগাযোগ স্থাপনে সময় কম লাগে। | লিখিত যোগাযোগে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার জন্য সময় বেশি লাগে। |
| ১০। বাহুল্য বর্জন | মৌখিক যোগাযোগে বাহুল্য বর্জন করা যায় না। এতে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সম্ভাবনা থাকে। | লিখিত যোগাযোগে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা লিখে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করা হয় না বলে এতে বাহুল্য বর্জন সম্ভব হয়। |
| ১১। ভুল-ত্রুটি সংশোধন | মৌখিক যোগাযোগে সংবাদ বা তথ্যের ভুল সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা যায়। | এ যোগাযোগে প্রেরিত বার্তা প্রাপকের নিকট পৌছার পূর্বে ভুল সংশোধনের অবকাশ কম থাকে। |
| ১২। পরিবর্তনযোগ্যতা | মৌখিক যোগাযোগ বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি বা অবস্থায় প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা যায়। | লিখিত যোগাযোগে তথ্যের পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। |
| ১৩। প্রত্যুত্তর | এ যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয় বলে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। | এ যোগাযোগে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না। |
| ১৪। গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া | মৌখিক যোগাযোগ বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। | লিখিত যোগাযোগে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া বুঝা যায় না। |
| ১৫। আবেগ নিয়ন্ত্রণ | মৌখিক যোগাযোগে আবেগের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মৌখিকভাবে কথাবার্তা বলার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে অনেক সময় বেফাঁস কথাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এমন কী গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। | লিখিত যোগাযোগ ধীরে-সুস্থে চিন্তা-ভাবনা করে অতি সাবধানে করা হয় বলে এতে আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। |
| ১৬। তথ্য বিকৃতি | মৌখিক যোগাযোগে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি। | লিখিত যোগাযোগে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা কম। |
| ১৭। দীর্ঘসূত্রতা | মৌখিক যোগাযোগে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা সম্ভব। | লিখিত যোগাযোগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। |

| পার্থক্যের বিষয় | মৌখিক যোগাযোগ | লিখিত যোগাযোগ |
|---|---|---|
| ১৮। কার্যকারিতা | অশিক্ষিত লোকের নিকট মৌখিক যোগাযোগই উত্তম; তাদের নিকট লিখিত যোগাযোগের কোন কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। | প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, পদ্ধতি, নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ সর্বোত্তম; এক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগের কোন কার্যকারিতা নেই। |
| ১৯। নির্ভুলতা | এতে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা কঠিন। | পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এর নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায়। |
| ২০। গুরুত্ব | মৌখিক যোগাযোগের গুরুত্ব লিখিত যোগাযোগ অপেক্ষা কম। | লিখিত যোগাযোগের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। |
| ২১। ব্যবহার | কারবার জগতে অধিকাংশ যোগাযোগই মৌখিকভাবে সংঘটিত হয়। | মৌখিক যোগাযোগের তুলনায় লিখিত যোগাযোগের ব্যবহার কম। |

## ৮.৫.১ মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে কখন কোন্‌টি অধিক গ্রহণযোগ্য? (In between Oral and Written Communication which one is prefered to the other and when?) ঃ

কোন ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে মৌখিক ও লিখিত উভয়বিধ যোগাযোগেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে যোগাযোগের কোন পদ্ধতিই সার্বজনীন বা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

বস্তুতপক্ষে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে যোগাযোগের কোন্ পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য তা কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। একজন সফল যোগাযোগকারীকে যোগাযোগের পূর্বেই এ সকল উপাদান বিবেচনা করা উচিত। উপাদানগুলো হল ঃ

১। যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার ব্যক্তিগত যোগ্যতা
২। বার্তাগ্রাহকের সংখ্যা
৩। ভৌগোলিক অবস্থান
৪। ভাষাগত পার্থক্য
৫। সময়
৬। তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর
৭। যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার সম্পর্ক
৮। তুলনামূলক ব্যয়
৯। আইনগত ভিত্তি
১০। গুরুত্ব ।

**নিম্নে এসব উপাদানের ব্যাখ্যা প্রদান করা হল ঃ**

**১। যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার ব্যক্তিগত যোগ্যতা (Qualifications of Communicator and Communicatee) ঃ** যিনি যোগাযোগ করবেন এবং যার কাছে যোগাযোগের বার্তা প্রেরণ করা হবে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর যোগাযোগের প্রকৃতি নির্ভর করে। যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রাপক যদি অশিক্ষিত হন তাহলে মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতিই উপযুক্ত। লিখিত যোগাযোগ এক্ষেত্রে অচিন্তনীয়।

**২। বার্তাগ্রাহকের সংখ্যা (Number of Communicatee/ Receiver) ঃ** বার্তা-গ্রাহকের সংখ্যা কম হলে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে যোগাযোগকারী নিজেই সকলের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য বা সংবাদ বিনিময় করতে পারেন। কাজেই এক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগই অধিক কার্যকর। পক্ষান্তরে, বার্তাগ্রাহকের সংখ্যা বেশি হলে অর্থাৎ অধিক কর্মচারী থাকলে তথ্যের বিকৃতি ও ব্যাখ্যার বিভিন্নতা রোধকল্পে লিখিত যোগাযোগ করাই উত্তম।

**৩। ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) ঃ** বার্তাপ্রেরক ও বার্তাপ্রাপক উভয়ই যদি কাছাকাছি অবস্থান করে এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে সেক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগ অধিক সুবিধাজনক। কিন্তু এক পক্ষ অন্য পক্ষ অপেক্ষা দূরে অবস্থান করলে লিখিত যোগাযোগই শ্রেয়।

**৪। ভাষাগত পার্থক্য (Lingual Differences) ঃ** এক অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য অঞ্চলের ভাষার মিল থাকে না। যেক্ষেত্রে যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে মৌলিক যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয় না। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মচারী থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগ অপেক্ষা লিখিত যোগাযোগই অধিক উপযোগী।

**৫। সময় (Time) ঃ** যোগাযোগের জন্য কতটুকু সময় পাওয়া যাবে তার উপর নির্ভর করে যোগাযোগ মৌখিক হবে না লিখিত হবে। যদি অধিক সময় পাওয়া যায় তাহলে আস্তে-ধীরে লিখিতভাবে যোগাযোগ করা যায়; কিন্তু সময় স্বল্প হলে মৌখিকভাবেই বার্তা প্রেরণ করতে হয়।

**৬। তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর (Immediate Response) ঃ** যদি যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকের নিকট থেকে প্রত্যুত্তর পাওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগই গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। আর যেক্ষেত্রে বক্তব্য নির্দেশনামূলক হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যুত্তর পাওয়ার আবশ্যকতা নেই, সেক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ অধিকতর সুফল দিতে পারে।

**৭। যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার সম্পর্ক (Relationship between Communicator and Communicatee) ঃ** যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কও যোগাযোগ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। যেক্ষেত্রে যোগাযোগের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে বিবাদমান সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসার জন্য মৌখিক যোগাযোগই সুফল দিতে পারে। আর উল্লেখিত পক্ষসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে সেক্ষেত্রে মৌখিক বা লিখিত যে কোন পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। তবে উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক রক্ষা করতে হলে মৌখিক যোগাযোগ ব্যবহার করা উচিত। লিখিত যোগাযোগ সুফল দিতে পারে না।

**৮। তুলনামূলক ব্যয় (Comparative Cost) ঃ** যোগাযোগ স্থাপনকালে যোগাযোগ পদ্ধতিসমূহের তুলনামূলক ব্যয় ও অর্জিত ফলাফল তুলনা করে দেখতে হবে কোন্ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ এবং সেটাই তখন গ্রহণযোগ্য হবে।

**৯। আইনগত ভিত্তি (Legal Basis) ঃ** যখন আইনের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন হয়, তখন লিখিত যোগাযোগই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ, লিখিত যোগাযোগের স্থায়ী রেকর্ড থাকে এবং এর আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে, আদালতে একে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে দাখিল করা যায়। আর মৌখিক যোগাযোগ আইনের চোখে মূল্যহীন বিধায় এক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও ব্যবহার কম হয়।

**১০। গুরুত্ব (Importance) ঃ** যখন কোন জটিল, আনুষ্ঠানিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তখন লিখিত যোগাযোগই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য। আর যখন অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তখন মৌখিক যোগাযোগ অধিক ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ফলপ্রসূ যোগাযোগের জন্য কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ কার্যক্রমে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মৌখিক যোগাযোগ অধিক কার্যকরী ও ফলদায়ক; আবার এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে লিখিত যোগাযোগই অধিক গ্রহণযোগ্য। মূলত মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং বলা যায় যে, মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে কখন কোন্‌টি অধিক গ্রহণযোগ্য হবে তা পুরোপুরিভাবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, কার্যপ্রকৃতি এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।



## অনুশীলনী-৮

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগ পদ্ধতি কী?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর ঃ** যে কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে বা যে মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন করা হয়, তাকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলে।

**২। যোগাযোগ পদ্ধতিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ পদ্ধতিকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১। আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগ এবং

২। অনাক্ষরিক বা শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ।

**৩। শব্দগত যোগাযোগ কী?**

**উত্তর ঃ** শব্দের সাহায্যে যোগাযোগ করা হলে তাকে আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগ বলে।

**৪। আক্ষরিক যোগাযোগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

**উত্তর** আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১। মৌখিক বা বাচনিক যোগাযোগ এবং

২। লিখিত যোগাযোগ।

**৫। অনাক্ষরিক যোগাযোগ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর** শব্দের সাহায্য ছাড়া যোগাযোগ স্থাপিত হলে তাকে অনাক্ষরিক বা শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ বলে।

**৬। আজকাল কারবারি যোগাযোগে কোন্ পদ্ধতির ব্যবহার অধিক?**

**উত্তর** আজকাল কারবারি যোগাযোগের অধিকাংশই মৌখিকভাবে সংঘটিত হয়। তাই মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যবহারই অধিক বলা যায়।

**৭। লিখিত যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক যখন তার মনের ভাব, অনুভূতি, তথ্য বা সংবাদ মিলিতভাবে বার্তাপ্রাপকের নিকট প্রেরণ করে তখন তাকে লিখিত যোগাযোগ বলে।

**৮। লিখিত যোগাযোগের প্রধান প্রধান উপায়গুলো কী?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর** যোগাযোগ লিপি, নির্দেশিকা রিপোর্ট, বুলেটিন, বিজ্ঞপ্তি, স্মারকলিপি প্রভৃতি লিখিত যোগাযোগের বিভিন্ন উপায়।

**৯। অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন যোগাযোগ পদ্ধতি কী?**

**উত্তর** শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে যে যোগাযোগ কার্য সম্পাদন করা হয়, তাকে অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন যোগাযোগ বলে।

**১০। লৈখিক যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর** যে পদ্ধতিতে যোগাযোগকারী লেখচিত্র বা ছবির সাহায্যে তার মনের ভাব যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট উপস্থাপন করে, তাকে লৈখিক যোগাযোগ বলে।

**১১। অশিক্ষিতের জন্য কোন্ যোগাযোগ পদ্ধতি উপযোগী?**

**উত্তর** অশিক্ষিতের জন্য মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি উপযোগী ও ফলদায়ক।

**১২। কোন্ যোগাযোগে তথ্য বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে?**

**উত্তর** মৌখিক যোগাযোগে তথ্য বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এতে তথ্য পরিবেশনে মৌখিক কথা বার্তার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

**১৩। কোন্ যোগাযোগের স্থায়ী রেকর্ড থাকে?**

**উত্তর** লিখিত যোগাযোগের স্থায়ী রেকর্ড থাকে এবং একে স্থায়ী সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**১৪। কোন্ যোগাযোগ স্থাপনে সময় বেশি লাগে?**

**উত্তর** লিখিত যোগাযোগ স্থাপনে সময় বেশি লাগে। কারণ কোন বিষয় লিখতে গেলে চিন্তা করতে হয় এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

**১৫। আইনের দৃষ্টিতে কোন যোগাযোগ অধিক গ্রহণীয়?**

**উত্তর** আইনের দৃষ্টিতে লিখিত যোগাযোগ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ এর স্থায়ী রেকর্ড থাকে, যা আদালতে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে দাখিল করা যায়।

**১৬। মৌখিক, লিখিত ও চাক্ষুস যোগাযোগ পদ্ধতি সংমিশ্রণে কোন যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** মৌখিক, লিখিত ও চাক্ষুস যোগাযোগ পদ্ধতি সংমিশ্রণে আক্ষরিক বা শব্দগত যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

**১৭। দৃশ্যমান বা চাক্ষুস যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর** অবলোকট বা চোখে দেখার মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে দৃশ্যমান বা চাক্ষুস যোগাযোগ বলে। চাক্ষুস পদ্ধতিতে চিত্র, ছবি, মানচিত্র, ডায়াগ্রাম বা নকশার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে।

**১৮। স্পর্শ যোগাযোগ বলতে কী ঝুঝায়?**

**উত্তর ঃ** এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে স্পর্শ করার মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে স্পর্শ যোগাযোগ বলে।

**১৯। শব্দ বহির্ভুত যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** শব্দের সাহায্য ছাড়া যোগাযোগ স্থাপিত হলে তাকে শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ বলে?

**২০। শব্দগত যোগাযোগ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ঃ** শব্দগত যোগাযোগ দুই প্রকার, যথা–

১। মৌখিক বা বাচনিক যোগাযোগ

২। লিখিত যোগাযোগ।

**২১। ব্যবসায়িক জগতে আজকাল কোন ধরনের যোগাযোগ অধিক ব্যবহৃত হয়?**

**উত্তর ঃ** ব্যবসায়িক জগতে আজকাল অধিকাংশই মৌখিক যোগাযোগ ব্যবহৃত হয়। তাই মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহারই অধিক বলা যায়।

**২২। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর ঃ** মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো হল– টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ইত্যাদি।

**২৩। লিখিত যোগাযোগ বেশি গ্রহণযোগ্য কেন?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর ঃ** আইনের দৃষ্টিতে লিখিত যোগাযোগ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ এর স্থায়ী রেকর্ড থাকে, যা আদালতে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে দাখিল করা যায়।

## ▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। যোগাযোগ পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত উপায় বা মাধ্যমকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলা হয়। অর্থাৎ যে কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে বা যে মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন করা হয়, তাকে যোগাযোগ পদ্ধতি বলে। কোন ব্যক্তি তার ভাব, অনুভূতি, চিন্তাধারা ইত্যাদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রেরণ বা প্রকাশ করতে যে সব মাধ্যম বা সংকেত ব্যবহার করে এবং উক্ত অন্য ব্যক্তি যে উপায় বা মাধ্যম ব্যবহার করে প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করে সেগুলোকেই যোগাযোগ পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়।



**২। মৌখিক যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগকারী বা বার্তাপ্রেরক যখন মৌখিকভাবে কথার মাধ্যমে তার মনের ভাব, তথ্য বা সংবাদ যোগাযোগগ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপকের নিকট প্রেরণ করে এবং যোগাযোগগ্রহীতাও মৌখিক ভাষার মাধ্যমে তার প্রত্যুত্তর প্রদান করে তখন তাকে মৌখিক যোগাযোগ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে পারস্পরিক মৌখিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৩। মৌখিক যোগাযোগের উপায়গুলো উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, পরি-১০, ১১, ১২, ১৪]
**অথবা, মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো বা কৌশলগুলো লেখ।**

**উত্তর ঃ** **মৌখিক যোগাযোগের উপায়গুলো নিম্নরূপ ঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। কথোপকথন | ২। সাক্ষাৎকার | ৩। দলগত আলোচনা | ৪। বক্তৃতা |
| ৫। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স | ৬। দূরালাপনী | ৭। রেডিও | ৮। টেলিভিশন ইত্যাদি। |

**৪। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর ঃ** মৌখিক, লিখিত এবং চাক্ষুষ যোগাযোগ পদ্ধতির সংমিশ্রণে এ যোগাযোগ সাধিত হয়। যোগাযোগের এ পদ্ধতিতে একই সময়ে বার্তার বিষয়বস্তু লিখিত ভাষা, মৌখিক শব্দ এবং দর্শনীয় বস্তু, যেমন– ছবি, চিত্র, ম্যাপ, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে বার্তা-প্রাপক একই সাথে ছবি দেখে এবং শব্দ শুনে বার্তার বিষয়বস্তু সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এটি যোগাযোগের একটি আধুনিক পদ্ধতি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম' এ জাতীয় যোগাযোগ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত।

**৫। নীরবতা কী যোগাযোগ হতে পারে?**

**উত্তর** অনেক সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে নীরবতাও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যের অর্থবোধক অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন– প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের চিন্তামগ্ন মুখাবয়ব দেখে কর্মচারীরা বুঝতে পারে যে, তিনি হয়তো কোন সমস্যায় পড়েছেন। আবার ব্যবস্থাপকের রাগান্বিত মুখাকৃতি দেখে কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কার্যে মনোনিবেশ করে।

**৬। কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর** কাজ বা মানুষের আচার-আচরণ যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। কোন কাজের মাধ্যমে যখন মানুষ তার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তখন তাকে কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ বলা হয়। যেমন– কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী কর্মকর্তা যদি একনিষ্ঠভাবে তার কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়, তাহলে অধস্তন কর্মচারীরাও তাকে অনুসরণ করে কর্তব্যপরায়ণ হতে পারে।

**৭। আইনগত মূল্যের দিক হতে মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের পার্থক্য কী?**

**উত্তর** মৌখিক যোগাযোগের কোন রেকর্ড থাকে না বলে তা আদালতে প্রমাণ করা যায় না। এ কারণে মৌখিক যোগাযোগ আইনের চোখে মূল্যহীন।

পক্ষান্তরে, লিখিত যোগাযোগের স্থায়ী রেকর্ড থাকে এবং তা আদালতে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**৮। কনফারেন্স কাকে বলে?**

**উত্তর** মৌলিক যোগাযোগের অন্যতম পদ্ধতি হল কনফারেন্স বা কনফারেন্সে মিলিত ব্যক্তিবর্গ কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বিষয়ের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। যে পদ্ধতিতে একাধিক ব্যক্তি বিশেষ সময়ে মিলিত হয়ে কোন বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করে তাকে কনফারেন্স বলে।

**৯। অনাক্ষরিক যোগাযোগ কাকে বলে? অনাক্ষরিক যোগাযোগ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর** যে সকল যোগাযোগ লেখার মাধ্যমে হয় না অর্থাৎ বক্তৃতা দলগত আলোচনা সাক্ষাৎকার যে সকল যোগাযোগ পদ্ধতিকে অন্যক্ষরিক যোগাযোগ বলে। অনাক্ষরিক যোগাযোগ আট প্রকার। যথা–১। চাক্ষুস বা দৃষ্টিলব্ধ যোগাযোগ, ২। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ, ৩। অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গসঞ্চালন যোগাযোগ, ৪। নীরবতা যোগাযোগ, ৫। লৈখিক যোগাযোগ, ৬। কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ, ৭। অনুমান বা ভাবার্থের মাধ্যমে যোগাযোগ, ৮। স্পর্শের মাধ্যমে যোগাযোগ।

**১০। লিখিত যোগাযোগের তিনটি সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** নিম্নে লিখিত যোগাযোগের সুবিধা আলোচনা করা হল ঃ

১। **সংরক্ষণ যোগাযোগ ঃ** যোগাযোগ লিখিত হয় বলে তা দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় এবং ভবিষ্যৎ এর প্রয়োজনে যেকোন সময় যোগাযোগের বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয়।

২। **ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঃ** লিখিত যোগাযোগ সর্বাধিক সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি। এরূপ যোগাযোগ সংবাদের ভুল ব্যাখ্যা সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর করে।

৩। **স্থায়ী দলিল ঃ** লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ বার্তার স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

নিম্নে লিখিত যোগাযোগের অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা দেওয়া হল ঃ

১। **ব্যয়সাধ্য ঃ** লিখিত যোগাযোগের বিষয়বস্তু লেখার জন্য কাগজ কলম কালি, কম্পিউটার, প্রিন্টিং মেশিন এবং অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হয়। তাই লিখিত যোগাযোগ ব্যয়সাধ্য।

২। **সময় সাপেক্ষ ঃ** লিখিত যোগাযোগ স্থাপনে বেশি সময় লাগে। কারণ লিখতে গেলে চিন্তা ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এতে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

৩। **ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কঠিন ঃ** লিখিত যোগাযোগ বার্তা প্রেরক ও গ্রাহকের আলোচনার ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

**১১। লিখিত যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক যখন তার মনের ভাব, অনুভূতি, তথ্য বা সংবাদ লিখিতভাবে বার্তা প্রাপকের নিকট প্রেরণ করে তখন তাকে লিখিত যোগাযোগ বলে। লিখিত যোগাযোগ একটি আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির যোগাযোগ। যোগাযোগ লিপি, নির্দেশিকা রিপোর্ট, বুলেটিন, বিজ্ঞপ্তি লিখিত যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি। লিখিত যোগাযোগে সংরক্ষণযোগ্য এবং তথ্যের বিকৃতি ঘটে না। নিম্নে এরূপ যোগাযোগের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হল ঃ

**L.C. Bovee এবং সহযোগীদের মতে,** পড়তে হয় এমন শব্দের মাধ্যমে ধারণার প্রকাশকে লিখিত যোগাযোগ বলে।

**Rejendra Pal ও J.S Korlahalli এর মতে,** যা কিছু লিখিত ও লিখিত আকারে প্রেরিত তা-ই লিখিত যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত।

## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। যোগাযোগ পদ্ধতি কাকে বলে? যোগাযোগ পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.১ ও ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
অথবা, যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে? [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। মৌখিক যোগাযোগ কাকে বলে? মৌখিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর (১) ও ৮.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.৩.১ ও ৮.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। লিখিত যোগাযোগ কী? এ যোগাযোগ পদ্ধতির সুবিধা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর-২ ও ৮.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। লিখিত যোগাযোগের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ১০, ১১]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.৪.১ ও ৮.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১৩, ১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে অধিক গ্রহণীয় বলে মনে কর এবং কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.৫.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ**

(ক) মৌখিক যোগাযোগ

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর ১ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

(খ) চাক্ষুষ যোগাযোগ

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর ৩ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

(গ) কার্যের মাধ্যমে যোগাযোগ

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর ৮ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) অঙ্গ সঞ্চালন যোগাযোগ

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর ৫ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ।

**উত্তর সংকেত ঃ** ৮.২ এর ৪ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

********

# অধ্যায়-৯

# যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি
## (Essentials of Communication)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*৯.০ সূচনা; ৯.১ উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি; ৯.২ যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা; ৯.৩ উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়*

### ৯.০ সূচনা (Introduction) ঃ

যোগাযোগ মানুষের মনের ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ইত্যাদি পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যম। উত্তম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে কারবার প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জন সহজসাধ্য হয়। কিন্তু উত্তম ও কার্যকরী যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হলে কতকগুলো অপরিহার্য শর্তাবলি মেনে চলা আবশ্যক। কাজেই যোগাযোগকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে অর্থাৎ যোগাযোগের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন করতে গেলে এতে এ সকল শর্তাবলির সমাবেশ ঘটাতে হবে। এগুলোকে উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় গুণাবলি বলা হয়।

### ৯.১ উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি (Essential features of Good Communication) ঃ

যোগাযোগ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেকটা যোগাযোগেরই কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি উল্লেখ করা হল ঃ

১। **ধারণার শ্রেণিবিন্যাস (Classified assumption) ঃ** যোগাযোগের পূর্বেই যোগাযোগকারীকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অতঃপর উক্ত ধারণাকে নিয়মমাফিক ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজিয়ে নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

২। **উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Target fixup) ঃ** যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বেই যোগাযোগকারীকে যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে সে সম্পর্কে যোগাযোগকারীকে বিচার-বিশ্লেষণ করে পূর্বেই এর লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

৩। **পরিকল্পনা (Planning) ঃ** যোগাযোগকারীকে যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বে যোগাযোগের বিষয়বস্তু, বার্তা প্রেরণ বা উপস্থাপন পদ্ধতি, স্থান, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে হবে।

৪। **মাধ্যম নির্বাচন (Way selection) ঃ** যোগাযোগকারীকে যোগাযোগ বার্তা প্রেরণ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে। মৌখিক কথাবার্তা, লিখিত ভাষা, চিত্ররেখা, হাবভাব ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

৫। **শ্রোতা বা গ্রাহক সনাক্তকরণ (Identify listener) ঃ** সার্থকভাবে যোগাযোগ কার্য সম্পাদন করার জন্য যোগাযোগকারীকে যোগাযোগগ্রহীতার যোগ্যতা, পদমর্যাদা, জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাধারা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যোগাযোগ পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।

৬। **সংক্ষিপ্ততা (Conciseness) ঃ** উত্তম যোগাযোগের আর একটি অপরিহার্য গুণ হল বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ততা। দীর্ঘ বক্তৃতা, দীর্ঘ নির্দেশনা বা বিবরণ যোগাযোগের মানকে ক্ষুণ্ন করে। কাজেই অতি সংক্ষেপে বার্তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

৭। **স্পষ্টতা (Clearness) ঃ** যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টতাও বিবেচ্য। যোগাযোগের বার্তা লিখিত বা মৌখিক যেভাবেই প্রেরিত হোক না কেন তা গ্রাহকের নিকট অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে।

৮। **ভুল-ত্রুটি মুক্ততা (Free from error) ঃ** ভুল প্রেরিত তথ্য যোগাযোগের সফলতাকে বিঘ্নিত করে। কাজেই যোগাযোগের সফলতার জন্য যোগাযোগের বার্তার বিষয়বস্তু ভুলত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৯। **সঠিক সময় নির্ধারণ (Fix-up time) ঃ** প্রতিষ্ঠানের কোন লক্ষ্য সফলতার সাথে অর্জন করতে উপযুক্ত সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। সময়মত যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য তথা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে।

১০। **ভাষা নিয়ন্ত্রণ (Voice control) ঃ** ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগকারী তার মনের ভাব প্রকাশ করে। আবার যোগাযোগগ্রহীতাও ভাষার মাধ্যমেই তা গ্রহণ করে এবং প্রত্যুত্তর প্রদান করে। তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

১১। **পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণ (Preserve mutual trust) ঃ** যোগাযোগের সফলতা অর্জন করার জন্য অবশ্যই বার্তাগ্রাহক এবং প্রেরক উভয়ের স্বার্থের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। উভয়ের স্বার্থে রচিত যোগাযোগ অধিক কার্যকর হয়।

**১২। ফলাবর্তন (Feed back) ঃ** যোগাযোগের কার্যকারিতা অনুধাবনের জন্য ফলাবর্তন আবশ্যক। ফলাবর্তনের সাহায্যে বার্তাগ্রাহকের প্রতিক্রিয়া জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে যোগাযোগের সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

**১৩। সহজ উপস্থাপন (Easy presentation) ঃ** স্পষ্টভাবে এবং সহজ সরল ভাষায় বার্তাগ্রাহকের উপযোগী করে যোগাযোগ উপস্থাপন করতে হবে। উপস্থাপন কখনই জটিল ও দুর্বোধ্য হবে না।

**১৪। বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহকের সম্পর্ক পরিমাপ (Estimate relation between receiver & sender) ঃ** বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান তা বিবেচনা করে যোগাযোগ লিপি বা বার্তা প্রণয়ন করতে হবে। এতে দ্রুত ও কার্যকরী প্রতি-উত্তর লাভ করা যায়।

**১৫। কথায় ও কাজে সঙ্গতি (Similarity between word & works) ঃ** যোগাযোগকারীর অঙ্গীকার ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি না থাকলে গ্রাহক বীতশ্রদ্ধ হবে এবং যোগাযোগ অর্থহীন হয়ে যাবে। কাজেই সার্থক যোগাযোগের জন্য যোগাযোগকারীর কথায় ও কাজে সঙ্গতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

**১৬। আদর্শ শ্রোতা (Good listener) ঃ** যোগাযোগ স্থাপনকালে যোগাযোগকারীকে ভাল শ্রোতাও হতে হবে। নতুবা যোগাযোগের আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে না।

**১৭। প্ররোচনা (Motivation) ঃ** ইপ্সিত ফল পেতে হলে যোগাযোগে প্ররোচনার উপাদান থাকতে হবে।

**১৮। সম্পূর্ণতা (Complete) ঃ** যোগাযোগকে সার্থক করতে হলে বার্তাপ্রেরককে যোগাযোগের মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে হবে। বার্তার আংশিক উপস্থাপনা গ্রাহককে সঠিক প্রতি-উত্তর প্রদানে বিরত করে।

**১৯। সুনাম বজায় রাখা (Maintain reputation) ঃ** যোগাযোগকারীকে তার সুনাম বজায় রাখতে হবে। যোগাযোগকারীর প্রতিষ্ঠিত সুনাম তাকে বার্তাগ্রাহকের সাথে ভাব বিনিময়েও অনুকূল প্রত্যুত্তর পেতে সাহায্য করে।

**২০। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ (Environment objervation) ঃ** পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশ যোগাযোগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একই ধরনের যোগাযোগ পরিবেশ-পরিস্থিতির বিভিন্নতার কারণে ভিন্নরূপ ফল দিতে পারে। তাই যোগাযোগকারীকে যোগাযোগের সময় যোগাযোগগ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত।

**২১। পর্যালোচনা ও ফল পরিমাপ (Analysis & compare result) ঃ** বার্তা প্রেরণের সাথে সাথেই যোগাযোগ কার্য শেষ হয়ে যায় না। গ্রাহক কীভাবে বার্তা গ্রহণ ও প্রত্যক্ষণ করেছে এবং এর কার্যকারিতা কিংবা ব্যর্থতাইবা কতটুকু তা পর্যালোচনা করে পরিমাপ করা উচিত। এতে যোগাযোগের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উত্তম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য উপরোল্লিখিত শর্ত বা গুণাবলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ সকল গুণাবলির সমাবেশ ঘটলেই তাকে উত্তম বা আদর্শ যোগাযোগ বলা যাবে।

## ৯.২ যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা (Barriers of Communication) ঃ

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বা ভাবের বিনিময় করে থাকে। তথ্যের এই বিনিময় প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের অবস্থানগত বা অন্য কোন কারণে বলা ও শুনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কিংবা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে যোগাযোগের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং তথ্য পরিবেশনায় বিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যে সব সমস্যা বা বাধা যোগাযোগের স্বাভাবিক গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদেরকে যোগাযোগের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। এদেরকে দুর্বল যোগাযোগের কারণ (Causes of poor communication) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

বস্তুত যোগাযোগের লক্ষ্য অর্জনের পথে মানুষের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কতকগুলো অভ্যাস বা কর্ম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টিকারী এসব কর্ম বা উপাদান প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে কিংবা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। তবে এসব প্রতিবন্ধকতার বেশির ভাগই অনভিপ্রেত।

মোট কথা, যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বার্তা বা তথ্যের কোন ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি কিংবা বিকৃতি বা পরিবর্তন যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য বা স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করলে তাকে যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা বলে অভিহিত করা হয়।

❑ **যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহের শ্রেণিবিভাগ (Classification of barriers of communication) ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানের ভিতরগত এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন উপাদান যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। যে সকল উপাদান যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যের আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং বিকৃতি ঘটায় সেগুলোকে অর্থাৎ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি ঃ

| | |
|---|---|
| ১। সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা | ক. সাংগঠনিক পরিবেশ<br>খ. সংগঠন স্তরের আধিক্য<br>গ. নীতির অভাব<br>ঘ. সংগঠন কাঠামোর অনিয়ম<br>ঙ. যোগাযোগ গতিপথের অস্পষ্টতা<br>চ. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টনে অসমতা<br>ছ. ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক<br>জ. তত্ত্বাবধায়কদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা<br>ঝ. সংগঠন কাঠামো |
| ২। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা | ক. ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব<br>খ. মানবীয় ধারণা<br>গ. পূর্বনির্ধারিত ধারণা<br>ঘ. প্রত্যক্ষণ<br>ঙ. পক্ষপাতিত্ব<br>চ. কপটতা ও অবিশ্বাস<br>ছ. ভয়ভীতি |
| ৩। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা | ক. দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার<br>খ. দ্ব্যর্থবোধক শব্দ<br>গ. আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার<br>ঘ. পারিভাষিক শব্দ<br>ঙ. সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার<br>চ. মিশ্র ভাষার ব্যবহার |
| ৪। মর্যাদাগত প্রতিবন্ধকতা | ক. পদমর্যাদা বা পজিশন<br>খ. মানসিক কাঠামো<br>গ. সন্দেহ প্রবণতা<br>ঘ. তোষামোদ প্রিয়তা<br>ঙ. আবেগ-অনুভূতির পার্থক্য<br>চ. আংশিক শ্রবণ<br>ছ. জ্যেষ্ঠতার ধারণা |
| ৫। পরিবর্তন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা | ক. পূর্বাবস্থা অনুসরণ<br>খ. নতুন ভাবধারা গ্রহণে অস্বীকৃতি<br>গ. অমনোযোগ<br>ঘ. নিজস্ব মত প্রচারের প্রবণতা<br>ঙ. অবহেলা বা খামখেয়ালীপনা |
| ৬। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা | ক. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব<br>খ. তথ্যের দুর্বোধ্যতা<br>গ. অনৈক্য বা বেসুরো<br>ঘ. কর্ম ব্যস্ততা<br>ঙ. দুর্বল উদ্দেশ্য<br>চ. ভৌগোলিক সমস্যা<br>ছ. অব্যক্ত অনুমিতি<br>জ. প্রতারণা ইত্যাদি। |

নিম্নে সংক্ষেপে যোগাযোগের উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

**১। সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা (Barriers due to organizational structure) ঃ** সাংগঠনিক কাঠামো থেকে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলোকে বলা হয় সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা। সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত ধরনের হয়ে থাকে ঃ

**(ক) সাংগঠনিক পরিবেশ (Organizational environment) ঃ** যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে যোগাযোগ কার্য চলতে থাকে তা সে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মনোভাব বা মনোবৃত্তি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা যোগাযোগের ব্যাপারে অনাগ্রহী হলে তার এই প্রতিকূল মনোভাব যোগাযোগের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে।

**(খ) সংগঠন স্তরের আধিক্য (Complex organizational level) ঃ** সংগঠনে কর্তৃত্বের ধাপ অধিক থাকলে একটা সংবাদ অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে উদ্দীষ্ট স্থানে অর্থাৎ গ্রাপকের হাতে পৌছায়। এতে তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

**(গ) নীতির অভাব (Lack of principles) ঃ** নীতি বা পলিসি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মনের আয়না। তাই কোন প্রতিষ্ঠানে সুস্পষ্ট পলিসি না থাকলে কর্মচারীরা একে যোগাযোগের প্রতি ব্যবস্থাপনার অনীহার পরিচায়ক বলে মনে করে।

**(ঘ) সংগঠন কাঠামোতে অনিয়ম (Complex organizational structure) ঃ** অনেক সংগঠন কাঠামোতে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন থাকে না বা থাকলেও তা মেনে চলে না। নির্দিষ্ট নীতি মেনে না চলার কারণে যোগাযোগের স্বাভাবিক গতিপথ ব্যাহত হয়।

**(ঙ) যোগাযোগের গতিপথের অস্পষ্টতা (Complex communication way) ঃ** সাংগঠনিক যোগাযোগ প্রধানত উর্ধ্বগামী, নিম্নগামী ও সমান্তরাল হতে পারে। সংগঠন কাঠামোতে যোগাযোগের সুনির্দিষ্ট গতিপথের নির্দেশ না থাকলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে।

**(চ) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টনে অসমতা (Unequal authority and responsibility) ঃ** সংগঠনে কর্মচারীদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুষ্ঠু বণ্টনের অভাবে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

**(ছ) উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক (Relation between supervisor & subordinate) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ না করলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। অনেক অধস্তন কর্মচারীরা বসকে খুশি করার জন্যও তথ্যের বিকৃতি ঘটায়।

**(জ) তত্ত্বাবধায়কদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা (Barriers created by caretaker) ঃ** তত্ত্বাবধায়করা যদি কর্মীদের সাথে ভালভাবে যোগাযোগ না রাখে তবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।

**(ঝ) সংগঠন কাঠামো (Organizational structure) ঃ** প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামো নিজে থেকেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সংগঠন কাঠামো সহজ-সরল হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়। কিন্তু সংগঠনের জটিলতা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**২। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা (Individual barriers) ঃ** ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থেকে যোগাযোগে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতা নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার ঃ

**(ক) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব (Individual conflict) ঃ** মানুষের ব্যবহারের দুটি দিক, যথা ঃ যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও যুক্তিবিহীন ভাবাবেগ কোন ব্যক্তির মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন মানুষ যদি যোগাযোগকে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ দ্বারা প্রকাশ করে তখন উক্ত যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

**(খ) মানবীয় ধারণা (Human perception) ঃ** উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যকার বিপরীতধর্মী ধারণা যোগাযোগের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

**(গ) পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা (Pre determine assumption) ঃ** সাধারণত মানুষ তার ধারণা অনুযায়ী ফলাফল আশা করে। কাজেই পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়, তবে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

**(ঘ) প্রত্যক্ষণ (Observation) ঃ** সকল মানুষের প্রত্যক্ষণ এক হয় না। প্রত্যক্ষণের এই বিভিন্নতার কারণে যোগাযোগে সমস্যা দেখা দেয়।

**(ঙ) পক্ষপাতিত্ব (Partiality) ঃ** ব্যক্তির পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ ও স্বজনপ্রীতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**(চ) কপটতা ও অবিশ্বাস (Hood wink) ঃ** প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কপটতাপূর্ণ আচরণ কর্মচারীদেরকে অবিশ্বাসী করে তোলে এবং ফলশ্রুতিতে তথ্য বিনিময়কালে তা বিকৃতরূপে পরিবেশন করে।

**(ছ) ভয়ভীতি (Fear) ঃ** মানুষের মনের বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি, যেমন– অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়; অপব্যাখ্যার ভয় ইত্যাদি কারণে যোগাযোগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

**৩। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা (Barriers due to language) ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ভাব বা তথ্য পরিবেশনে ভাষাগত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

**(ক) দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার (Use of ambiguous words) ঃ** কঠিন ভাষা ব্যবহার করলে যোগাযোগ গ্রহীতার পক্ষে মূল বক্তব্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

**(খ) দ্ব্যর্থবোধক শব্দ (Ambiguous word) ঃ** যোগাযোগে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার ফলে যোগাযোগের বার্তার বিষয়বস্তুর প্রকৃত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়।

**(গ) আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার (Use of local language) ঃ** বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভাষার প্রচলন রয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এরূপ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হলে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

**(ঘ) পারিভাষিক শব্দ (Use of terminological word) ঃ** প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অনেক সময় পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। যোগাযোগগ্রহীতা পারিভাষিক শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

**(ঙ) সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার (Use of symbolic language) ঃ** সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

**(চ) মিশ্র ভাষার ব্যবহার (Use of different language) ঃ** মিশ্র ভাষাও যোগাযোগের কার্যকারিতায় অন্তরায় সৃষ্টি করে।

**৪। মর্যাদা বা পজিশনগত প্রতিবন্ধকতা (Barriers due to status) ঃ** মর্যাদা ও পজিশন প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিম্নে মর্যাদা বা পজিশনগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

**(ক) পদমর্যাদা ও পজিশন (Status & position) ঃ** নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে বা পজিশন নষ্ট হতে পারে এরূপ কোন তথ্য পরিবেশন করতে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীই আগ্রহী হবেন না। এতে কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

**(খ) মানসিক কাঠামো (Mental structure) ঃ** ব্যক্তির মানসিক কাঠামো ও সংস্কার অনেক সময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, প্রতিটি মানুষই তার পজিশন সম্পর্কে সচেতন থাকে বিধায় সে কোন বিষয় বুঝে নেয়ার আগে মনে মনে পজিশনের কথা চিন্তা করে।

**(গ) সন্দেহ প্রবণতা (Tendency of suspicion) ঃ** ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ প্রবণতা যোগাযোগের উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

**(ঘ) তোষামোদপ্রিয়তা (Flattery) ঃ** তোষামোদপ্রিয়তা যোগাযোগের সঠিক তথ্য প্রেরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কারণ মানুষ সাধারণত ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য তোষামোদপ্রিয়তার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

**(ঙ) আবেগ-অনুভূতির পার্থক্য (Difference between emotion) ঃ** ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আবেগ-অনুভূতির পার্থক্যের জন্য যোগাযোগের সমস্যা দেখা দেয়।

**(চ) আংশিক শ্রবণ (Inattention) ঃ** আংশিক শ্রবণ যোগাযোগের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে।

**(ছ) জ্যেষ্ঠতার ধারণা (Concept of seniority) ঃ** সংগঠন কাঠামোতে এমন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মচারী থাকে যারা কাজকর্মের প্রতি উদাসীন অথচ সুবিধা ভোগের বেলায় সর্বাগ্রে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে তারা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ও তথ্য বিনিময়ে ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**৫। পরিবর্তন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা (Barriers due to resistance to change) ঃ** প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা যে কোন ধরনের পরিবর্তন প্রতিরোধে জন্য সচেষ্ট থাকে। পরিবর্তন প্রতিরোধের এ ধরনের প্রবণতা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) পরিবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণ না করে পূর্বাবস্থা অনুসরণ করা;

(খ) নতুন ভাবধারা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;

(গ) বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের অমনোযোগিতা প্রদর্শন;

(ঘ) নিজস্ব মত প্রচারের প্রবণতা;

(ঙ) বার্তাগ্রাহকের অবহেলো বা খামখেয়ালীপনা অর্থাৎ তার প্রতিষ্ঠিত ধারণার বাইরের সবকিছুর প্রতি অজ্ঞতা ও অবহেলা প্রদর্শন করা।

**৬। যোগাযোগের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা (Other barriers) ঃ**

**(ক) সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব (Lack of proper planning) ঃ** যোগাযোগের সফলতার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে যোগাযোগের সাফল্যের পথে অন্তরায় দেখা দিতে পারে।

**(খ) তথ্যের দুর্বোধ্যতা (Information difficult to understand) ঃ** কখনও কখনও কোন সহজ বিষয়েও তথ্য উপস্থাপন করার সময় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ ব্যাকরণের ভুল প্রয়োগ, ধারণার দুর্বলতা, ভাষাগত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি, যা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**(গ) অনৈক্য বা বেসুরো (Disunion) ঃ** কোন ব্যক্তি যখন তার পূর্ববিশ্বাসের সাথে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য কোন কাজ করে তখন এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় যা যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে।

**(ঘ) কর্মব্যস্ততা (Anxioas to work) ঃ** অধিক কর্মব্যস্ততার কারণে ব্যবস্থাপক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সব কাজে সমান মনোযোগ দিতে পারেন না। ফলে সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাজেই অধিক কর্মব্যস্ততা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**(ঙ) দুর্বল উদ্দেশ্য (Poor objectives) ঃ** সংগঠনের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা থাকলে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয় এবং যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে পড়ে।

**(চ) ভৌগোলিক সমস্যা (Geographical problem) ঃ** অনেক সময় যোগাযোগকারী ও যোগাযোগগ্রহীতার অবস্থানগত দূরত্ব বা ভৌগোলিক দূরত্ব অধিক হলে যোগাযোগের কার্যকারিতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

**(ছ) অব্যক্ত অনুমিতি (Unexpressed view) ঃ** বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের বক্তব্য উভয়েই যদি পরিষ্কারভাবে না বুঝে কোন অমূলক ধারণা পোষণ করেন, তাহলে এরূপ অব্যক্ত অনুমিতি বা ধারণা দুই পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারে। এতে যোগাযোগ বিকৃত হয়ে পড়ে।

**(জ) প্রতারণা (Deceiving) ঃ** প্রতারণাও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় যে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন কোন কর্মচারী প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যের সঠিক অর্থকে আড়ালে রেখে নিজের মনগড়া তথ্য পরিবেশন করে।

এছাড়াও ক্ষমতার পার্থক্য, বিষয়বস্তুর গরমিল, উদ্দেশ্যের দোদুল্যমানতা, একাগ্রতার অভাব, সময়ের স্বল্পতা, নিম্নমানের তদারকী ব্যবস্থা, সমন্বয়ের অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব, কার্যগত সুবিধা ইত্যাদি সুষ্ঠু ও কার্যকর যোগাযোগের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ কাজ করে।

## ৯.৩ উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় (Ways for Overcoming Barriers to Good Communication) ঃ

উত্তম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নোক্ত উপায়ে দূরীকরণ করা যেতে পারে ঃ

**১। সাংগঠনিক কাঠামোর পুর্নবিন্যাস (Re-organization) ঃ** সংগঠনের কাঠামোগত জটিলতার কারণে অনেক সময় যোগাযোগ কার্য বিঘ্নিত হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে এমনভাবে সরলীকরণ ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে যাতে বার্তাপ্রেরক ও প্রাপকের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস পায় এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হতে পারে।

**২। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Particular planning) ঃ** যোগাযোগের একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা আবশ্যক। যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বেই যোগাযোগের বিষয়বস্তু, বার্তাপ্রেরণ বা উপস্থাপন পদ্ধতি, স্থান, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে এর প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দূর করা যায়।

**৩। সঠিক নীতি নির্ধারণ (Adapted right policies) ঃ** ফলপ্রসূ যোগাযোগের জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রবাহের সঠিক ও যথোপযুক্ত পলিসি নির্ধারণ করতে হবে। এতে যোগাযোগ বার্তার সুষ্ঠুপ্রবাহ নিশ্চিত হবে।

**৪। সঠিক ধারণা অর্জন (Achive proper concept) ঃ** যোগাযোগের কৃতকার্যের জন্য বার্তাপ্রেরককে বার্তাগ্রাহকের জগৎ সম্পর্কে অর্থাৎ যোগাযোগ গ্রহীতার শিক্ষাদীক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও অনুভূতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জন করতে হবে।

**৫। যোগাযোগ প্রশিক্ষণ (Communication training) ঃ** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদেরকে যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় ও কলা-কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে পারলে যোগাযোগের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে।

**৬। উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন (Select right way) ঃ** যোগাযোগের ফলপ্রসূতা অনেকাংশে উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। বার্তাগ্রাহকের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যোগাযোগের মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত। এতে যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

**৭। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (Development management) ঃ** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব। অধস্তন কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্বার্পণ ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করা যায়।

**৮। কথায় ও কাজে মিল রাখা (Harmony between works & words) ঃ** কথা ও কাজের মধ্যে মিল না থাকলে যোগাযোগে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে যোগাযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই যোগাযোগের সফলতা নিশ্চিত করতে হলে যোগাযোগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে হবে।

**৯। কার্যকরী শ্রবণ নিশ্চিতকরণ (Effective listening) ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহক উভয়কেই উভয়ের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। তাহলেই যোগাযোগের সফলতা আসবে।

**১০। ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা (Awareness in using language) ঃ** যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন সহজসরল বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে, যাতে বক্তব্য বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়।

**১১। কর্মী সমাবেশ (Gathering of employee) ঃ** যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কর্মচারী সমাবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

**১২। প্রাথমিক পরিচয় দান (Introducing) ঃ** নব-নিযুক্ত কর্মচারীগণকে কার্যে যোগদানের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করানো উচিত। এতে তারা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারে এবং যোগাযোগের সময় তাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারে।

**১৩। অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন (Establish informal relation) ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়রত বিভিন্ন পক্ষ মাঝেমধ্যে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক, প্রীতিভোজ, পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠান, চা-চক্র প্রভৃতিতে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত বা সম্ভাব্য বাধা দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

**১৪। ফলাবর্তন ব্যবস্থার প্রয়োগ (Applied feed back system) ঃ** 'ফলাবর্তন' যোগাযোগকে সার্থক করে তোলার জন্য সহায়তা করে। এই ব্যবস্থায় বার্তাপ্রেরক গ্রাহকের নিকট থেকে বার্তার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে কিনা বুঝে নেয় এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

**১৫। প্রতারণা পরিহার (Reject deceiving) ঃ** যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার প্রতারণা, মিথ্যাচারিতা বা অবাঞ্ছিত কৌশল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

**১৬। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (Interpersonal relation) ঃ** প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের উপর সুষ্ঠু যোগাযোগ নির্ভরশীল। তাই সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

**১৭। প্রয়োজনীয় আতিশয্য অবলম্বন (Follow essential intensity) ঃ** যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে যোগাযোগকারী কিছুটা আতিশয্য অবলম্বন করতে পারেন। এতে যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট জটিল বক্তব্যও সহজবোধ্য হয়ে উঠবে এবং যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

**১৮। ভ্রান্ত ধারণা ও মনোভাব পরিহার (Reject wrong concept & attitudes) ঃ** যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রান্ত ধারণা ও মনোভাব পরিহার করতে হবে।

**১৯। স্বর নিয়ন্ত্রণ (Control voice) ঃ** মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বক্তার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি যোগাযোগের কার্যকারিতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই এরূপ যোগাযোগের সফলতার জন্য বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

**২০। যোগাযোগ মূল্যায়ন (Evaluation communication) ঃ** যোগাযোগের ফলপ্রসূতার জন্য এর উদ্দেশ্য ও অর্জিত ফলাফলের মূল্যায়ন আবশ্যক। এতে যোগাযোগের ত্রুটি দূর করার দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়।

উপরোক্ত উপায়গুলো ছাড়াও যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ উন্নয়ন ব্যবস্থাপকদের তথ্য ভারাক্রান্ত অবস্থার নিরসন, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্দেশ্যের দ্বৈততা পরিহার, সুষ্ঠু ব্যাখ্যাসহ সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। এগুলো সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হলে যোগাযোগের বাধা অনেকাংশে দূর হবে।

## অনুশীলনী-৯

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্ত বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে বা যোগাযোগের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন করতে হলে কতকগুলো শর্ত পালন করতে হয়, এগুলোকে উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্ত বা গুণাবলি বলা হয়।

**২। যোগাযোগ কার্যকে সফল করতে যোগাযোগকারীর কী সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ কার্যকে সফল করতে হলে যোগাযোগকারী উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্ত বা গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

**৩। যোগাযোগের উদ্দেশ্য কখন ব্যর্থ হয়?**

**উত্তর ঃ** চিন্তা থেকে যোগাযোগের উৎপত্তি। এই চিন্তাধারা সঠিক না হলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য তথা সম্পূর্ণ যোগাযোগই ব্যর্থ হয়।

**৪। যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্য অর্থহীন হয় কীসের মাধ্যমে?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের সার্থকতা নির্ভর করে বার্তাপ্রেরকের বক্তব্যের সাথে এর বাস্তব প্রয়োগের ওপর। কথায় এক আর কাজে আর এক হলে যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

**৫। বার্তাগ্রাহকের নিকট হতে অনেক সময় কেন প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না?**

**উত্তর ঃ** মানুষ যখন যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এরূপ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় বার্তাগ্রাহকের নিকট হতে প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না।

**৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পূর্ণ হয়?**

**উত্তর ঃ** ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। কেননা এর মাধ্যমে বার্তাগ্রাহকের বার্তা প্রাপ্তির সংবাদ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়।

**৭। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার কীভাবে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর ঃ** বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা বিভিন্ন রকম। এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকজন বুঝতে পারে না। তাই আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

**৮। যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ কী?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ হচ্ছে বার্তা প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের স্বার্থ বজায় রেখে যোগাযোগ স্থাপন করা।

**৯। উত্তর যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যেসব সমস্যা বা বাধা যোগাযোগের স্বাভাবিক গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাকে যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা বলে।

**১০। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্য থেকে যে অন্তরায় বা বাধার সৃষ্টি হয় তাকে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা বলে।

**১১। উত্তম যোগাযোগ বলতে কী বুঝ?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে হলে এবং যোগাযোগের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন করতে গেলে কতকগুলো অপরিহার্য গুণাবলি বা শর্তাবলির সমাবেশ ঘটলে তাকে উত্তম যোগাযোগ বলে।

**১২। কখন যোগাযোগ মূল্যহীন হয়ে পড়ে?**

**উত্তর ঃ** যখন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কথা ও কাজের ভিন্নতা দেখা দেয় তখন যোগাযোগ মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

**১৩। ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানের আয়না কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নীতিকে ব্যবস্থাপনার জ্ঞানের আয়না বলা হয়।

**১৪। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কী?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ভাষাগত কারণে যে সমস্যা বা অন্তরায় সৃষ্টি হয় তাকে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা বলে।

**১৫। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে গ্রাহক সহজে বুঝতে পারে এমন সহজ, সরল ও সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

## ▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি কী?** [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৩(T), ১৪]
**অথবা, উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

**উত্তর ঃ** উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ

১। যোগাযোগের পূর্বে ধারণার শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।
২। যোগাযোগের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।
৩। যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা থাকতে হবে।
৪। উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।
৫। গ্রাহক সনাক্ত করে যোগাযোগ পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।
৬। বার্তার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।

৭। যোগাযোগের বার্তার বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হতে হবে।
৮। বার্তার বিষয়বস্তু ভুল-ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।
৯। ফলাবর্তন ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
১০। ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
১১। যোগাযোগে প্ররোচনার উপাদান থাকতে হবে।
১২। যোগাযোগের মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে হবে।

[বাকাশিবো-২০০৫]

**২। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বার্তা বা তথ্যের কোন ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি কিংবা বিকৃতি বা পরিবর্তন যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য বা স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করলে তাকে যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বা ভাবের বিনিময় করে থাকে। তথ্যের এই বিনিময় প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের অবস্থানগত বা অন্য কোন কারণে বলা ও শুনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কিংবা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে যোগাযোগের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং তথ্য পরিবেশনায় বিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং, যে সব সমস্যা বা বাধা যোগাযোগের স্বাভাবিক গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদেরকে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা বলে।

**৩। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে প্রধানত কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

**উত্তর** যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা
২। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা
৩। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা
৪। মর্যাদা বা পজিশনগত প্রতিবন্ধকতা
৫। পরিবর্তন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এবং
৬। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা।

[বাকাশিবো-২০০৪]

**৪। যোগাযোগের সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?**

**উত্তর** যোগাযোগের সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো হল ঃ

১। সাংগঠনিক পরিবেশ
২। সংগঠন স্তরের আধিক্য
৩। নীতির অভাব
৪। সংগঠন কাঠামোর অনিয়ম
৫। যোগাযোগ গতিপথের অস্পষ্টতা
৬। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টনে অসমতা
৭। ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক
৮। তত্ত্বাবধায়কদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা
৯। জটিল সংগঠন কাঠামো।

বাকাশিবো-২০০৫]

**৫। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো কী?**

**উত্তর** যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। সাংগঠনিক কাঠামোর পুণর্বিন্যাস
২। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা
৩। সঠিক নীতি নির্ধারণ
৪। সঠিক ধারণা অর্জন
৫। যোগাযোগ প্রশিক্ষণ
৬। উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন
৭। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন
৮। কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখা
৯। কার্যকরী শ্রবণ নিশ্চিতকরণ
১০। ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা
১১। কর্মী সমাবেশ
১২। প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দান
১৩। অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন
১৪। ফলাবর্তন ব্যবস্থার প্রয়োগ
১৫। প্রতারণা পরিহার
১৬। আন্তঃব্যক্তিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক
১৭। প্রয়োজনীয় আতিশয্য অবলম্বন
১৮। ভ্রান্ত ধারণা ও মনোভাব পরিহার
১৯। স্বর নিয়ন্ত্রণ
২০। যোগাযোগ মূল্যায়ন।

**৬। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা কীভাবে সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের বিনিময় প্রক্রিয়ায় বার্তাপ্রেরক ও বার্তাগ্রাহকের অবস্থানগত বা অন্য কোন কারণে বলা ও শুনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে যা থেকে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যোগাযোগের এরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে যোগাযোগের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত এবং তথ্য পরিবেশনায় বিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

**৭। কী কী কারণে যোগাযোগের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়?**

**উত্তর ঃ** সমাজের বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকজন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত থাকে। তাদের কৃষ্টি, আচার-আচরণ, শিক্ষাদীক্ষা, পছন্দ-রুচি ইত্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণগত বিভিন্নতার কারণে যোগাযোগের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

**৮। পূর্ব নির্ধারিত ধারণা কীভাবে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?**

**উত্তর ঃ** সাধারণত মানুষ তার ধারণা অনুযায়ী ফলাফল আশা করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তা নির্বিচারে প্রয়োগ করা হলে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে।

**৯। লালফিতার দৌরাত্ম্য কী?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর ঃ** লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে মূলত দীর্ঘ সূত্রিতাকে বুঝায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এরূপ দীর্ঘ সূত্রিতা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অফিসের ফাইলপত্র সাধারণত লালফিতা দিয়ে বেঁধে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সংগঠন কাঠামোর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে ফাইলপত্র উদ্দীষ্ট স্থানে পৌছাতে অনেক সময় লাগে। একেই লালফিতার দৌরাত্ম্য বলা হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেতে পারে। লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে অনেক সময় ঘুষ প্রথাকেও বুঝায়। কারণ অফিসের ফাইলপত্র দ্রুত কার্যোপযোগী করতে বাধ্য করা হয় ঘুষ আদান-প্রদানে।

**১০। উত্তম যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ অপরিহার্য– ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর ঃ** প্রতিষ্ঠানের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সফলতার সাথে অর্জন করতে হলে উপযুক্ত সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। সময়মত যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারলে অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যোগাযোগের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে বা সঠিক সময়ের পূর্বে যোগাযোগ করা হলে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। তাই উত্তম যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ অপরিহার্য।

**১১। যোগাযোগের ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা কর।** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭]

**উত্তর ঃ** ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থেকে যোগাযোগে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। নিম্নে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দেয়া হল ঃ

(ক) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব।
(খ) মানবীয় ধারণা।
(গ) পূর্বনির্ধারিত ধারণা।
(ঘ) প্রত্যক্ষণ।
(ঙ) পক্ষপাতিত্ব।
(চ) কপটতা ও অবিশ্বাস।
(ছ) ভয়ভীতি।

**১২। যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানের কী অসুবিধা হয়?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮]

**উত্তর ঃ** যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো দেখা যায় ঃ

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়।
(খ) প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের ধাপ অধিক হয় যা তথ্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
(গ) নীতিগত অভাব দেখা দিতে পারে।
(ঘ) যোগাযোগের গতিপথের অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে।
(ঙ) উর্ধ্বতন অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়।
(চ) প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামো নিজ থেকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১৩। **যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান/মৌলিক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। তথ্যের উৎস্য।
২। যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক।
৩। উদ্দেশ্য।
৪। উপলক্ষ্য বা ঘটনা।
৫। ধারণা।
৬। এনকোডিং বা প্রেরণযোগ্য করে সাজানো।
৭। প্রকাশ।
৮। যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তাপ্রাপক।
৯। বার্তা বা সংবাদ প্রেরণ।
১০। ডিকোডিং বা গ্রহণযোগ্য করে সাজানো।
১১। প্রত্যুত্তর বা ফলাবর্তন।

১৪। **যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো লেখ।** [বাকাশিবো-২০১০, ১১, ১২]

**উত্তর** যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ–

ক. দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার
ঘ. পারিভাষিক শব্দ
খ. দ্ব্যর্থবোধক শব্দ
ঙ. সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার
গ. আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার
চ. মিশ্র ভাষার ব্যবহার

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্তসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর সংকেত** ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। সার্থক যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫]

**উত্তর সংকেত** ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য গুণাবলি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, পরি-১০]

**উত্তর সংকেত** ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্ধারণ কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** ৯.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। ফলপ্রসূ যোগাযোগের বাধাসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৯.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। কার্যকর যোগাযোগের অন্তরায়গুলো কী? বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** ৯.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। কার্যকর যোগাযোগের পথে কী কী সমস্যা দেখা দেয়?

**উত্তর সংকেত** ৯.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। দুর্বল যোগাযোগের কারণগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৯.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের উপায়সমূহ লিখ। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, পরি-১১]

**উত্তর সংকেত** ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



*******

# অধ্যায়-১০

# প্রতিবেদন লিখন
# (Report Writing)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*১০.০ সূচনা; ১০.১ প্রতিবেদন, কারবার প্রতিবেদন ও কারিগরি প্রতিবেদনের সংজ্ঞা; ১০.২ উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি; ১০.৩ প্রতিবেদন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ; ১০.৪ কারিগরি প্রতিবেদনের প্রধান অংশসমূহ; ১০.৫ কারিগরি প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্য; ১০.৬ কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ*

## ১০.০ সূচনা (Introduction) ঃ

"প্রতিবেদন" শব্দটির দ্বারা কোন বিষয় বা কোন ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা বা বিবরণীকে বুঝানো হয়ে থাকে। সাধারণত কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা কোন ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাটি সুসংগঠিত উপায়ে বর্ণনাকেই বলা হয় প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। প্রতিবেদনকে বিবরণীও বলা হয়ে থাকে। প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরির বিষয়টি বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। আগেকার দিনে রাজা বাদশাহদের আমলে বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের শেষে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামসহ যাবতীয় বিষয়াদির পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণী রাজাবাদশাহদের নিকট উপস্থাপন করা হতো বা উপস্থাপনের প্রচলন ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিবেদন বা বিবরণীর প্রচলনের বিষয়টি অত্যন্ত প্রাচীন। কালক্রমে এর পরিধি, আকার, আয়তন, উপস্থাপনা কৌশল ইত্যাদিতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রেই বিবিধ বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

বিবিধ প্রয়োজন ও সমস্যাসমূহের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। মূলত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব, রচনা কৌশল, উদ্দেশ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং এই বিভিন্নতা থেকেও প্রতিবেদনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কারিগরি প্রতিবেদন এক প্রকার বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন। শিল্পকারখানার বিভিন্ন সমস্যা, কার্যপ্রকৃতি, সময়ের তাৎপর্য, পাঠক ও উপস্থাপন কৌশলের উপর ভিত্তি করে কারিগরি প্রতিবেদনও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ হতে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, কার্যকারিতা, আবেদন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়।

## ১০.১ প্রতিবেদন, কারবার প্রতিবেদন ও কারিগরি প্রতিবেদনের সংজ্ঞা (Define report, business report & technical report) ঃ

**প্রতিবেদন (Report) ঃ** কোন খবর, ঘটনা বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনাকে বলা হয় প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। প্রতিবেদনের ইংরেজি 'Report' শব্দটি ফরাসি 'Rapportars' শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। আবার কারো কারো মতে ইংরেজি 'Report' শব্দটি ল্যাটিন 'Reportare' শব্দ হতে এসেছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। 'Reportare' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'To carry back' অর্থাৎ কোন কিছু বহন করার জন্য বা বলার জন্য ফিরে আসা। মূলত Report শব্দটি কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিবরণী তৈরি করে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে রিপোর্ট বলতে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য, মতামত, সংবাদাদির বিবরণ সুন্দরভাবে উপস্থাপনকে বুঝায়।

**George. R. Terry** রিপোর্ট-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "রিপোর্ট হল তথ্য বিবরণী সংবলিত এমন একটি সংক্ষিপ্তসারের আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা যার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্ভব হয়"।

**Prof mike Hatch**-এর মতে "প্রতিবেদন হল একটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি বা কোন বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনা বিশেষ। এটা যথেষ্ট সতর্কতা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রস্তুত করা হয়।"

**অধ্যাপক পিটার লিটল**-এর মতে, "প্রতিবেদন হল এমন একটি বিবরণী যাতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বিষয়ের বিবৃতি থাকে এবং সুপারিশ এবং উপসংহার এর সাথে যুক্ত হয়।"

সুতরাং, উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রিপোর্ট একটি বিশেষ মাধ্যম যা কোন সংগঠিত তথ্যের পুনঃপ্রকাশনা এবং লেখক কর্তৃক পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হওয়ার পর যথেষ্ট যত্ন সহকারে তৈরি ও প্রকাশিত বিবরণী বিশেষ।

**কারবার প্রতিবেদন (Business report) ঃ** কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিবেদনকে বলা হয় কারবার প্রতিবেদন বা Business report. কোন কারবারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর সঠিক তথ্য, উপাত্ত, অবস্থা, সিদ্ধান্ত, কার্যাবলি, ঘটনা ও ফলাফল সম্বন্ধে যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা বিবরণী প্রকাশ করা হয় এটাই কারবার প্রতিবেদন নামে অভিহিত। কারবার প্রতিবেদন কারবার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন– উৎপাদন, বণ্টন, ক্রয়-বিক্রয় এবং পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদানের সাথে জড়িত। মোটকথা কারবার প্রতিবেদন হল নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক কার্য বা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যাবলির সুসংবদ্ধ উপস্থাপন।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, কারবার সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বা অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণপূর্বক ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে যে সুসংবদ্ধ ও বাস্তবভিত্তিক বিবৃতি উপস্থাপন করা হয় তাকেই কারবার প্রতিবেদন বলে। কারবার প্রতিবেদনকে কারবারের রিপোর্টও বলা হয়ে থাকে।

**কারিগরি প্রতিবেদন (Technical report) ঃ** সহজ কথায়, কারিগরি বিশেষজ্ঞ বা প্রকৌশলী কর্তৃক রচিত প্রতিবেদনকে বলা হয় কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্ট। কোন শিল্পকারখানায় কর্মরত প্রকৌশলী, কারিগরদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের থেকে রিপোর্ট নেয়া হয়। সুতরাং, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে কোন প্রকৌশলী বা কারিগর কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনকে কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্ট বলা হয়ে থাকে। কারিগরি প্রতিবেদনে কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রকৌশলী ডঃ একে এম জয়নুল আবেদীন এর মতে, "কোন প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিবিদ কর্তৃক কারিগরি তথ্য বা বিষয় সম্পর্কে প্রণীত সংক্ষিপ্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ বিবরণীকে কারিগরি প্রতিবেদন বলা হয়।"

## ১০.২ উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of a Good Report) ঃ

একটি আদর্শ বা উত্তম প্রতিবেদনে যে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

**১। নির্দিষ্ট কাঠামো (Definite structure) ঃ** একটি উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি হল একট নির্দিষ্ট কাঠামো ও গঠনরীতি অনুসরণ করা। অর্থাৎ একটি আদর্শ প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকবে।

**২। নিরপেক্ষতা (Neutrality) ঃ** প্রতিবেদনে যে সমস্ত বিষয় বা তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে তা অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ পরিহার করে চলা প্রয়োজন।

**৩। ইতিবাচক বিবৃতি (Positive statement) ঃ** প্রতিবেদনে প্রণীত বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ কারণে প্রতিবেদনে নেতিবাচক বিবৃতি না থাকাই যুক্তিসঙ্গত।

**৪। সততা (Honesty) ঃ** একটি উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি হল এর সততার বিষয়। অর্থাৎ আদর্শ প্রতিবেদনে কোন নির্দিষ্ট পূর্ব ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা থাকবে।

**৫। যুক্তিসঙ্গত (Rational) ঃ** উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের বিবৃতি যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। অযৌক্তিক এবং এলোমেলো কোন বিষয় উত্তম প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না।

**৬। সংক্ষিপ্ততা (Conciseness) ঃ** প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়ের বিবৃতি বা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য সংক্ষিপ্ততার জন্য যেন মূল্যবান তথ্য বাদ না যায় সেদিকেও নজর দিতে হবে।

**৭। অনুচ্ছেদ ব্যবহার (Use paragraph) ঃ** প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুকে কার্যকর, আকর্ষণীয় এবং সর্বোপরি গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিবেদনের বক্তব্যকে কতকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে লেখা প্রয়োজন। এতে প্রতিবেদনের গতিময়তা বজায় থাকে। অনুচ্ছেদ ব্যবহার করার কারণে ইহা সহজে বোধগম্য হয়।

**৮। সুস্পষ্টতা (Clearness) ঃ** উত্তম বা আদর্শ প্রতিবেদনের একটি বিশেষ গুণ হল এর সুস্পষ্টতা। প্রতিবেদনে লিখিত বিবৃতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে। অপরিকল্পিত এবং অস্পষ্ট বিবৃতি সম্বলিত প্রতিবেদন কখনই উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হয় না।

**৯। লিখিত (Written) ঃ** প্রতিবেদন লিখিত আকারে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। লিখিত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের প্রয়োজনে দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানে সমর্থ হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কলাকৌশলে লিখিত প্রতিবেদন সবার নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

**১০। ভাষা (Language) ঃ** উত্তম ও আদর্শ প্রতিবেদনের ভাষা সহজ-সরল ও অলংকার বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিবেদনের ভাষা যেন কোন পক্ষের অনুভূতিকে আহত না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

**১১। পূর্ণাঙ্গতা (Completeness) ঃ** প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি থাকা প্রয়োজন। প্রণীত প্রতিবেদনটি অবশ্যই তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। বলা যায় যে, অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মূল আবেদনই বিনষ্ট করে দেয়।

**১২। সুবোধ্যতা (Easily understood) ঃ** উত্তম ও আদর্শ প্রতিবেদনের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ হলো এর সুবোধ্যতার বিষয়টি। অর্থাৎ প্রতিবেদন সুবোধ্য হতে হবে। দুর্বোধ্য শব্দ বা ভাষা প্রতিবেদনে ব্যবহার করা অবাঞ্ছনীয়। সুবোধ্যতা না থাকলে প্রতিবেদনের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

**১৩। সঠিক তারিখ (Accurate date) ঃ** প্রতিবেদন লেখার তারিখ এবং এতে বর্ণিত ঘটনাবলির তারিখ সঠিক হতে হবে। প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সঠিক ও যথাযথ তারিখের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ।

**১৪। উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion & recommendation) ঃ** উত্তম ও আদর্শ প্রতিবেদনের অপরিহার্য গুণাবলি হলো প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠ উপসংহার এবং প্রতিবেদকের সুপারিশ। প্রতিবেদনের শেষাংশে প্রতিবেদকের মন্তব্য ও সুপারিশসহ উপসংহার থাকা প্রয়োজন।

**১৫। স্বাক্ষর ও পরিচয় (Signature & idestity) ঃ** একটি উত্তম ও আদর্শ প্রতিবেদনে অবশ্যই লেখকের স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের স্বাক্ষর না থাকলে প্রতিবেদনটি অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। প্রতিবেদনটি কে বা কাদের দ্বারা উপস্থাপন করা হল তাও উল্লেখ করা উচিত।

## ১০.৩ প্রতিবেদন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ (Factors to be considered while drafting a Report) ঃ

একটি প্রতিবেদনকে কার্যকর, গতিশীল এবং সর্বোপরি আকর্ষণীয়ভাবে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করার প্রয়োজনে প্রতিবেদন প্রণয়নকারীকে প্রতিবেদন রচনার সময় অবশ্যই কতকগুলো উপাদান বা বিষয় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হয়। প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর দিকে প্রতিবেদককে দৃষ্টি দিতে হয় ঃ

১। নির্দিষ্ট কাঠামো
২। নির্দিষ্ট ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বিবরণ
৩। প্রথম পুরুষের ব্যবহার
৪। নিরপেক্ষতা
৫। ইতিবাচক বিবৃতি
৬। অনুচ্ছেদ
৭। পূর্ণাঙ্গতা
৮। সংক্ষিপ্ততা
৯। সুস্পষ্টতা
১০। ভাষা
১১। নক্শা/রেখচিত্র
১২। উপযুক্ত শিরোনাম
১৩। লিখিত
১৪। বাস্তবতার আলোকে প্রণয়ন
১৫। উপসংহার ও সুপারিশ
১৬। স্বাক্ষর ও পরিচয়।

নিম্নে উল্লেখিত উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। আদর্শ প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রতিবেদন রচনায় নির্দিষ্ট কাঠামোর অনুসরণ করা। নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন রচনা করা হলে রচিত প্রতিবেদনটি সাবলীল, স্পষ্ট, দক্ষ ও গতিশীল হয়ে থাকে।

২। প্রতিবেদনের একটি বিশেষ উপাদান হল প্রতিবেদনে কোন নির্দিষ্ট ঘটনায় সত্যনিষ্ঠ বিবরণ উপস্থাপিত হবে। অর্থাৎ প্রণীত প্রতিবেদনে কোন নির্দিষ্ট অতীত ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বিবরণসমূহ প্রকাশিত হবে।

৩। প্রতিবেদন মূলত প্রথম পুরুষে রচনা করতে হয়। তবে কোন কমিটি বা ব্যক্তি সমষ্টির প্রতিবেদনে 'আমরা' শব্দটি অর্থাৎ বহুবচনের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রতিবেদনে সব সময় অতীতকাল ব্যবহার করাই শ্রেয়।

৪। প্রণীত প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে তা অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ পরিহার করে চলা প্রয়োজন।

৫। প্রণীত প্রতিবেদনে নীতিবাচক বিবৃতি না থাকাই যুক্তিসঙ্গত। নীতিবাচক বিবৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বহুবিধ সমস্যার আবর্তে ফেলে। সুতরাং প্রণীত প্রতিবেদনের বিবৃতিসমূহ যাতে ইতিবাচক হয় সেদিকে প্রতিবেদককে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৬। অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা হলে বিষয়বস্তু পাঠে পাঠকগণ গতিময়তা খুঁজে পায় এবং এ কারণেই প্রতিবেদনের বক্তব্যকে কতকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে লিখতে হবে।

৭। আদর্শ বা উত্তম প্রতিবেদনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে প্রণীত প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গতা বা সম্পূর্ণতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি উপস্থাপিত হতে হবে।

৮। প্রতিবেদনে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্য বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি পাঠকের নিকট অধিক আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভবপর হয়।

৯। প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিবৃতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে। অপরিকল্পিত, অসংলগ্ন প্রতিবেদন পাঠকের নিকট সহজবোধ্য ও পরিচ্ছন্নভাবে বিবৃতি তুলে ধরতে সমর্থ হয় না। এ কারণেই প্রতিবেদনে লিখিত বিবৃতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে।

১০। প্রতিবেদনের ভাষা সহজসরল ও অলংকার বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিবেদনের ভাষা যেন কোন পক্ষের অনুভূতিকে আহত না করে সেদিকে প্রতিবেদককে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

১১। উপস্থাপিত প্রতিবেদনকে পাঠকের নিকট সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় প্রয়োজনবোধে নক্শা, তালিকা, রেখাচিত্র ইত্যাদির ব্যবহার করা প্রয়োজন। নক্শা, রেখাচিত্র ইত্যাদি সময় হ্রাসের পাশাপাশি প্রতিবেদনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।

১২। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত শিরোনাম থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে পাঠক সহজেই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারে। এক কথায় ছোট বড় সকল প্রতিবেদনেই একটি যথার্থ শিরোনাম থাকতে হবে।

১৩। প্রতিবেদন লিখিত হওয়া প্রয়োজন, হাতের লেখা ছাড়াও প্রতিবেদন টাইপকৃত, মুদ্রিত অথবা সাইক্লোস্টাইলকৃত হতে পারে। লিখিত আকারে প্রণীত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের প্রয়োজনে দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানে সমর্থ হয়ে থাকে।

১৪। প্রতিবেদনের একটি বিশেষ উপাদান হল প্রতিবেদনটি বাস্তবতার আলোকে প্রণীত হওয়া। প্রতিবেদন রচনায় যত বেশি নির্ভুল এবং কার্যকর ফলাফল উপস্থাপন করা যাবে প্রণীত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তত বেশি সফলতা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

১৫। আদর্শ ও উত্তম প্রতিবেদনের অপরিহার্য উপাদান হল প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠ উপসংহার ও সুপারিশ। প্রতিবেদনের সম্পূর্ণতার জন্য প্রতিবেদনে উপসংহার এবং প্রতিবেদকের সুপারিশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৬। প্রতিবেদনে অবশ্যই প্রতিবেদন লেখকের স্বাক্ষর ও পরিচয় থাকতে হবে। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের স্বাক্ষর ও পরিচয় না থাকলে প্রতিবেদনটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

## ১০.৪ কারিগরি প্রতিবেদনের প্রধান অংশসমূহ (Components of a technical Report) ঃ

একটি সম্পূর্ণ রিপোর্টকে প্রধানত নিম্নলিখিত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়।

**(ক) প্রারম্ভিক অংশ (Front matter) ঃ**

১। শিরোনাম
২। শিরোনাম পাতা
৩। অনুমতি পত্র
৪। প্রেরণ পত্র
৫। বিষয়বস্তু
৬। সার-সংক্ষেপ।

**(খ) মূল অংশ (Body) ঃ**

১। ভূমিকা
২। মূল বক্তব্য বা সারাংশ
৩। উপসংহার
৪। সুপারিশ।

**(গ) পরিশিষ্টাংশ (Supplementary parts) ঃ**

১। পরিশিষ্ট
২। গ্রন্থ বিবরণী
৩। সূত্রসমূহ
৪। অনুক্রমণী

**(ঘ) অতিরিক্ত অংশ (Additional parts) ঃ**

১। কৃতজ্ঞতা স্বীকার
২। স্বাক্ষর ও পদবী
৩। তারিখ।

● **নিম্নে প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়া হল ঃ**

**(ক) প্রারম্ভিক অংশ (Initial parts of the Report) ঃ**

**১। শিরোনাম (Title) ঃ** ছোট বড় সকল প্রতিবেদনেই শিরোনাম থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সারকথা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনে শিরোনামের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিম্নে একটি প্রতিবেদনের শিরোনামের নমুনা দেয়া হল ঃ

**রাজশাহী জুট মিলস লি ঃ**
সপুরা, রাজশাহী
"২০০৮ সালের অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটনার প্রতিবেদন"

**২। শিরোনামের পাতা (Title page) ঃ** অনিয়মিত ছোট প্রতিবেদনে আলাদা শিরোনাম পাতার প্রয়োজন হয় না। তবে বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে তা অবশ্যই থাকতে হয়। শিরোনাম পাতায় শিরোনামের সাথে প্রতিবেদকের নাম, ঠিকানা ও পদবী ইত্যাদি লেখা থাকে।

**৩। অনুমতিপত্র (Letter of Authorization) ঃ** যার অনুমতিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে তার নিকট হতে প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি অনুমতিপত্র প্রতিবেদনের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়।

**৪। প্রেরণ পত্র (Letter of transmittal) ঃ** এতে প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠককে কিছু ধারণা দেয়া হয়। প্রতিবেদন পড়ার সময় পাঠক যদি প্রতিবেদনের কোন অংশ না বুঝেন, তবে তিনি প্রতিবেদককে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করতে পারেন।

**৫। বিষয়সূচি বা সূচিপত্র (Contents) ঃ** এতে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু উল্লেখ থাকে। প্রতিবেদন পড়ার জন্য এটা পাঠককে নির্দেশনা দিয়ে থাকে। নিম্নে একটি বিষয়সূচি বা সূচিপত্রের নমুনা দেয়া হল ঃ

**সূচিপত্র**

| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|
| অধ্যায়-১ ঃ ভূমিকা | ৩ |
| অধ্যায়-২ ঃ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য | ৪ |
| অধ্যায়-৩ ঃ প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু | ৮ |
| অধ্যায়-৪ ঃ উপসংহার | ২০ |
| অধ্যায়-৫ ঃ সুপারিশসমূহ | ২২ |
| অধ্যায়-৬ ঃ পরিশিষ্ট | ৩০ |
| অধ্যায়-৭ ঃ গ্রন্থপঞ্জী | ৩২ |

**৬। সার-সংক্ষেপ (Summary) ঃ** প্রতিবেদনের এ অংশে মূল প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিবেদনে আলোচিত সমস্ত বিষয়বস্তুর সারাংশ এখানে থাকবে।

**(খ) প্রতিবেদনের প্রধান বা মূল অংশ (Body part of the Report) ঃ**

**১। ভূমিকা (Introduction) ঃ** প্রতিবেদনের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, আওতা, বিষয়-বিন্যাস, রীতি ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা হয়। ছোট প্রতিবেদনের ভূমিকা না হলেও চলে কিন্তু বড় প্রতিবেদনে ভূমিকা বা মুখবন্ধ থাকা অপরিহার্য।

**২। মূল বক্তব্য বা গর্ভাংশ (Body) ঃ** এটা প্রতিবেদনের প্রধান অংশ। প্রতিবেদনের এ অংশে বিভিন্ন শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে বিষয়বস্তু ও তথ্যাবলিকে সুন্দররূপে সাজিয়ে লেখা হয়।

**৩। উপসংহার (Conclusion) ঃ** প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রতিবেদনের উপসংহার। প্রতিবেদনের এ অংশে প্রতিবেদক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর সমগ্র বিষয়টির উপর সংক্ষিপ্তাকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।

**৪। সুপারিশ (Recommendations) ঃ** এ অংশে প্রতিবেদকের সুপারিশ উল্লেখ থাকে। সাধারণত প্রতিবেদন লেখক বা প্রতিবেদকের পদমর্যাদা অনুযায়ী সুপারিশসমূহ নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করতে হয়। তবে প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের সুপারিশ থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

**(গ) প্রতিবেদনের পরিশিষ্টাংশ (The Appendix part of the Report) ঃ**

**১। পরিশিষ্ট (Appendixes) ঃ** প্রতিবেদনের এ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এ অংশে প্রতিবেদনের তথ্যের সূত্র, খবরাখবর, পুস্তক পরিচিতি, নকশা, ছক প্রভৃতি দিতে হয়।

**২। গ্রন্থ বিবরণী (Bibliography) ঃ** প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকা হতে সাহায্য নেয়া হয়েছে লেখকের নামসহ সেগুলোর নাম এখানে দিতে হয়।

**৩। সূত্রসমূহ (Sources) ঃ** প্রতিবেদন প্রণয়নে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য তালিকা করে বা ছকের সাহায্যে হুবহু তুলে ধরা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে যে সকল উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

**৪। অনুক্রমণী (Index) ঃ** অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রতিবেদনে অনুক্রমণী বা নির্ঘন্ট থাকে। এটা সূচিপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুক্রমণীতে কঠিন ও পারিভার্ষিক শব্দাবলি পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করতে হয়।

**(ঘ) অতিরিক্ত অংশ (Supplimentary Part) ঃ**

**১। কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Note of thanks) ঃ** প্রতিবেদন লেখার ব্যাপারে লেখক যাদের থেকে সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছেন তাদের নিকট অনুনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটি প্রচলিত রীতি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিবেদনের সৌজন্যবোধ প্রকাশিত হয়।

**২। প্রতিবেদকের স্বাক্ষর ও পদবী (Signature & position) ঃ** প্রতিবেদনের শেষে প্রতিবেদকের স্বাক্ষর পদবীসহ প্রদান করতে হয়।

**৩। তারিখ (Date) ঃ** প্রতিবেদকের স্বাক্ষর ও পদবী প্রদানের পর প্রতিবেদন প্রণয়নের তারিখ প্রতিবেদনে থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত প্রতিবেদনের নিচে বামপার্শ্বে প্রতিবেদন প্রণয়নের তারিখ উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

## ১০.৪.১ একটি নমুনা প্রতিবেদনের উপাদানসমূহ (Components of a Sample Report) ঃ

একটি প্রতিবেদন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন বা যে সমস্ত উপাদান একটি ভাল প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

**১। নাম পৃষ্ঠা বা শিরোনাম (Title, page or title) ঃ** একটি ভাল রিপোর্টের শিরোনাম বা নাম পৃষ্ঠা সে রিপোর্টের পরিচয় বহন করে। নাম পৃষ্ঠায় সাধারণত রিপোর্টের নাম, প্রণেতার নাম, রিপোর্ট প্রণয়নের তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

**২। অলিখিত পাতা (Fly page) ঃ** মোড়ক এবং নাম পৃষ্ঠার মধ্যবর্তীস্থানে এক অলিখিত পাতা ব্যবহার করা হয়। এটা সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের রিপোর্টের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। এ পাতায় কিছুই লেখা হয় না।

**৩। অভ্যন্তরীণ নাম পৃষ্ঠা (Internal title page) ঃ** অভ্যন্তরীণ নাম পৃষ্ঠা রিপোর্টের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অভ্যন্তরীণ নাম পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে রিপোর্টের পৃথক সত্তার পরিচয় প্রদান করে–

(ক) রিপোর্টের নাম
(খ) লেখকের নাম, অফিসিয়াল পদবী ও ঠিকানা
(গ) প্রাপকের নাম, পদবী ও ঠিকানা
(ঘ) যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা
(ঙ) রিপোর্ট প্রণয়নের স্থান ও তারিখ।

**৪। মুখবন্ধ (Forwarding) ঃ** রিপোর্টে সাধারণত মুখবন্ধ ব্যবহার করা হয়। তবে মুখবন্ধ সচরাচর লেখক নিজে তৈরি করেন না। এটি তার রিপোর্ট প্রসঙ্গে অন্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। রিপোর্ট লেখক কারখানার কর্মচারী হলে কারখানার ব্যবস্থাপক বা কোন পেশাগত সমিতির সদস্য হলে সংস্থার সভাপতি বা ফোরম্যান অথবা ছাত্র হলে শিক্ষক মুখবন্ধ প্রদান করতে পারেন।

**৫। কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) ঃ** রিপোর্টের তথ্য কিংবা রিপোর্ট প্রণয়ন কাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সৌজন্যতাস্বরূপ ঐ সকল ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। রিপোর্টের মুখবন্ধ বা ভূমিকাতেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যায়।

**৬। সূচিপত্র (Index) ঃ** রিপোর্টের বিভিন্ন স্থান আলোচিত বক্তব্যের পরিচয় দেয়ার জন্য সূচিপত্র দেয়া হয়। সমগ্র রিপোর্টের কোন পৃষ্ঠার কোন স্থানে কী কী বিষয় দেয়া আছে, সূচিপত্রে তার উল্লেখ থাকে।

**৭। সারাংশ (Abstract) ঃ** একটি সম্পুর্ণ রিপোর্ট পূর্ণভাবে ব্যস্ত পাঠক পড়ার সুযোগ নানাবিধ কারণে হয় না। এজন্য রিপোর্টের প্রারম্ভে মূল বক্তব্যের সারকথা থাকে। যেন পাঠক সারাংশ দেখিয়ে রিপোর্ট সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারে।

**৮। মূল বক্তব্য (Body) ঃ** একটি রিপোর্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মূল বক্তব্য। লেখকের উপস্থাপনায় এখানেই রিপোর্টটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। লেখককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে হয়। মূল বক্তব্যকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য এ অংশে বিভিন্ন শিরোনাম, অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়।

**৯। সমাপ্তি (Conclusion) ঃ** একটি রিপোর্টের মূল বক্তব্য থেকে বস্তু-সংক্ষেপ বের করে ঐ বস্তু-সংক্ষেপ থেকে সর্বশেষ মন্তব্য করাই সমাপ্তি। পরিসমাপ্তির রচনায় লেখককে যত্নবান হতে হয়। পরিসমাপ্তি যত সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে, রিপোর্টটি পাঠকের কাছে ততই আবেদন সৃষ্টি করবে।

**১০। সুপারিশ (Recomendation) ঃ** রিপোর্টের উদ্দেশ্য, ফলাফল এবং রিপোর্ট সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করাকে সুপারিশ বলা হয়। উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের মতামত রিপোর্টের মাধ্যমে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করেন এবং ঐ মতামত বা সুপারিশের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

**১১। পাদটীকা (Footnote) ঃ** রিপোর্টের বক্তব্য অংশে অনেক শব্দ, পদ, বাক্য বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যা অনেক সময় পাঠক সহজে বুঝতে পারে না। এজন্য কোন দুর্বোধ্য শব্দ, পদ, নাম, বাক্যাংশ বা চিহ্ন সম্পর্কে এর প্রকৃত অর্থ পাঠকের উপলব্ধির সুবিধার্তে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে। বক্তব্যের যে নির্দিষ্ট স্থানে ঐ সকল বিশেষ শব্দ বা চিহ্নের ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে পাদটীকা বা Footnote বলে।

**১২। বিশেষ সূচিপত্র (Index) ঃ** সাধারণত দীর্ঘ রিপোর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ সূচিপত্র ব্যবহৃত হয়। রিপোর্টের বক্তব্য অংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ (Term) যার অর্থ সহজবোধ্য নয়, সে সমস্ত শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা বর্ণমালাক্রমে সাজিয়ে রিপোর্টের শেষে উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্টের কোন কোন পৃষ্ঠায় ঐ সকল প্রয়োজনীয় শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে, সে সকল পৃষ্ঠা নম্বর সে সূচিপত্রে উল্লেখ থাকে।

**১৩। পরিশিষ্ট (Appendix) ঃ** দীর্ঘ রিপোর্টের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট ব্যবহার করা হয়। একটি রিপোর্ট তৈরি করতে অনেক তালিকা, নকশা, সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পরিশিষ্ট শিরোনাম থাকে। ইংরেজি বা বাংলা বর্ণমালা সূচি অনুযায়ী সাজিয়ে তা প্রকাশ করা হয়।

**১৪। সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ঃ** যে কোন গবেষণামূলক কারিগরি রিপোর্ট বা প্রবন্ধ লিখতে অনেক সময় বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয় চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

## ১০.৫ কারিগরি প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Technical Report and General Report) ঃ

| কারিগরি প্রতিবেদন | সাধারণ প্রতিবেদন |
|---|---|
| ১। কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্টের বিষয়বস্তু বা তথ্য মূলত কারিগরি উপায়ে কারিগরি ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। | ১। সাধারণ প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করতে এরূপ কারিগরি পন্থা অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে না। |
| ২। কারিগরি প্রতিবেদন এক প্রকার তথ্য সম্বলিত দলিল। এ প্রতিবেদন জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয় না। | ২। অনেক সাধারণ রিপোর্টই জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রচারিত হয়। |
| ৩। টেকনিক্যাল রিপোর্টের আকৃতি ও গঠন প্রণালী সাধারণ প্রতিবেদন থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। আনুষ্ঠানিক কারিগরি প্রতিবেদনে প্রাথমিক আলোচনা, সুপারিশ, উপসংহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। | ৩। সাধারণ প্রতিবেদন-এর নিজস্ব গঠনপ্রণালি থাকে। যেমন– সংবাদপত্রের রিপোর্ট, পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি স্বস্ব গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী তৈরি করা হয়। |
| ৪। কারিগরি প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের কারণে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী বা কারিগরের পক্ষেই এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব। | ৪। অন্য পেশায় নিয়োজিত বা কারিগরি শিক্ষা বহির্ভূত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব। এর জন্য কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। |
| ৫। সাধারণত টেকনিক্যাল রিপোর্টের পাঠক সংখ্যা সীমিত। | ৫। সাধারণ রিপোর্টের পাঠক সংখ্যার কোন সীমা নেই। |

## ১০.৬ কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ (Prepare of Technical Report) ঃ

কোন শিল্প কারখানায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ঐ দুর্ঘটনার উপর কারিগরি প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তা হতে দুর্ঘটনার কারণ, ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, ব্যাপ্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলে চিকিৎসা খরচ, বীমার টাকা ইত্যাদি সম্পর্কে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

**দুর্ঘটনা রিপোর্টের নমুনা ঃ**

আহত কর্মচারীর নাম ঃ বিভাগ ঃ পদ ঃ

ঠিকানা ঃ বয়স ঃ বৈবাহিক অবস্থা ঃ

মোট নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ঃ বর্তমান চাকরির মেয়াদ ঃ

দৈনিক / সাপ্তাহিক / মাসিক মজুরি ঃ

---

দুর্ঘটনার তারিখ ঃ সময় ঃ

স্থান ঃ

দুর্ঘটনার বিবরণ ঃ

গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ঃ

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব ছিল কিনা ঃ

---

আহত ব্যক্তির অবস্থার বিবরণ ঃ

বর্তমান অবস্থা ঃ

হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন সময়ের পরিমাণ ঃ

দুর্ঘটনার সাক্ষী ঃ

নাম, ঠিকানা ঃ

১।

২।

---

রিপোর্ট প্রণয়নকারী ঃ

প্রণয়নের তারিখ ঃ

পদের নাম ঃ

স্বাক্ষর ঃ

বিভাগ ঃ

প্রতিষ্ঠান হতে ঃ

## অনুশীলনী-১০

### ▶▶ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। ইংরেজি 'Report' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে?**

**উত্তর** ইংরেজি 'Report' শব্দটি ল্যাটিন Reportare শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

**২। ল্যাটিন Reportare শব্দের অর্থ কী?**

**উত্তর** ল্যাটিন Reportare শব্দের অর্থ হচ্ছে 'To carry back' অর্থাৎ কোন কিছু বহন করার জন্য বা বলার জন্য ফিরে আসা।

**৩। প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১০]

**উত্তর** কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানের পর ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হয়, তাকে প্রতিবেদন বলা হয়।

**৪। কারবার প্রতিবেদন কী?**

**উত্তর** কারবার বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিবেদনকে কারবার প্রতিবেদন বলা হয়।

**৫। একটি আদর্শ প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোন্‌টি?**

**উত্তর** একটি আদর্শ প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে প্রতিবেদন রচনা করা।

**৬। একটি প্রতিবেদনের মূল অংশে কী কী থাকে?** [বাকাশিবো-২০০৭, পরি-২০১১]

**উত্তর** একটি প্রতিবেদনের মূল অংশে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকে ঃ

১। ভূমিকা
২। মূল বক্তব্য বা গর্ভাংশ
৩। উপসংহার
৪। সুপারিশ।

**৭। কারিগরি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৪(T)]

**উত্তর** কারিগরি বিশেষজ্ঞ বা প্রকৌশলী কর্তৃক রচিত প্রতিবেদনকে কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্ট বলে। এতে কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

**৮। ফরম রিপোর্ট কিভাবে তৈরি করা উচিত?** [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর** প্রতিষ্ঠানের কাজ, প্রকৃতি ও উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের উপায় মনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে ফরম রিপোর্ট তৈরি করা উচিত।

**৯। টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্ট কে প্রণয়ন করতে পারে?**

**উত্তর** একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞ বা প্রযুক্তিবিদ টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে পারেন।

**১০। টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্টের তথ্য কোথা হতে সংগ্রহ করতে হয়?**

**উত্তর** টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্টের তথ্য কারিগরি ও প্রকৌশল বিষয়ক ক্ষেত্র হতে সংগ্রহ করা হয়।

**১১। স্মারক রিপোর্ট কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১০(R), ১২]

**উত্তর** কোন শিল্পকারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভাগীয় সমস্যার সমাধান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ও আদান-প্রদানের লক্ষ্যে যে রিপোর্ট লেখা হয় তাকে স্মারক রিপোর্ট বলে।

১২। **স্মারক রিপোর্টের বিশেষত্ব কী?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** স্মারক রিপোর্টের বিশেষত্ব এই যে, এ রিপোর্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয় না এবং এতে কোন সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

১৩। **স্মারক রিপোর্ট কেন লেখা হয়?** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় সমস্যার সমাধান, বিভাগের মধ্যে তথ্য প্রদান বা সরবরাহ বা আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে স্মারক রিপোর্ট লেখা হয়।

১৪। **প্রতিবেদন কখন পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হয়?** [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর** প্রতিবেদনে যখন নির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশিত করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা হয় এবং লেখচিত্র ও তালিকা উপস্থাপন করা হয় তখন এটি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়।

১৫। **উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ও কী কী?**

**উত্তর** উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়–

১। তথ্যমূলক প্রতিবেদন ও

২। বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন।

১৬। **রুটিন প্রতিবেদন কী?**

**উত্তর** একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারবার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তাকে রুটিন প্রতিবেদন বলে।

১৭। **কার্যকালগতভাবে টেকনিক্যাল রিপোর্টকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর** কার্যকালগতভাবে টেকনিক্যাল রিপোর্টকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। প্রাথমিক রিপোর্ট

২। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট এবং

৩। চূড়ান্ত রিপোর্ট।

১৮। **কার্যকালগতভাবে চূড়ান্ত রিপোর্টকে কী নামে ডাকা হয়?**

**উত্তর** কার্যকালগতভাবে চূড়ান্ত রিপোর্টকে সর্বশেষ রিপোর্ট নামে ডাকা হয়।

১৯। **উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে কোন পরিস্থিতিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়?**

**উত্তর** প্রকৌশলী কর্তৃক কোন কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **প্রতিবেদন কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৮]

**উত্তর** কোন খবর, ঘটনা বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনাকে বলা হয় প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। ইংরেজি Report শব্দটি মূলত কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিবরণী তৈরি করে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অধ্যাপক **মাইক হ্যাচ**-এর মতে, "প্রতিবেদন হল একটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি বা কোন বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনা বিশেষ। এটা অত্যন্ত সতর্কতা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণে যা প্রস্তুত করা হয়।"

সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিবেদন বা রিপোর্ট একটি বিশেষ মাধ্যম যা কোন সংগঠিত তথ্যের পুনঃ প্রকাশনা এবং লেখক কর্তৃক পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হওয়ার পর যথেষ্ট যত্ন সহকারে তৈরি ও প্রকাশিত হয়।

**২। কারবার প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** কারবার সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বা অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে যে সুসংবদ্ধ ও বাস্তবভিত্তিক বিবৃতি উপস্থাপন করা হয় তাকেই কারবার প্রতিবেদন বলে। কারবার প্রতিবেদনকে কারবারের রিপোর্টও বলা হয়ে থাকে।

**৩। প্রতিবেদনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।** [বাকাশিবো-২০০৮, ১১, ১৩(T)]

অথবা, **প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?**

**উত্তর** নিম্নে প্রতিবেদনের প্রধান অংশগুলোর নাম উল্লেখ করা হল ঃ

**(ক) প্রারম্ভিক অংশ ঃ**

১। শিরোনামা
২। শিরোনাম পাতা
৩। অনুমতিপত্র
৪। প্রেরণ পত্র
৫। বিষয় সূচি।

**(খ) মূল অংশঃ**

১। ভূমিকা
২। মূল বক্তব্য বা গর্ভাংশ
৩। উপসংহার
৪। সুপারিশ

**(গ) পরিশিষ্টাংশ ঃ**

১। পরিশিষ্ট
২। গ্রন্থ বিবরণী
৩। সূত্রসমূহ
৪। অনুক্রমণী।

**(ঘ) অতিরিক্ত অংশ ঃ**

১। কৃতজ্ঞতা স্বীকার
২। স্বাক্ষর ও পদবী
৩। তারিখ।

**৪। রিপোর্টের মুখবন্ধে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে?**

**উত্তর** রিপোর্টের মুখবন্ধে সাধারণত প্রতিবেদনের উৎপত্তি, প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্য, প্রতিবেদনের আওতা, বিষয় বিন্যাস, রীতি ও সমস্যাসমূহ উল্লেখ থাকে। এছাড়া এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কথাও উল্লেখ করা যায়।

**৫। প্রতিবেদন প্রস্তুতে লেখক কাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকেন?**

**উত্তর** প্রতিবেদনের তথ্য কিংবা প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজে যে সকল ব্যক্তি বা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে প্রতিবেদন প্রস্তুতে লেখক সৌজন্যতাস্বরূপ ঐ সকল ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকেন।

**৬। 'মুখবন্ধ' ও 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, পরি-১১]

**উত্তর** **মুখবন্ধ ঃ** রিপোর্টে সাধারণত মুখবন্ধ ব্যবহার করা হয়। তবে মুখবন্ধ সচরাচর লেখক নিজে তৈরি করেন। এটি তার রিপোর্ট প্রসঙ্গে অন্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ** রিপোর্টের তথ্য কিংবা রিপোর্ট প্রণয়ন কাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সৌজন্যতাস্বরূপ ঐ সকল ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

**৭। কারিগরি প্রতিবেদন কী?**

**উত্তর** কারিগরি বিশেষজ্ঞ বা প্রকৌশলী কর্তৃক রচিত প্রতিবেদনকে বলা হয় কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্ট। এরূপ প্রতিবেদনে কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সাধারণত কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিল্পকারখানায় কর্মরত প্রকৌশলী বা কারিগরদের কাছ থেকে এ জাতীয় রিপোর্ট চাওয়া হয়।

**৮। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কারিগরি প্রতিবেদনের ব্যবহার উল্লেখ কর।**

**উত্তর** কোন নতুন প্রকল্প রচনার পূর্বে তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি না এবং উক্ত প্রকল্পের ব্যয়ভার ও উদ্দেশ্যগত দিক বিবেচনা করে তা লাভজনক এবং ফলপ্রসূ হবে কিনা তা রিপোর্ট প্রণয়নের মাধ্যমে ধারণা লাভ করতে হয়।

**৯। গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কারিগরি রিপোর্টের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।** [বাকাশিবো-২০১১, ১৩]

**উত্তর** গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কারিগরি রিপোর্টকে নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১। ফরম রিপোর্ট

২। স্মারক রিপোর্ট

৩। পত্র রিপোর্ট

৪। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

৫। দীর্ঘ বা ফর্মাল রিপোর্ট।

**১০। সময়ের দিক থেকে টেকনিক্যাল রিপোর্ট কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর** সময়ের ভিত্তিতে টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রধানত তিন প্রকার, যথা ঃ

১। প্রাথমিক রিপোর্ট

২। অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট এবং

৩। চূড়ান্ত রিপোর্ট।

**১১। প্রাথমিক রিপোর্ট কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** কোন প্রকল্প শুরু করার পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প বাস্তবায়ন বা বাজেট প্রণয়ন, প্রকল্পের সময় নির্ধারণ করে সামগ্রিক বিষয়ের উপর প্রথমেই যে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রাথমিক রিপোর্ট বলে।

**১২। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট কী?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর** কোন প্রকল্পের কাজ শুরু করার পর প্রকল্পের অগ্রগতি নিরূপনের উদ্দেশ্যে লিখিত রিপোর্টকে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বলে। প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এ রিপোর্ট লেখা হয়।

**১৩। টেকনিক্যাল রিপোর্টের স্টাইল কত প্রকার ও কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর** টেকনিক্যাল রিপোর্টের স্টাইল দু' প্রকার, যথা ঃ

১। সাহিত্যিক স্টাইল এবং ২। যান্ত্রিক স্টাইল।

**১৪। দীর্ঘ বা ফর্মাল রিপোর্ট বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** নির্দিষ্ট নিয়মকানুন এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যে রিপোর্ট লেখা হয় তাকে দীর্ঘ বা ফর্মাল রিপোর্ট বলে। এ ধরনের রিপোর্ট সাধারণত নির্ধারিত কোন বিষয়ে অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়ে থাকে। যাবতীয় নিয়মনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে তথ্যাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় বলে একে দীর্ঘ বা ফর্মাল রিপোর্ট বলা হয়।

**১৫। স্মারক রিপোর্ট কী?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর** কোন শিল্প-কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভাগীয় সমস্যার সমাধান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তথ্য সরবরাহ বা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে যে রিপোর্ট লেখা হয়, তাকে স্মারক রিপোর্ট বলে।

**১৬। চূড়ান্ত রিপোর্ট কখন লেখা হয়?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট লেখা হয়। এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই কোন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**১৭। সাধারণ রিপোর্টের পাঠক সংখ্যা অগণিত কেন?**

**উত্তর ঃ** সাধারণ রিপোর্টের পাঠক সংখ্যা অগণিত। কারণ যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এটা বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারিত সাধারণ রিপোর্ট দেশের সকল জনসাধারণই বুঝতে পারে।

**১৮। টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রচার বা বিক্রি করা হয় না-কথাটির তাৎপর্য কী?**

**উত্তর ঃ** টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রচার বা বিক্রি করা হয় না। এ কথাটির তাৎপর্য হল এই যে, টেকনিক্যাল রিপোর্ট এক প্রকার তথ্য সম্বলিত দলিল। তাই এটা সাধারণ রিপোর্টের মত জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার বা বিক্রি করা যায় না।

**১৯। চূড়ান্ত রিপোর্ট কী?**

**উত্তর ঃ** কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের শুরুতে প্রাথমিক রিপোর্ট, প্রকল্পের অগ্রগতি নিরূপণে অর্ন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট লেখা হয়। কোন প্রকল্পের সামগ্রিক কাজের উপর ভিত্তি করে যে রিপোর্ট লেখা হয়, তাকে চূড়ান্ত রিপোর্ট বলা হয়।

**২০। উত্তম প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় চারটি গুণাবলি লেখ।** [বাকাশিবো-২০১২(R)]

**উত্তর ঃ** উত্তম প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় চারটি গুণাবলি নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। **নির্দিষ্ট কাঠামো ঃ** আদর্শ প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এতে প্রতিবেদনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

২। **লিখিত ঃ** প্রতিবেদন লিখিত হতে হবে। অবশ্য এটা টাইপ করা বা মুদ্রিতও হতে পারে।

৩। **সুস্পষ্টতা ঃ** প্রতিবেদনে লিখিত বিবৃতি অবশ্যই সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে।

৪। **নিরপেক্ষতা ঃ** নিরপেক্ষতা আদর্শ প্রতিবেদনের একটি অপরিহার্য শর্ত। প্রতিবেদনে লেখককে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। সত্য ঘটনার কোন কিছু ধামাচাপা না দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বর্ণনা করবেন।

**২১। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ।** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** কোন শিল্পকারখানায় কর্মরত প্রকৌশলী, কারিগরদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের থেকে রিপোর্ট নেওয়া হয়।

**২২। ফরম প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** একটা নির্দিষ্ট ছাপানো ফরমে মাধ্যমে প্রতিবেদককে যে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তাকে বলা হয় ফরম প্রতিবেদন। কর্মরত ব্যক্তিবর্গ তাদের দৈনন্দিন কাজ, অভিজ্ঞতা, সমস্যা ইত্যাদি ফরমে লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে থাকে।

**২৩। ফরম রিপোর্টকে দায়-মুক্তির রিপোর্ট বলা হয় কেন?**

**উত্তর ঃ** কোন সরকারি, বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্ব প্রস্তুতকৃত ছক কাটা কাগজ উপস্থাপিত রিপোর্টকে ফরম রিপোর্ট বলে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ, প্রকৃতি এবং সৃষ্ট সমস্যা নিরসনের উপায় মনে করে গুরত্বসহকারে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। তাই এই রিপোর্টকে দায়-মুক্তির রিপোর্ট বলা হয়।

**২৪। স্মারক রিপোর্ট ও পত্র রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ কর।** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভাগীয় সমস্যার সমাধান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তথ্য সরবরাহ বা আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে স্মারক রিপোর্ট লেখা হয়, পক্ষান্তরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণের উদ্দেশ্যে যে রিপোর্ট লিখে থাকে তাই পত্র রিপোর্ট। এরূপ রিপোর্টের পাঠকের সংখ্যা অগণিত।

প্রতিবেদন লিখন

**২৫। টেকনিক্যাল রিপোর্টের কার্যকালগত শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর ঃ** কার্যকালগতভাবে টেকনিক্যাল রিপোর্টকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১। প্রাথমিক রিপোর্ট

২। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট

৩। চূড়ান্ত রিপোর্ট।

**২৬। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে কী কী বিষয় উল্লেখ করা হয়?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর ঃ** অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে প্রধানত প্রকল্প চলাকালীন অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন আছে কিনা, অতিরিক্ত জনশক্তি প্রয়োজন হবে কিনা প্রকল্পের বাস্তবায়নে অন্য কোন সমস্যা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। প্রতিবেদনের সংজ্ঞা দাও। একটি উত্তম প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় গুণাবলি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.১ ও ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। কারবার প্রতিবেদন কী? প্রতিবেদন প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.১ ও ১০.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। একটি প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। একটি রিপোর্টের প্রধান প্রধান অংশসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, টেকনিক্যাল রিপোর্টের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। কোন একটি কারখানায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান উল্লেখপূর্বক কারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের নিকট একটি প্রতিবেদন লেখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। কারিগরি প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও সাধারণ রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪, ১৪(T)]
অথবা, সাধারণ রিপোর্ট ও কারিগরি রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য কী? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। একটি কারিগরি প্রতিবেদন তৈরি কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১০.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



********

# অধ্যায়-১১

# অফিস ব্যবস্থাপনা
# (Office Management)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*১১.০ সূচনা; ১১.১ অফিস ও অফিস কার্যের সংজ্ঞা; ১১.২ অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্য; ১১.৩ নথিবদ্ধকরণ ও সূচিকরণের সংজ্ঞা; ১১.৪ নথিকরণের পদ্ধতি; ১১.৫ সূচিকরণ পদ্ধতি; ১১.৬ নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে পার্থক্য*

## ১১.০ সূচনা (Introduction) ঃ

শিল্পবিপ্লবের পূর্বে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। তখন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেরাই উৎপাদনের বিভিন্ন দিক জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী প্রশাসন কার্য চালাতো বলে অফিস কার্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল সীমিত। কিন্তু শিল্পকারখানার পরিধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অফিস কার্যাবলির প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে যে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অফিস কার্যাদি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কার্যত অফিসকে কেন্দ্র করেই গোটা কারবার প্রতিষ্ঠান সংগঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই অফিসের কার্য সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে অপরিহার্য। অফিস ব্যবস্থানার উপর কারবারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বিপণন, সর্বোপরি অর্থনৈতিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

## ১১.১ অফিস ও অফিস কার্যের সংজ্ঞা (Definition of Office and Office Work) ঃ

❑ **অফিস (Office) ঃ** অফিস একটি ইংরেজি শব্দ, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে দপ্তর বা কার্যালয়। ইংরেজি এই "Office" শব্দটি বাংলাতে বহু পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বর্তমানেও এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণ অর্থে দপ্তর বা অফিস বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝায় যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় করণিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে অফিসকে শুধুমাত্র করণিক কার্য সম্পাদনের স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

প্রকৃত অর্থে যে স্থানে একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষিত হয় এবং কারবারের ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই অফিস বা দপ্তর বলা হয়। অফিসে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে সংরক্ষিত তথ্যাদি বিভিন্ন স্থানে আদান-প্রদান করে থাকে।

অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে অফিসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তার মধ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

১। **এস.পি. অরোরার** মতে, "অফিস বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝায় যেখানে তথ্যাদি সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ পরিচালিত হয়।"

২। **জে.সি. ডেনিয়ার** (Denyer)-এর ভাষায়, "অফিস হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের করণিক কার্যাবলি সম্পাদনের স্থান।" (Place where clerical operations are carried on)

৩। **বি.বি.ঘোষ** বলেন, "অফিস হচ্ছে প্রশাসনের কেন্দ্র যেখান থেকে নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠনের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হয়।" (Office is the seat of administration where policy decisions are taken, and from where all activities of the organisation are directed.)

৪। **ডঃ এম. এ. মান্নানের** মতে, "কারবারের নথিপত্র প্রস্তুত, ব্যবহার ও সংরক্ষণের নিমিত্তে করণিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন স্থানকে অফিস বলা যায়।"

সুতরাং, উল্লেখিত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, অফিস বা দপ্তর হচ্ছে এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখানে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় করণিক কার্যাদি সম্পন্ন হয়, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিভুক্ত করা হয়, নথিভুক্ত কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা হয় এবং কারবারের সমুদয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

❑ **অফিস কার্য (Office Work) ঃ** সাধারণ ও সহজ কথায়, অফিসে সম্পাদিত কার্যাবলিকেই অফিস কার্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সকল কার্য অফিসের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় তা-ই অফিস কার্য বা Office Work নামে পরিচিত। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন– উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, পরিবহণ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি । এ সকল বিভিন্ন কার্যের মধ্যে যে সকল কার্য কাগুজে ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে অফিস কার্য বা Office Work বলে অভিহিত করা হয়।

অফিস কার্য মূলত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ পস্তুতকরণ, নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। মোট কথা, একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয়, প্রশাসনিক ও করণিক সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মপ্রক্রিয়াই অফিস কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

## ১১.১.১ অফিস কার্যের প্রকৃতি (Nature of Office Work) ঃ

দপ্তর বা অফিস হচ্ছে এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখান থেকে কারবার প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় করণিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়, কারবার সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিভুক্ত করা হয়, নথিভুক্ত কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা হয় এবং কারবার প্রতিষ্ঠানের সমুদয় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অফিস কার্যের প্রকৃতি প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

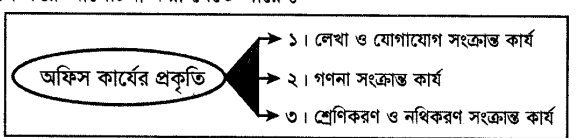


**১। লেখা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্য (Written & communication work) ঃ** সকল ধরনের লেখার ও যোগাযোগের কাজকে অফিসের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অফিসকে কিছু না কিছু লেখা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে হয়। চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমেও এ ধরনের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

**২। গণনা সংক্রান্ত কার্য (Work of counting) ঃ** একটি দপ্তর বা অফিসকে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু গণনা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে হয়। এটি প্রতিটি অফিসেরই নৈমিত্তিক কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

**৩। শ্রেণিকরণ ও নথিকরণ সংক্রান্ত কার্য (Classifying & filling work) ঃ** প্রতিটি দপ্তর বা অফিসকেই বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, শ্রেণীকরণ করতে হয় এবং সেগুলো যথাযথ সংরক্ষণের জন্য নথিকরণ করে রাখতে হয়। বলা যায় যে, শ্রেণিকরণ ও নথিকরণ অফিসের নৈমিত্তিক কার্যেরই একটি অংশবিশেষ।

## ১১.২ অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Office Work) ঃ

অফিস কার্যের কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বলা যায় যে, উল্লেখিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই সকল প্রকার কার্য থেকে সহজেই অফিস কার্যকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়। অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল ঃ

| | |
|---|---|
| ১। করণিক কাজ | ৬। গোপনীয়তা বজায় রাখা |
| ২। প্রশাসনিক কাজ | ৭। উন্নত কার্য পরিবেশ |
| ৩। নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ | ৮। স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ |
| ৪। শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ | ৯। কোলাহলমুক্ততা |
| ৫। মানসিক কাজ | ১০। শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রের ব্যবহার। |

নিম্নে অফিস কার্যের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হল ঃ

**১। করণিক কাজ (Clerical work) ঃ** অফিস কার্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল করণিক সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা। এ কারণেই বলা হয় যে করণিক কার্য যে স্থানে সম্পাদিত হয় তা-ই অফিস। অফিসে নিয়োজিত কর্মীগণ প্রতিনিয়তই করণিক সংক্রান্ত কার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

**২। প্রশাসনিক কাজ (Administrative work) ঃ** প্রশাসনিক কাজ অফিস কার্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কার্যত অফিসকে প্রশাসনিক কার্যও সম্পন্ন করতে হয়। অফিসই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন অফিস কার্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

**৩। নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ (Prepare & record of file) ঃ** অফিস কার্য মূলত প্রতিষ্ঠানের নথিপত্রের সাথে সম্পর্কিত। নথিপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব অফিসেরই। অফিসকে তাই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্যের দলিলপত্র ইত্যাদির সংরক্ষণাগার বলা হয়ে থাকে। বলা হয় যে, নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ অফিস কার্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

**৪। শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ (Educational related work) ঃ** শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ অফিস কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। অফিসে সাধারণত যে সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় তার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। কারখানার শ্রমিকের মতো অশিক্ষিত কর্মচারী অফিস কার্য সম্পাদনের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

**৫। মানসিক কাজ (Physichological function) ঃ** অফিস কার্যের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে অর্থাৎ অফিসে, দৈহিক শ্রমের তুলনায় মানসিক শ্রম অপরিহার্য। কার্যত অফিস কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রমই বেশি ব্যয় করতে হয় এবং এ কারণেই মানসিক কাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

**৬। গোপনীয়তা বজায় রাখা (Keep secret) ঃ** গোপনীয়তা বজায় রাখা অফিস কার্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক কারবারি সংগঠনের এমন অনেক বিষয় থাকে যা একান্তভাবেই গোপনীয়। কারবার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ঐ সমস্ত বিষয়সমূহের গোপনীয়তা রক্ষা করা অফিস কাজের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। অফিস কার্যের সার্বিক সাফল্য ও ব্যর্থতা গোপনীয়তা বজায় রাখার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে।

**৭। উন্নত কার্য পরিবেশ (Good working environment) ঃ** অফিস কার্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উন্নত কার্য পরিবেশের মধ্যে যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা। অফিস কার্য যেখানে সম্পাদিত হয় সে স্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে, যা কারখানা বা অন্য কোন কার্যক্ষেত্রে থাকে না।

**৮। স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ (Treate as a nurve) ঃ** অফিস কার্যের সাথে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় একে স্নায়ু কার্যের সাথে তুলনা করা যায়। স্নায়ু যেমন মানবদেহের প্রাণকেন্দ্র তেমনি অফিস প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিভাগের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এদের কাজকে সচল রাখে। তাই বলা হয়ে থাকে, অফিস একটি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ।

**৯। কোলাহলমুক্ততা (Silence) ঃ** অফিস কার্য সম্পাদনের স্থানটি হতে হয় অনেকাংশে কোলাহলমুক্ত। এটি এর একটি বৈশিষ্ট্য। অফিসে যেহেতু মানসিক শ্রমক্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন হয় সেহেতু এটি অনেকটা নিরিবিলি ও কোলাহলমুক্ত হওয়া আবশ্যক। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ অফিস কার্য সম্পাদনে কর্মীগণকে ব্যাপকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। কার্যত এটি অফিস স্থাপনের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিকও বটে।

**১০। শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রের ব্যবহার (Use equipment which needs few labour) ঃ** শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার অফিস কার্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আধুনিক শ্রম-সংক্ষেপন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে সুন্দর ও কার্যকরভাবে দপ্তরের কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়। শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার বর্তমানে অফিস কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ব্যাপকভবে সহায়তা করে থাকে।

অফিস কার্যের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি অফিসের কার্যকে অন্যান্য যে কোন কাজ হতে স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করতে সহজতর করেছে।

## ১১.২.১ আধুনিক অফিসের কার্যাবলি (Functions of Modern Office) ঃ

একটি অফিসকে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। আধুনিক অফিসের কার্যাবলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়–
(ক) নৈমিত্তিক বা রুটিন কার্যাবলি এবং (খ) প্রশাসনিক কার্যাবলি
নিম্নে ছকের মাধ্যমে একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি উপস্থাপন করা হল ঃ

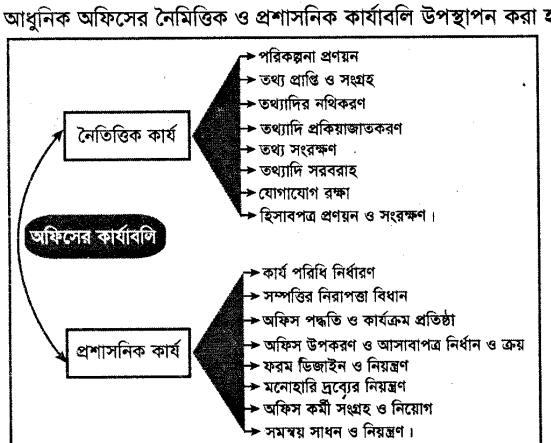

নিম্নে অফিসের উপরোক্ত কার্যাবলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল ঃ

**(ক) নৈমিত্তিক কার্যাবলি (Routine Functions) ঃ**

**১। পরিকল্পনা প্রণয়ন (Preparing plan) ঃ** আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈমিত্তিক কার্য হল সার্বিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অর্থাৎ কাজের গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ও দক্ষতার সাথে কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত কোন্ কাজ কখন, কীভাবে কে সম্পাদন করবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করা অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**২। তথ্য প্রাপ্তি ও সংগ্রহ (Receive & collection of information) ঃ** বিভিন্ন উৎস হতে তথ্যসামগ্রীর প্রাপ্তি ও সংগ্রহ অফিসের মৌলিক ও প্রাথমিক কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে প্রতিনিয়তই চিঠিপত্র, তারবার্তা, টেলেক্স, চালান, রসিদ, বিল, ফরমায়েশ ইত্যাদি অফিসে আসে এবং অফিসকে তা গ্রহণ করতে হয়। আবার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুসারে অনেক সময় বিভিন্ন উৎস হতেও তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়।

**৩। তথ্যাদির নথিকরণ (Filling information) ঃ** আধুনিক অফিসের একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির নথিকরণ করা। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানোর নিমিত্তে এর নথিকরণ আবশ্যক। অফিস বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত তথ্যাদিকে লিখে রাখে এবং নথিভুক্ত করে থাকে।

**৪। তথ্যাদির প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing information) ঃ** সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণ করে, প্রতিবেদন তৈরি করে এবং বিভিন্ন লেখচিত্র ও পরিসাংখ্যিক সারণীর সাহায্যে উপস্থাপন করতে হয়। এ কাজগুলোকেই এক সাথে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ করা আধুনিক অফিসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**৫। তথ্য সংরক্ষণ (Information record) ঃ** প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও নীতি নির্ধারণের জন্য বর্তমানে ও অতীতে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যাবলির প্রয়োজন হয়। তাই সংগৃহীত তথ্যাদিকে প্রক্রিয়াজাত করার পর সেগুলোকে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা আধুনিক অফিসের কাজ।

**৬। তথ্যাদির সরবরাহ (Sending information) ঃ** আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তথ্যাদি সরবরাহ করা। অর্থাৎ অফিসে সংরক্ষিত তথ্যাবলি প্রয়োজনমত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সরবরাহ করাও অফিসের কাজ।

**৭। যোগাযোগ রক্ষা (Keep communication) ঃ** অফিস বা দপ্তর প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শাখা বা বিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করে থাকে। চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে অফিস এ যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

**৮। হিসাবপত্র প্রণয়ন ও সংরক্ষণ (Accountancy & book keeping) ঃ** হিসাবপত্র প্রণয়ন আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন খরচ, শ্রমিক- কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি বিল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হিসাবপত্র প্রণয়ন অফিসকে করতে হয়। এছাড়া প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হয়।

**(খ) প্রশাসনিক কার্যাবলি (Administrative functions) ঃ**

**১। কার্য পরিধি নির্ধারণ (Determine the area of work) ঃ** আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্য হচ্ছে কার্য পরিধি-নির্ধারণ করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের পরিধি নির্ধারণ করা অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব। নির্ধারিত কার্য পরিধির উপর ভিত্তি করেই একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা, নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

**২। সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান (Security of the assets) ঃ** সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা আধুনিক অফিসের প্রশাসনিক কার্যাবলির একটি বিশেষ কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর জাতীয় যাবতীয় সম্পত্তি এবং দলিলপত্রাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে এদের নিরাপত্তা বিধান করা দপ্তর বা অফিসেরই কাজ।

**৩। অফিস পদ্ধতি ও কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা (Process & establish of office work) ঃ** আধুনিক অফিসের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্য হিসেবে অফিস পদ্ধতি ও কার্যক্রম প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অফিস এর কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

**৪। অফিস উপকরণ ও আসবাবপত্র নির্বাচন ও ক্রয় (Selection & purchase of office euipment & furniture) ঃ** অফিস কার্য নির্বাহের জন্য যে সকল আসবাবপত্র ও উপকরণের প্রয়োজন হয় সেগুলো নির্বাচন ও ক্রয় করা অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**৫। ফরম ডিজাইন ও নিয়ন্ত্রণ (Design & controlling form) ঃ** ফরম দপ্তর বা অফিসের নথিপত্র প্রস্তুত এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ফরমের ডিজাইনের উপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশনের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে। তাই প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফরমের ডিজাইন তৈরি করা এবং সাথে সাথে ফরমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা অফিসের কর্তব্য।

**৬। মনোহারী সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ (Control of stationery goods) ঃ** দপ্তর বা অফিসের কাজে প্রতিনিয়তই প্রচুর পরিমাণে মনোহারী সামগ্রীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। অফিস প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মনোহারী দ্রব্য যেমন– কালি, কলম, কাগজ, আলপিন, কার্বন ইত্যাদি ক্রয় করে এবং এর যথার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**৭। অফিস কর্মী সংগ্রহ ও নিয়োগ (Selection & recruit employee) ঃ** উপযুক্ত কর্মীসংগ্রহ ও নিয়োগ করা আধুনিক অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বলা যায় যে, দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়োগ দান এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা দপ্তর বা অফিসেরই কাজ।

**৮। সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ (Co-ordination & control) ঃ** সমন্বয় সাধন আধুনিক অফিসের একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দপ্তর বা অফিসের প্রতিটি বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা বা বিভাগের মধ্যে কাজের সঙ্গতি আনয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব।

আধুনিক অফিসের কার্যাবলি আলোচনা শেষে বলা যায় যে, অফিসের উল্লেখিত নৈমিত্তিক ও প্রশাসনিক কার্যসমূহ সঠিক ও যথাযথভাবে সম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে।

## ১১.৩ নথিবদ্ধকরণ ও সূচিকরণের সংজ্ঞা (Definition of Filing and Indexing) ঃ

❑ **নথিবদ্ধকরণ (Filing) ঃ** নথিকরণ বা নথিবদ্ধকরণ হল এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মূল্যবান কাগজপত্র ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে অফিস-আদালত বা কারবার প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রিপোর্ট ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজিয়ে সংরক্ষণ করা হয় তাকে নথিকরণ বলে।

**নিম্নে নথিবদ্ধকরণের কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ**

**১। অধ্যাপক জে. সি. ডেনিয়ার** (Denyer)-এর মতে, "নথিকরণ হল দলিল-পত্রাদি সাজিয়ে রাখা ও সংরক্ষণের পদ্ধতি বিশেষ, যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে এগুলো খুঁজে বের করা যায়"।

**২। লিট্‌ল ফিল্ড ও পিটারসন** বলেন, "নথিকরণ হচ্ছে চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজসমূহ উপযুক্ত পাত্রে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়"।

**৩। জনৈক বিশেষজ্ঞ** বলেছেন, "যে বিশেষ পদ্ধতিতে দলিল-পত্রাদি শ্রেণিবিন্যাসকরণ, সাজান ও সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনের সময় দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় তাকে নথিকরণ বলে"।

**৪। অধ্যাপক রহমান বলেন,** "ভবিষ্যতে হদিস বের করার প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখার নিমিত্তে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান কাগজপত্র রীতিবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থাকে নথিকরণ বলা হয়।" (Filing is a systematic and scientific preservation of letters, documents, contracts and many other valuable papers in a safe place known as file so as to have them in readiness for future reference.)

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, নথিকরণ হচ্ছে এমন একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুবিন্যস্তরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও মূল্যবান কাগজপত্র সাজিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

❑ **সূচিকরণ (Indexing) ঃ** নথিবদ্ধ মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য যে নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা হয় তাকে সূচিকরণ বলে। এটা নথিযুক্ত কাগজপত্র সহজে খুঁজে বের করার সূত্র হিসেবে কাজ করে। সূচিপত্র দেখে কোন্ ফাইল বা নথিতে কোন্ কাগজ রয়েছে তা জানা যায় এবং সত্বর বের করা যায়।

**নিম্নে সূচিকরণের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ**

**১। অধ্যাপক জে. সি. ডেনিয়ার (Denyer)**-এর ভাষায়, "সূচিকরণ হচ্ছে এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সম্ভাব্য নথিকৃত কাগজপত্রাদির শিরোনাম নির্বাচন ও সংরক্ষণ করা হয়"।

**২। ডঃ এম. এ. মান্‌নান** বলেন, "ফাইলভুক্ত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি যে পদ্ধতিতে খুঁজে বের করা যায় তাকে সূচিকরণ বলে"।

৩। **জনৈক বিশেষজ্ঞের** মতে, "সূচিকরণ হল নথিভুক্ত কাগজপত্রের শিরোনাম নির্বাচনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া"।

৪। **অধ্যাপক রহমান** এর মতে, "নথিভুক্ত দলিল, রিপোর্ট ইত্যাদির সঠিক বা প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য তাদের ধারাবাহিক বা পদ্ধতিগত তালিকা প্রণয়নকে সুচিকরণ বলে।" (Indexing means compilation and preparation of systematic list of the letters, documents, reports etc. kept in files to have clean knowledge and guidance as to the exact location on placement of each of them.)

সুতরাং বলা যায় যে, যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে সূচিকরণ বলে।

## ১১.৩.১ নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব (Importance of Filing) ঃ

প্রতিষ্ঠানের সাফল্যজনক পরিচালনার জন্য নথি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানসম্মত নথিকরণ আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে। তাই আধুনিক অফিস-আদালত ও অন্যান্য কারবার প্রতিষ্ঠানে নথিকরণের গুরুত্ব প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**নিম্নে নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ**

১। **প্রামাণ্য দলিল (Authentic deed) ঃ** নথি-সংরক্ষিত কাগজপত্র অতীতের জের হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোন সময় প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২। **তথ্য ভাণ্ডার (Data bank) ঃ** নথিকরণকে আধুনিক অফিসের তথ্য ভাণ্ডার ধরা হয়। কারণ অফিসের যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র নথিতে সংরক্ষণ করা হয়।

৩। **দ্রুত সন্ধান প্রদান (Quick searching) ঃ** বৃহদায়তন কারবারগুলোতে অধিক পরিমাণে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়। তাই সুশৃঙ্খলভাবে ভবিষ্যতের জন্য এগুলো সংরক্ষণ করা হয়। ফলে প্রয়োজনের সময় নথিতে সংরক্ষিত কাগজপত্র সূচি অনুযায়ী দ্রুত বের করা যায়।

৪। **নিরাপত্তা (Security) ঃ** অফিস-আদালতের মূল্যবান দলিল-পত্রাদি নিরাপদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নথিকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৫। **কার্যদক্ষতা (Efficiency in work) ঃ** অফিস কার্যের দক্ষতা ও গতিশীলতা নির্ভর করে সুষ্ঠু নথিকরণ ব্যবস্থার উপর।

৬। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক (Help to decision making) ঃ** নথিকরণকে কারবারের স্মৃতি ভাণ্ডার বলে। নথিকরণ তথ্য সরবরাহ করে দ্রুত ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সহায়ক।

৭। **মিতব্যয়িতা (Economy) ঃ** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নথিতে কাগজপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষিত হয় বলে প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট কাগজটি কম সময় ও কম শ্রম ব্যয় করে বের করা যায়। ফলে নথিকরণ অফিসের কাজে মিতব্যয়িতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।

৮। **দক্ষ ব্যবস্থাপনা (Efficient management) ঃ** প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা অর্জনের বিশেষ উপায় হলো অফিসের সুশৃঙ্খল নথিকরণ ব্যবস্থা। কারণ নথিতে ব্যবস্থাপনার সহায়ক সকল কাগজপত্র বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৯। **সুনাম বৃদ্ধি (Increase reknown) ঃ** নথিকরণ কেবল প্রামাণ্য দলিল, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদিতেই সাহায্য করে না, সমগ্র অফিস ব্যবস্থাপনায় সুনাম সৃষ্টিরও সহায়ক হয়।

১০। **কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase efficiency of the employce) ঃ** সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নথিকরণ কর্মীদের অযথা হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

১১। **সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচায় (Save time, labour & money ঃ** আদর্শ নথিকরণ ব্যবস্থা সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচাতে সাহায্য করে। একজন সুকৌশলী কারবারির জন্য এ তিনটিই মহামূল্যবান।

১২। **শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয় (Ensure discipline) ঃ** আদর্শ ও সুষ্ঠু নথিকরণ ব্যবস্থা কাগজপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।

মোট কথা, একটি বিজ্ঞানসম্মত নথিকরণ ব্যবস্থা আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনাকে করে তোলে দক্ষ ও গতিশীল। ফলে কারবারের সুনাম বৃদ্ধি ও উন্নতির সহায়ক হয়।

## ১১.৪ নথিকরণের পদ্ধতি (Methods of Filing) ঃ

অফিসে কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ নথিকরণের যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

(ক) সনাতন পদ্ধতি ও

(খ) আধুনিক পদ্ধতি।

**নিম্নোক্ত ছকে নথিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখানো হল ঃ**

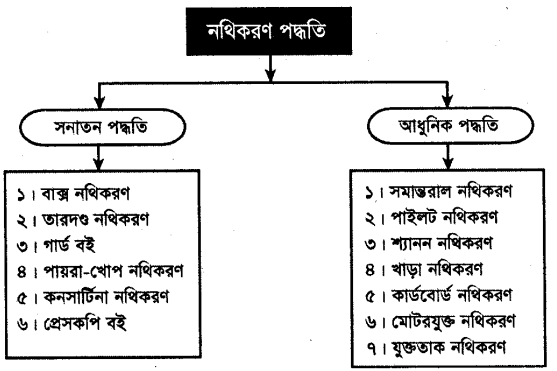


চিত্র ঃ ১১.১ নথিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

**নিম্নে নথিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ**

**(ক) সনাতন পদ্ধতি (Old method of filing) ঃ** অতি প্রাচীন কাল থেকে নথিকরণে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোকে সনাতন পদ্ধতি বলে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে এগুলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

**নিম্নে এদের কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হল ঃ**

**১। বাক্স নথিকরণ (Box filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে ক্লিপযুক্ত ফাইলে প্রেরকের নাম বা বিষয় অনুসারে কাগজপত্র বা দলিল-দস্তাবেজগুলো সংরক্ষণ করে বাক্সের পৃথক পৃথক তাকে সমান্তরালভাবে রাখা হয়। সাধারণত যে প্রতিষ্ঠানের নথি বা চিঠিপত্রের সংখ্যা কম সেখানে এ পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক।

**২। তারদণ্ড নথিকরণ (Wire stick filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে কেবল একখণ্ড কাঠের উপর তারদণ্ডের মধ্যে ভাউচার, চিঠিপত্র ইত্যাদি গেঁথে রাখা হয়। দন্ডখানি টেবিলের উপর বা দেয়ালের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়।

**৩। গার্ড বই (Guard book) ঃ** ছোট প্রতিষ্ঠানের অফিসে গার্ড বইতে তারিখ অনুযায়ী চিঠিপত্রগুলো ক্লিপ দ্বারা আটকানো থাকে। এ পদ্ধতি সময় ও শ্রমের যথেষ্ট অপচয় করে।

**৪। পায়রা-খোপ নথিকরণ (Pigeon box filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে একটি আলমারি ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে উক্ত আলমারিতে ২৬টি খোপ থাকে। খোপগুলো দেখতে কবুতরের খোপের মত বলে একে পায়রা-খোপ নথিকরণ বলা হয়। খোপগুলোর বহির্ভাগে A, B, C, D ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী কাগজপত্রগুলো নির্দিষ্ট খোপে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও স্থানের অপচয় করে। ছোট খাট অফিসে এটা সুবিধাজনক।

**৫। কনসার্টিনা নথিকরণ (Concertina filing) ঃ** এটা কার্ড বোর্ড দিয়ে নির্মিত এবং এর অনেকগুলো পকেট থাকে। প্রত্যেকটি পকেট ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং প্রত্যেক পকেটে অক্ষর অনুযায়ী চিঠিপত্র নথিবদ্ধকরণ করা হয়। একটি ফিতার সাহায্যে কনসার্টিনা ফাইল বন্ধ করে রাখা হয় বলে কাগজপত্র পড়ে যাবার ভয় থাকে না। বীমাপত্র, নগদ ভাউচার ইত্যাদি কাগজ নথিকরণের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

**৬। প্রেস কপি বই (Press copy book) ঃ** এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের বাইরে প্রেরিত চিঠিপত্র তারিখ ও বর্ণক্রম অনুসারে বাঁধানো খাতায় কপি করে রাখা হয়। প্রয়োজনের সময় যাতে এগুলো সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

**(খ) আধুনিক নথিকরণ পদ্ধতি (Modern method of filing) ঃ** বর্তমানে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলোতে নথিকরণের জন্য আধুনিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সুবিধাজনক।

**নিম্নে আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হল ঃ**

**১। সমান্তরাল নথিকরণ (Parallel filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়। বাক্সের ভেতরে চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সমান্তরালভাবে পৃথক পৃথক ফাইলভুক্ত করে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেকটি ফাইলে সংরক্ষিত বিষয়ের শিরোনাম, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ক্রমিক নং ক্রম অনুসারে লিখে রাখা হয়। ফাইলগুলো আলগা থাকে বলে সহজেই বের করা যায়।

**২। পাইলট নথিকরণ (Pilot filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে শক্ত কাগজের তৈরি ফাইল কভার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিটি ফাইলে লোহার পাতের তৈরি পাইলট থাকে। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদিতে পাঞ্চিং মেশিনের সাহায্যে ছিদ্র করে পাইলটের মধ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। পাইলটের স্প্রিং-এর সাহায্যে তা খোলা ও বন্ধ করা যায়। ফলে সংরক্ষিত কাগজপত্রাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

**৩। শ্যানন নথিকরণ (Shanon filing) ঃ** কার্যাবলির দিক থেকে শ্যানন নথিকরণ অনেকটা পাইলট নথিকরণের মতো। এ পদ্ধতিতে কাঠের বা স্টীলের ড্রয়ারে লৌহ দণ্ডের ছিদ্র করে কাজগপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদি নথিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

**৪। খাড়া নথিকরণ (Vertical filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে তাকে বা আলমারিতে খাড়াভাবে একটির পাশে আর একটি নথি রাখা হয়। প্রতিটি নথিতে অনেকগুলো দলিল সংরক্ষণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন তাকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ফাইল সংরক্ষণ করা হয়। ফলে দরকার হলে অতি সহজে ফাইলটি বের করা যায়। এটি বিজ্ঞানসম্মত নথিকরণ।

**৫। কার্ডবোর্ড নথিকরণ (Card board filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে শক্ত হার্ডবোর্ডের উপর ফিতা বা রশি দ্বারা দলিলপত্র বেঁধে রাখা হয় এবং কাগজের টুকরার উপর বিবরণী লেখা থাকে।

**৬। মোটরযুক্ত নথিকরণ (Electronic engine filing) ঃ** এ পদ্ধতিতে নথিপত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে ট্রেতে সাজিয়ে রাখা হয়। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে একজন নথিকরণ কর্মীর দ্বারা সুইচের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নথির ট্রে নির্দিষ্ট জায়গায় কর্ম সম্পাদনের জন্যে উপস্থিত করা হয়। আবার কার্যশেষে এর অবস্থানের জায়গায় পাঠানো হয়।

**৭। মুক্তাক নথিকরণ (Open self filing) ঃ** এ ব্যবস্থায় বড় আকারের তাকযুক্ত আলমারি ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য একটি নম্বর নির্দিষ্ট করা থাকে। ঐ নম্বরের কাগজপত্র পৃথক পৃথক আবরণে নথিভুক্ত করা হয়। অফিস চলাকালীন সময়ে এ তাক খোলা থাকে। বাকি সময়ে এটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। সাধারণত বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

## ১১.৫ সূচিকরণ পদ্ধতি (Methods of Indexing) ঃ

আধুনিক অফিসসমূহে সূচিকরণের যে সমস্ত পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে তা এখানে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

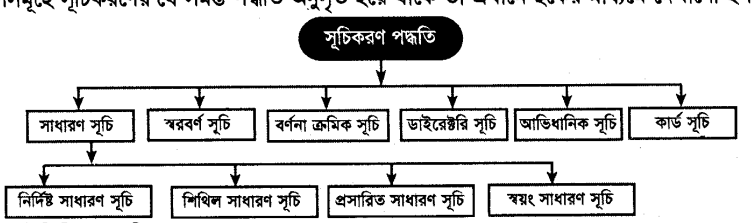


**নিম্নে সূচিকরণের উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ**

**১। সাধারণ সূচি (General indexing) ঃ** এটা সূচিকরণের অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতি। এ পদ্ধতি কতকগুলো পাতার সমষ্টি যার প্রত্যেকটিতে বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর লেখা থাকে। প্রেরকের নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী তার ক্রমসূচি প্রণয়ন করা হয়। যে ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রথম অক্ষর 'A' থাকে তা 'A' চিহ্নিত পৃষ্ঠায়, 'B' থাকলে 'B' চিহ্নিত পৃষ্ঠায় লেখা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে 'C', 'D' ইত্যাদি পৃষ্ঠায় পত্রাদি সূচিভুক্ত করা হয়। এতে এমনভাবে বর্ণগুলো সাজানো হয়, যাতে বই খুললেই সবগুলো বর্ণ একসাথে দেখা যায়।

সাধারণ সূচি চার রকমের হতে পারে, যথা ঃ

**(ক) নির্দিষ্ট সাধারণ সূচি (Fixed general indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতে সূচিপত্রগুলো একটি বাঁধাই করা পুস্তকে আটকানো থাকে।

**(খ) শিথিল সাধারণ সূচি (Free general indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতে সূচির পৃষ্ঠাগুলো শিথিলভাবে গাঁথা থাকে। প্রয়োজন হলে সূচি বই থেকে যে কোন পৃষ্ঠা বের করা যায় ও নতুন পৃষ্ঠা সংযোগ করা যায়।

**(গ) প্রসারিত সাধারণ সূচি (Spread general indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতে একটি বাঁধানো খাতায় সূচিকরণ করা হয় এবং খাতার পাতার ডান দিকে উপরের কোণা কেটে বর্ণগুলো লেখা হয়। ফলে বাইরে থেকে অক্ষরগুলো দেখা যায়। সে অক্ষর অনুযায়ী নাম লেখা হয়।

**(ঘ) স্বয়ং সাধারণ সূচি (Self general indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতেও সূচির খাতা বাঁধানো থাকে এবং খাতার পৃষ্ঠাগুলো এমনভাবে কাটা থাকে যেন বর্ণমালার অক্ষরগুলো বাইরে থেকে দেখা যায়।

**২। স্বরবর্ণ সূচি (Vowel indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতে সূচি নাম বা বিষয়বস্তুর প্রথম স্বরবর্ণ অনুযায়ী করা হয়। A, E, I, O, U এবং Y ইংরেজি বর্ণমালার এ ছয়টি স্বরবর্ণ অনুযায়ী বাঁধান খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় ঘর থাকে। ব্যক্তি বা বিষয়বস্তুর প্রথম স্বরবর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরে তার নাম এবং প্রত্যেকের নামের পাশে নথিভুক্ত কাগজপত্রের উল্লেখ ও এর বিবরণ লেখা থাকে।

**৩। বর্ণানুক্রমিক সূচি (Descriptive indexing) ঃ** এ পদ্ধতিতে বর্ণের ক্রমানুসারে ব্যক্তি, বিষয়বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের নাম সূচির পৃষ্ঠাসমূহে লেখা থাকে।

**৪। আভিধানিক পদ্ধতি (Dictionany procedure) ঃ** এ পদ্ধতিতে সূচক বইয়ের পৃষ্ঠার শুরুতে প্রথম বর্ণের জন্য, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এভাবে বর্ণক্রমিক সাজানো রীতি অনুসরণ করা হয়।

**৫। ডাইরেক্টরি পদ্ধতি (Directory procedure) ঃ** এ পদ্ধতি টেলিফোন ডাইরেক্টরি পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে পদবী, নামের বর্ণ অনুযায়ী সাজানো রীতি অনুসরণ করা হয়।

**৬। কার্ড সূচি (Card indexing) ঃ** এটা সূচিকরণের সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এতে কার্ডের ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি কার্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, নথি নম্বর প্রভৃতি লিখে তাকে একটি ট্রেতে শলাকার সাহায্যে গেঁথে রাখা হয়। উক্ত ট্রেকে সূচি বাক্স বলা যায়। অফিসের প্রয়োজন অনুসারে কার্ডগুলো সংখ্যানুযায়ী সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। এটি বিজ্ঞানসম্মত বলে বর্তমানে এর ব্যবহার প্রসার লাভ করেছে।

## ১১.৬ নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে পার্থক্য (Differences Between Filing and Indexning) ঃ

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনায় নথিকরণ ও সূচিকরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। উভয় কর্মসূচিই নথিপত্র ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে বহুবিধ ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করা হল ঃ

| পার্থক্যের বিষয় | নথিকরণ (Filing) | সূচিকরণ (Indexing) |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | নথিকরণ হল এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মূল্যবান কাগজপত্র ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। | নথিবদ্ধ মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য যে নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলা হয় সূচিকরণ। |
| ২। কার্য শুরু | নথিকরণ সূচিকরণের পূর্বশর্ত স্বরূপ। | নথিকরণের পরে সূচিকরণের কাজ শুরু হয়। |
| ৩। সংরক্ষণ প্রক্রিয়া | অফিস ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নথিকরণ হল মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের প্রথম ধাপ। | অফিস ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সূচিকরণ কাগজপত্র সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ। অর্থাৎ সূচিকরণের স্থান নথিকরণের অব্যবহিত পরে। |
| ৪। নিরাপত্তা বিধান | নথিকরণের মাধ্যমে অফিসের মূল্যবান কাগজপত্রের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। | সূচিকরণের মাধ্যমে নথিবদ্ধ মূল্যবান কাগজপত্রের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। |
| ৫। সহায়তা প্রদান | অফিসের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে নথিকরণ অফিসের স্থান সংকুলান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সহায়তা করে থাকে। | সূচিকরণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের নথিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দ্রুত কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে থাকে। |
| ৬। কার্যাবলি | নথিকরণ অফিস কার্যাবলিতে সকল প্রকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। | সূচিকরণ সকল নথিবদ্ধ পত্রের পরিচালক হিসাবে কাজ করে। |

# অনুশীলনী-১১

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। অফিস কী?**

**উত্তর** অফিস বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝায়, যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় করণিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্য সম্পাদিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

**২। ইংরেজি "Office"-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?**

**উত্তর** ইংরেজি 'Office' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে দপ্তর বা কার্যালয়।

**৩। অফিস কার্যের প্রকৃতিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?** [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর** অফিস কার্যের প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১। লেখা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্য
২। গণনা সংক্রান্ত কার্য
৩। শ্রেণিকরণ ও নথিকরণ সংক্রান্ত কার্য।

**৪। আধুনিক অফিসের কার্যাবলিকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

**উত্তর** আধুনিক অফিসের কার্যাবলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১। নৈমিত্তিক বা রুটিন কার্যাবলি এবং
২। প্রশাসনিক কার্যাবলি।

**৫। নথিবদ্ধকরণ কী?** [বাকাশিবো-২০০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৪(T)]
**অথবা, নথিকরণ কী?**
**অথবা, নথিবদ্ধকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর** নথিবদ্ধকরণ হল এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মূল্যবান কাগজপত্র ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ, করা হয়।

**৬। সূচিকরণ কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭]

**উত্তর** নথিবদ্ধ মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য যে নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা হয় তাকে সূচিকরণ বলে।

**৭। সাধারণ সূচি কয় প্রকার হয় এবং কী কী?**
**অথবা, সূচিকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর** সাধারণ সূচি চার প্রকার হতে পারে, যথা–

১। নির্দিষ্ট সাধারণ সূচি,
২। শিথিল সাধারণ সূচি,
৩। প্রসারিত সাধারণ সূচি,
৪। স্বয়ং সাধারণ সূচি।

**। বর্ণানুক্রমিক সূচি কী?**

**উত্তর** সূচিকরণের এ পদ্ধতিতে বর্ণের ক্রমানুসারে ব্যক্তি, বিষয়বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের নাম সূচির পৃষ্ঠাসমূহে লেখা হয়।

**১। ডেমি অফিসিয়াল পত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণের মাধ্যমে যে অফিসিয়াল পত্র রচনা করা হয়, তাকে Demi official letter বা আধা প্রাতিষ্ঠানিক বা আধা-সরকারি পত্র বলে।

**১০। নথিবদ্ধকরণের ৪টি আধুনিক পদ্ধতি লিখ।** [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর**

১। সমান্তরাল নথিকরণ,
২। পাইলট নথিকরণ,
৩। শ্যানন নথিকরণ,
৪। খাড়া নথিকরণ।

## ▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। অফিস বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** সাধারণ অর্থে দপ্তর বা অফিস বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝায় যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় করণিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে অফিসকে শুধুমাত্র করণিক কার্য সম্পাদনের স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। প্রকৃত অর্থে যে স্থানে একটি প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষিত হয় এবং কারবারের ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই অফিস বা দপ্তর বলা হয়। অফিসে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাগজে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে সংরক্ষিত তথ্যাদি বিভিন্ন স্থানে আদান-প্রদান করে থাকে।

**২। অফিস কার্য কী?** [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর ঃ** সাধারণ ও সহজ কথায়, অফিসে সম্পাদিত কার্যাবলিকেই অফিস কার্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সকল কার্য অফিসের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় তাই অফিস কার্য বা Office Work নামে পরিচিত। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন– উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, অর্থসংস্থান, পরিবহণ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি । এ সকল বিভিন্ন কার্যের মধ্যে যে সকল কার্য কাগুজে ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে অফিস কার্য বা Office Work বলে অভিহিত করা হয়।

**৩। অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?**

**উত্তর ঃ** অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। করণিক কাজ
২। প্রশাসনিক কাজ
৩। নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ
৪। শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ
৫। মানসিক কাজ
৬। গোপনীয়তা বজায় রাখা
৭। উন্নত কার্য পরিবেশ
৮। স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ
৯। কোলাহলমুক্ততা
১০। শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রের ব্যবহার

**৪। অফিসকে একটি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয় কেন?**

**উত্তর ঃ** অফিস কার্যের সাথে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় একে স্নায়ু কার্যের সাথে তুলনা করা যায়। স্নায়ু যেমন মানবদেহের প্রাণকেন্দ্র তেমনি অফিস প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন বিভাগের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এদের কাজকে সচল রাখে। তাই বলা হয়ে থাকে, অফিস একটি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ।

**৫। একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো কী?** [বাকাশিবো-২০১২, ১৩(T)]

**উত্তর ঃ** একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন
২। তথ্য প্রাপ্তি ও সংগ্রহ
৩। তথ্যাদির নথিকরণ
৪। তথ্যাদির প্রক্রিয়াজাতকরণ
৫। তথ্য সংরক্ষণ
৬। তথ্যাদি সরবরাহ
৭। যোগাযোগ রক্ষা
৮। হিসাবপত্র প্রণয়ন।

**৬। নথিকরণ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, পরি-১০]

**উত্তর ঃ** নথিকরণ বা নথিবদ্ধকরণ হল এমন একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুবিন্যস্তরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও মূল্যবান কাগজপত্র সাজিয়ে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

৭। **সূচিকরণ বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪, ১০]

**উত্তর ঃ** যে বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে সূচিকরণ বলে। এটা মূলত নথিভুক্ত কাগজপত্র সহজে খুঁজে বের করার সূত্র হিসেবে কাজ করে।

৮। **পায়রা-খোপ নথিকরণ কী?**

**উত্তর ঃ** এটি নথিকরণের একটি সনাতন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি আলমারি ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে উক্ত আলমারিতে ২৬টি খোপ থাকে। খোপগুলোর বহির্ভাগে A, B, C, D ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী কাগজপত্রগুলো নির্দিষ্ট খোপে সংরক্ষণ করা হয়। খোপগুলো দেখতে কবুতরের খোপের মত বলে নথিকরণের এ পদ্ধতিকে পায়রা-খোপ নথিকরণ বলে।

৯। **কার্ডসূচি কী?**

**উত্তর ঃ** এটা সূচিকরণের সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এতে কার্ডের ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি কার্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, নথি নম্বর প্রভৃতি লিখে তাকে একটি ট্রেতে শলাকার সাহায্যে গেঁথে রাখা হয়। অফিসের প্রয়োজন অনুসারে কার্ডগুলো সংখ্যানুযায়ী সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। অফিসের সংজ্ঞা দাও। অফিস কার্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.১ ও ১১.১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। অফিস কার্য কী? অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.১ ও ১১.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। একটি আধুনিক অফিসের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.২.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। নথিবদ্ধকরণ বলতে কী বুঝায়? নথিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.৩ ও ১১.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। নথিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, পরি-১১]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। সূচিকরণ বলতে কী বুঝায়? সূচিকরণের পদ্ধতি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]
অথবা, সূচিকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.৩ ও ১১.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। তথ্য সংরক্ষণে নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১১.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



********

# অধ্যায়-১২

# প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র
# (Official and Semi-Official Letters)

*অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ*

*১২.০ সূচনা; ১২.১ পত্র যোগাযোগের প্রকারভেদ; ১২.২ বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশ; ১২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের সংজ্ঞা; ১২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য; ১২.৫ সাক্ষাৎকার, নিয়োগ, চাকরিতে যোগদান ও চাকরির জন্য আবেদন পত্র, অভিযোগ পত্র এবং দরপত্র বিজ্ঞাপ্তি*

## ১২.০ সূচনা (Introduction) ঃ

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পত্র বলতে কোন তথ্য বা সংবাদ বা কোন প্রয়োজনকে বিশেষ নিয়মে কাগজে লিখে অন্যের নিকট তুলে ধরার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। বহুকাল পূর্ব থেকেই পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে আসছে। যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, সে সময়ে মানুষ বিভিন্ন গাছের পত্রে কোন কিছু লিখে রাখতো। সে থেকে পত্রের উৎপত্তি। আজও লিখিত সংবাদ বা তথ্যকে পত্র বলা হয়।

পত্র আজকের দিনে আমাদের ব্যস্টিক ও সমষ্টিগত জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। এর মাধ্যমে অতি সহজে ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। পত্রের মাধ্যমেই আমরা দূর-দূরান্তে অবস্থিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে খবরাদি পাঠাই। তাদের কুশলাদি জানি এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরিতে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও অন্যান্য বৈষয়িক প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি। মোটকথা, বর্তমানকালে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নির্ভরযোগ্য এবং স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার এক অনন্য কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে 'পত্র'। কারবারি জগৎ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে 'পত্রের' ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান জগতে বহু ধরনের পত্র রচনা করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র। প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি নিয়ে দুটি অফিস বা দু'জন অফিস কর্মচারী অথবা দুটি বিভাগের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়, তাকে বলা হয় প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বা Official letter. এ জাতীয় পত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অফিস সংক্রান্ত খবরাখবর আদান-প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনা করার সময় প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ও আইনকানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হয়। এ জাতীয় পত্রে পত্রলেখকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আবেগাপ্লুত ভাষা ব্যবহার করার অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে, অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণের মাধ্যমে যে অফিসিয়াল পত্র রচনা করা হয়, তাকে বলা হয় আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বা Demi-Official letter. এ জাতীয় পত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অফিস সংক্রান্ত খবরাখবরসমূহের পাশাপাশি ব্যক্তিগত খবরাখবরের সংমিশ্রণ ঘটানো। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনা করার সময় প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লিখার রীতিনীতি ও আইনকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। কার্যত এ জাতীয় পত্রে ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ স্থান পেলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অফিস সংক্রান্তই হয়ে থাকে।

## ১২.১ পত্র যোগাযোগের প্রকারভেদ (Types of Correspondence) ঃ

আধুনিক যুগে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতে দেখা যায়। যোগাযোগের প্রকৃতি, পত্রের ব্যবহার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পত্রকে এখানে উল্লেখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা ঃ

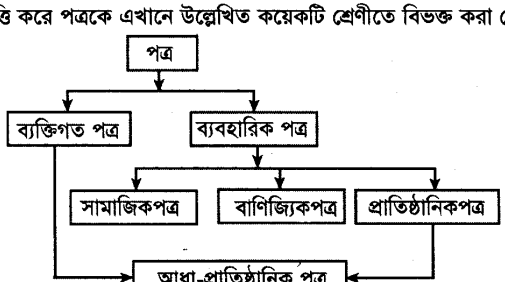


চিত্র ঃ ১২.১ পত্রের শ্রেণিবিভাগ

**১। ব্যক্তিগত পত্র (Private or Personal Letter) ঃ** পারিবারিক বা ব্যক্তিগত খবরা-খবর আদান-প্রদানের জন্য যে পত্র লেখা হয়, তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে। এ পত্রে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, আবেগ-উচ্ছ্বাস, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-শিক্ষক, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য বা ভাবের বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এ পত্র রচিত হয়।

**২। ব্যবহারিক পত্র (Applied Letter) ঃ** যে পত্রে অফিস-আদালত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় কথা লেখা হয় অথবা কোন বৈষয়িক বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্যাদির আদান-প্রদানের জন্য যে পত্র রচিত হয়, তাকে ব্যবহারিক পত্র বলে। ব্যবহারিক পত্রের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে এবং এদের লিখন পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

**৩। সামাজিক পত্র (Social Letter) ঃ** সামাজিক কোন অনুষ্ঠান বা সমষ্টিগত কাজে যে সব পত্র লেখা হয় সেগুলোকে সামাজিক পত্র বলে। সমাজের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে এ পত্র রচিত হয়ে থাকে। সামাজিক পত্র অনেকটা ব্যক্তিগত ধাঁচের। তবে এর লিখন পদ্ধতি সাধারণ পত্রের মত নয়। একটি বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশলে এরূপ পত্র লিখতে হয়। নিমন্ত্রণ পত্র, অভিনন্দন পত্র, ধন্যবাদ জ্ঞাপনপত্র, শোক জ্ঞাপনপত্র, প্রতিবেদন প্রভৃতি সামাজিক পত্রের উদাহরণ।

**৪। বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Letter) ঃ** ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত পত্রকে বাণিজ্যিক পত্র বলে। ব্যবসায়িক বিভিন্ন তথ্যের আদান-প্রদান, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন, পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শর্ত নির্ধারণ, দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, দাবি ও অভিযোগ পেশ ইত্যাদি কাজে বাণিজ্যিক পত্র রচনা করা হয়। একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এ পত্র রচনা করা হয়।

**৫। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র (Official Letter) ঃ** অফিসিয়াল বিষয়টি নিয়ে লিখিতপত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বলে। সাধারণত দুটি অফিস বা দু'জন অফিস কর্মচারী অথবা দুটি বিভাগের মধ্যে এ পত্রের বিনিময় হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনা করতে প্রাতিষ্ঠানিক কলা-কৌশল রীতিনীতি ও আইনকানুন কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

**৬। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র (Semi-official Letter) ঃ** অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণে যে অফিসিয়াল পত্র রচনা করা হয়, তাকে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা ডেমি-অফিসিয়াল পত্র বলে। এ পত্র কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক এবং কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়। তবে ব্যক্তিগত বিষয় এতে স্থান পেলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অফিস সংক্রান্তই হয়ে থাকে। সাধারণত সমপর্যায়ের কর্মচারী বা যে সকল কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও জানাশোনা আছে তাদের মধ্যে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

## ১২.২ বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশ (Different parts of a Commercial Letter) ঃ

সাধারণত একটি বাণিজ্যিক পত্রে যে কাঠামো অনুসরণ করা হয় তাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। শিরোনাম | ২। সূত্র নম্বর | ৩। তারিখ |
| ৪। অভ্যন্তরীণ ঠিকানা | ৫। সম্বোধন | ৬। বিষয় শিরোনাম |
| ৭। মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু | ৮। বিদায় সম্ভাষণ | ৯। স্বাক্ষর |
| ১০। অনুলিপি | ১১। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি। | |

**নিম্নে প্রত্যেকটি অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল ঃ**

**১। শিরোনাম (Title) ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিরোনামা। পত্রের শীর্ষে বা উপরিভাগের যে অংশে পত্রপ্রেরক প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, লাইসেন্স নম্বর, টেলিগ্রাফিক ঠিকানা ইত্যাদি লেখা থাকে তাকে বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনামা বলে। সাধারণত পত্রের এ অংশটি পূর্ব থেকে মুদ্রিত থাকে এবং এটি পত্র লেখকের পরিচয় বহন করে।

নিম্নে বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনামার নমুনা দেখানো হল ঃ

**হক পাবলিকেশনস্**
(পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা)

| | |
|---|---|
| ফোন ঃ ৭১২২৩৬৯ | ৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা) |
| গ্রাম ঃ নলুয়া | ঢাকা-১১০০ |
| সূত্র ঃ | তারিখ ঃ |

পত্রের শিরোনামার উপর একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য নির্ভর করে। কেননা, এর মাধ্যমেই পত্রপ্রেরক প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই শিরোনামা যাতে রুচিসম্মত হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

**২। সূত্র নম্বর (Source) ঃ** বর্তমান যুগে সূত্র নম্বর বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত শিরোনামার নিচে বাম পার্শ্বে সূত্র নম্বর উল্লেখ করতে হয়। কখনো কখনো শিরোনামা অংশেই 'সূত্র নম্বর' কথাগুলো মুদ্রিত থাকে এবং পত্র লেখার সময় শুধু পত্রসংখ্যা বা নম্বর লেখা হয়। পত্রে সূত্র নম্বর উল্লেখ থাকলে পত্রলেখক ও পত্রপ্রাপক উভয়েরই যথেষ্ট সুবিধা হয়। এতে প্রয়োজনবশত পত্রাদি খুঁজে বের করে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

**৩। তারিখ (Date) ঃ** বাণিজ্যিক পত্রে তারিখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত শিরোনামার একটু নিচে ডান পার্শ্বে বাণিজ্যিক পত্রের তারিখ লেখা হয়। তারিখ লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, সঠিকভাবে তারিখ উল্লেখ না থাকলে ব্যবসায়ের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। তাছাড়া তারিখবিহীন পত্রের কোন মূল্য নেই।

**৪। অভ্যন্তরীণ ঠিকানা (Internal address) ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের অভ্যন্তরে শিরোনামার বাম দিকে সূত্র নম্বরের সামান্য নিচে যে অংশে প্রাপকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লেখা হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ ঠিকানা বলে। অভ্যন্তরীণ ঠিকানায় সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ করতে হয়।

(ক) পত্রপ্রাপকের নাম ও পদবী

(খ) প্রাপকের প্রতিষ্ঠানের নাম

(গ) প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ঠিকানা।

এক্ষেত্রে বিদেশে লিখিত পত্রের বেলায় অবশ্যই দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

**৫। সম্বোধন ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের অভ্যন্তরীণ ঠিকানার ঠিক নিচেই বাম পার্শ্ব বরাবর এ অংশ লেখা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট প্রাপককে সম্ভাষণ বা অভিবাদন জানিয়ে সম্বোধনসূচক শব্দ যেমন– জনাব, প্রিয় জনাব, মহোদয়, মহাশয়, ভদ্র মহোদয়গণ, মাননীয়, মহাত্মন, সুধী, সবিনয় নিবেদন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

**৬। বিষয় শিরোনাম (Subject title) ঃ** পাঠক যাতে পত্রের মূল বক্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারে সে জন্য সম্বোধনের দুই/এক সারি নিচে বা উপরে দু'এক লাইনে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে 'বিষয় শিরোনামে' উল্লেখ করতে হয়। পত্রের প্রাপক বিষয় শিরোনাম পড়েই পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হন।

**৭। মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু (Body) ঃ** এটি পত্রের প্রধানতম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশে পত্রলেখক পত্রের মূল বক্তব্য বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরে। সম্বোধন ও বিষয় শিরোনামের নিচে পত্রের মূল বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ছোট ছোট অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে লেখা হয়। একে পত্রের গর্ভাংশ বলা হয়।

পত্রের বিষয়বস্তু পত্রের প্রাণস্বরূপ। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অল্প কথায় মূল বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করতে হয়।

**৮। বিদায় সম্ভাষণ (Discourse) ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের বিষয়বস্তু লেখা শেষে প্রাপককে বিদায় জানানোর রীতি ব্যবসায় জগতে প্রচলিত আছে। একেই বাণিজ্যিক পত্রের বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় অভিবাদন বলা হয়। পত্রের মূল বক্তব্য বিষয়ের নিচে ডান পার্শ্বে (অবশ্য পার্শ্ব সমান পদ্ধতিতে বাম পার্শ্বেও) বিনয় ও সৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে পত্র প্রাপকের প্রতি লেখকের আন্তরিকতা প্রকাশ করে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। এক্ষেত্রে প্রাপকের মর্যাদা, প্রাপকের সাথে লেখকের সম্পর্ক এবং প্রারম্ভিক সম্বোধনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার বিশ্বস্ত, আপনার অনুগত, বিনীত, নিবেদক, একান্ত বাধ্যগত, আপনার একান্ত অনুগত, বিনীত নিবেদক, শ্রদ্ধাবনত, ভবদীয় ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

**৯। স্বাক্ষর বা দস্তখত (Signature) ঃ** বিদায় সম্ভাষণের পর এক বা দুই সারি নিচে ডান দিকে (পার্শ্ব সমান পদ্ধতিতে বাম দিকে) পত্র লেখকের স্বাক্ষর করতে হয়। বস্তুতপক্ষে, এটি পত্রের সর্বশেষ অংশ। পত্রের অন্যান্য অংশ থেকে এ অংশের গুরুত্ব অনেকাংশে বেশি। কেননা স্বাক্ষরবিহীন পত্রের কোন মূল্য থাকে না।

পত্র লেখককে পত্র লেখা শেষে নিজ হাতে স্বাক্ষর বা দস্তখত করতে হয়। এক্ষেত্রে কোন প্রকার টাইপ করা বা সীলযুক্ত (Facsimile) স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাক্ষরের সাথে লেখকের পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হয়।

**১০। অনুলিপি (Dictation) ঃ** অনেক সময় পত্রের প্রাপক ছাড়াও অন্য কোন ব্যক্তিকে পত্রের বিষয় জানানোর প্রয়োজন হলে অনুলিপি প্রেরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে স্বাক্ষর ও নামের একটু নিচে পত্রের বাম পার্শ্বে 'অনুলিপি প্রেরিত হল বা 'অনুলিপি প্রেরণ' লিখে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুলিপি প্রেরিত হবে তাদের নাম-ঠিকানা ক্রমিক নম্বর দিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এটি বাণিজ্যিক পত্রের একটি অতিরিক্ত অংশ।

**১১। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি (Attachment) ঃ** বাণিজ্যিক পত্রে অনেক সময় প্রামাণ্য দলিলাদি ও কাগজপত্র সংযোজিত করতে হয়। একেই ক্রোড়পত্র বলে। এটিও বাণিজ্যিক পত্রের একটি অতিরিক্ত অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। পত্রের নিচের অংশে বাম পার্শ্বে ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি লিখে পত্রের সাথে কী কী কাগজ প্রেরিত হল সে সব কাগজপত্রের নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করতে হয়।

নিম্নে ছকের সাহায্যে বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বিন্যাস বা বিভিন্ন অংশের অবস্থান দেখানো হল ঃ

| | |
|---|---|
| | **(১) শিরোনাম ঃ**<br>**হক পাবলিকেশনস্**<br>(পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা) |
| ফোন নং ৭১২২৩৬৯<br>গ্রাম ঃ নলুয়া | ৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা)<br>ঢাকা-১১০০। |
| (২) সূত্র ঃ বিক্রয়/৯৭-৩১(২) | (৩) তারিখ ঃ ২৫ শে মার্চ, ২০০৮ |
| (৪) অভ্যন্তরীণ ঠিকানা ঃ | |
| ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী<br>মিয়ার হাট<br>নোয়াখালী। | |
| (৫) বিষয় শিরোনাম ঃ বিভিন্ন প্রকার বই-এর মূল্য তালিকা প্রেরণ। | |
| (৬) সম্বোধন ঃ | |
| জনাব/মহোদয়/মহাশয় | |
| (৭) মূল বক্তব্য ঃ | |
| | (৮) বিদায় সম্ভাষণ |
| | আপনার বিশ্বস্ত, |
| | (৯) স্বাক্ষর ঃ |
| | এন, হক<br>স্বত্বাধিকারী |
| (১০) অনুলিপি ঃ | |
| অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ<br>১। ----<br>২। ---- | |
| (১১) ক্রোড়পত্র ঃ ১ | |
| ১। বই-এর মূল্য তালিকা। | |

## ১২.২.১ বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি (Style of Commercial Letter Format) ঃ

বাণিজ্যিক পত্রের আঙ্গিক গঠন ও কাঠামো বিন্যাসের উপর এর আকর্ষণীয়তা ও সামগ্রিক সৌন্দর্য নির্ভর করে। এ জন্য বাণিজ্যিক পত্র রচনার পূর্বেই পত্রের বিষয়বস্তুকে কীভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করা যায় এবং প্রাপক যাতে পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে জন্য লেখককে পত্রের কাঠামো বিন্যাসের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হয়।

বাণিজ্যিক পত্রের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন রীতি বা পদ্ধতিতে সাজিয়ে উপস্থাপন করা যায়। সাধারণত পত্রের কাঠামো বিন্যাসের নিম্নোক্ত রীতি বা পদ্ধতিগুলোর প্রচলন দেখা যায়, যথা ঃ

১। সাধারণ পদ্ধতি (The Ordinary style)
২। খাঁজকাটা বা সিঁড়ি পদ্ধতি (The Indented style)
৩। পার্শ্বসমান বা ব্লক পদ্ধতি (The Blocked style);
৪। আধা-পার্শ্বসমান বা সেমি ব্লক পদ্ধতি (Semi Blocked style);
৫। পরিমার্জিত পার্শ্বসমান পদ্ধতি (Modified Blocked style);
৬। ঝুলন্ত পদ্ধতি (The Hanging style)।

নিম্নে পত্রের কাঠামো বিন্যাসের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

**১। সাধারণ পদ্ধতি (Ordinary style) ঃ** পত্র লেখার এ পদ্ধতি অতি পুরাতন এবং এতে বিষয় বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট বা ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। এ পদ্ধতিতে পত্রলেখক তার ইচ্ছেমত পত্রের কাঠামো বিন্যাস করে থাকেন। সাধারণত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এ রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয়।

**২। খাঁজকাটা বা সিঁড়ি পদ্ধতি (Indented style) ঃ** এ পদ্ধতিতে পত্রের বিভিন্ন অংশকে কতকগুলো লাইন বা প্যারা করে বিভিন্নস্থানে স্থাপন করা হয় এবং বিষয়বস্তুর প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দটি বাম দিকের মার্জিনের সামান্য ডান দিকে সরিয়ে লেখা হয়। এ রীতিতে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম লাইন একটু ডান দিকে সরে যাওয়ায় বাম দিকে সিঁড়ির মত কতগুলো ফাঁকা স্থান দৃষ্ট হয়। তাই এ পদ্ধতিকে সিঁড়ি বা খাঁজকাটা পদ্ধতি বলে।

খাঁজকাটা পদ্ধতিতে পত্রের উপরিভাগের মধ্যস্থলে শিরোনাম, ডানদিকে তারিখ এবং বাম পার্শ্বে অভ্যন্তরীণ ঠিকানা ও সম্বোধন থাকে। এতে বিদায় সম্ভাষণ বামে এবং ডানদিকে স্বাক্ষর থাকে।

**নিম্নে খাঁজকাটা পদ্ধতির নমুনা দেখানো হলো ঃ**

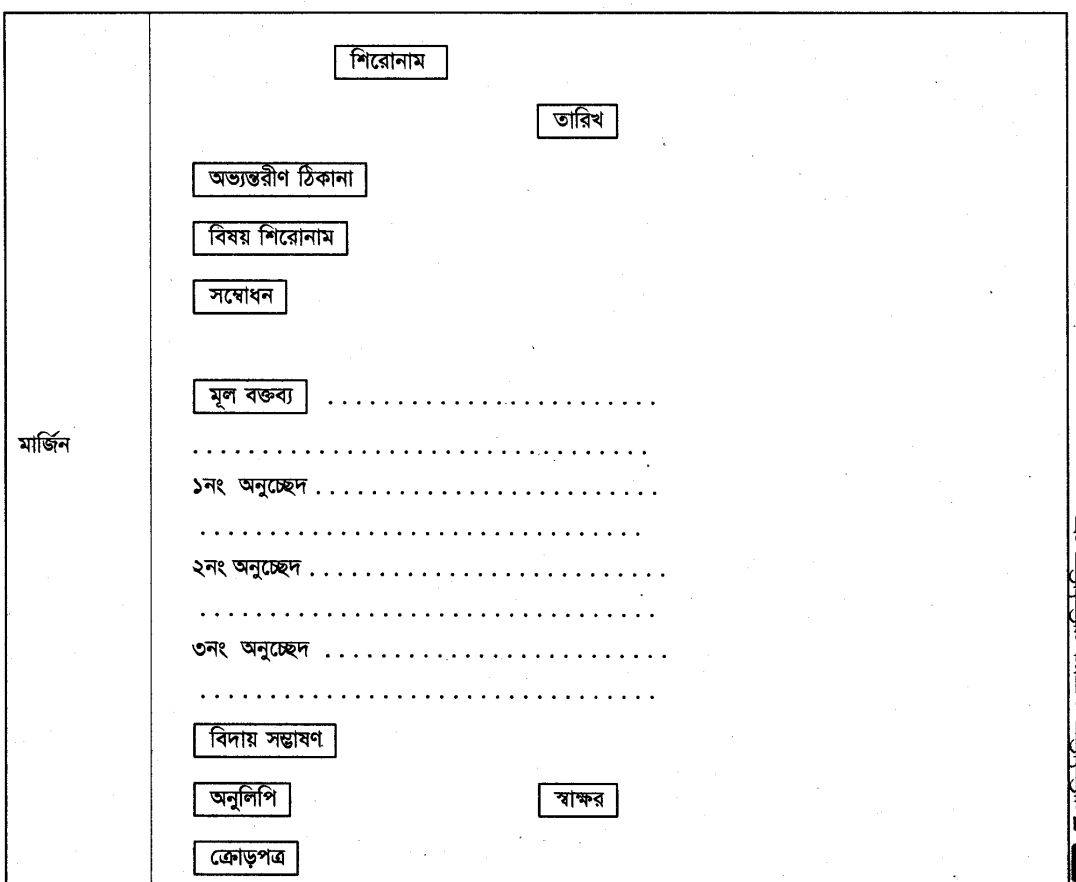


**৩। পার্শ্বসমান বা ব্লক পদ্ধতি (Blocked style) ঃ** পত্রের বিভিন্ন অংশগুলোকে এ পদ্ধতিতে বাম পার্শ্ব বরাবর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমান্তরালভাবে সন্নিবেশিত করা হয়। পত্রের মধ্যভাগে বা ডান পার্শ্বে কোন অংশ আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয় না। বর্তমান কারবার জগতে এ পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

**নিম্নে পার্শ্বসমান পদ্ধতির নমুনা দেয়া হল ঃ**

মার্জিন

শিরোনাম

তারিখ

অভ্যন্তরীণ ঠিকানা

সম্বোধন

বিষয় শিরোনাম

---

---

---

---

মূল বক্তব্য

---

---

---

বিদায় সম্ভাষণ

অনুলিপি

ক্রোড়পত্র

স্বাক্ষর

**৪। আধা-পার্শ্বসমান বা সেমি ব্লক পদ্ধতি (Semi-blocked style) ঃ** খাঁজকাটা ও পার্শ্ব সমান পদ্ধতির সংমিশ্রণে এ কাঠামো বিন্যাস করা হয়। এ পদ্ধতিতে পত্রের অনুচ্ছেদগুলো খাঁজকাটা রীতি অনুযায়ী লেখা হয় এবং অন্য অংশগুলো নিজ নিজ স্থানে ব্লক ফরমে অর্থাৎ পার্শ্বসমান পদ্ধতিতে লেখা হয়।

**নিম্নের চিত্রে আধা-পার্শ্বসমান পদ্ধতির নমুনা দেখানো হল ঃ**

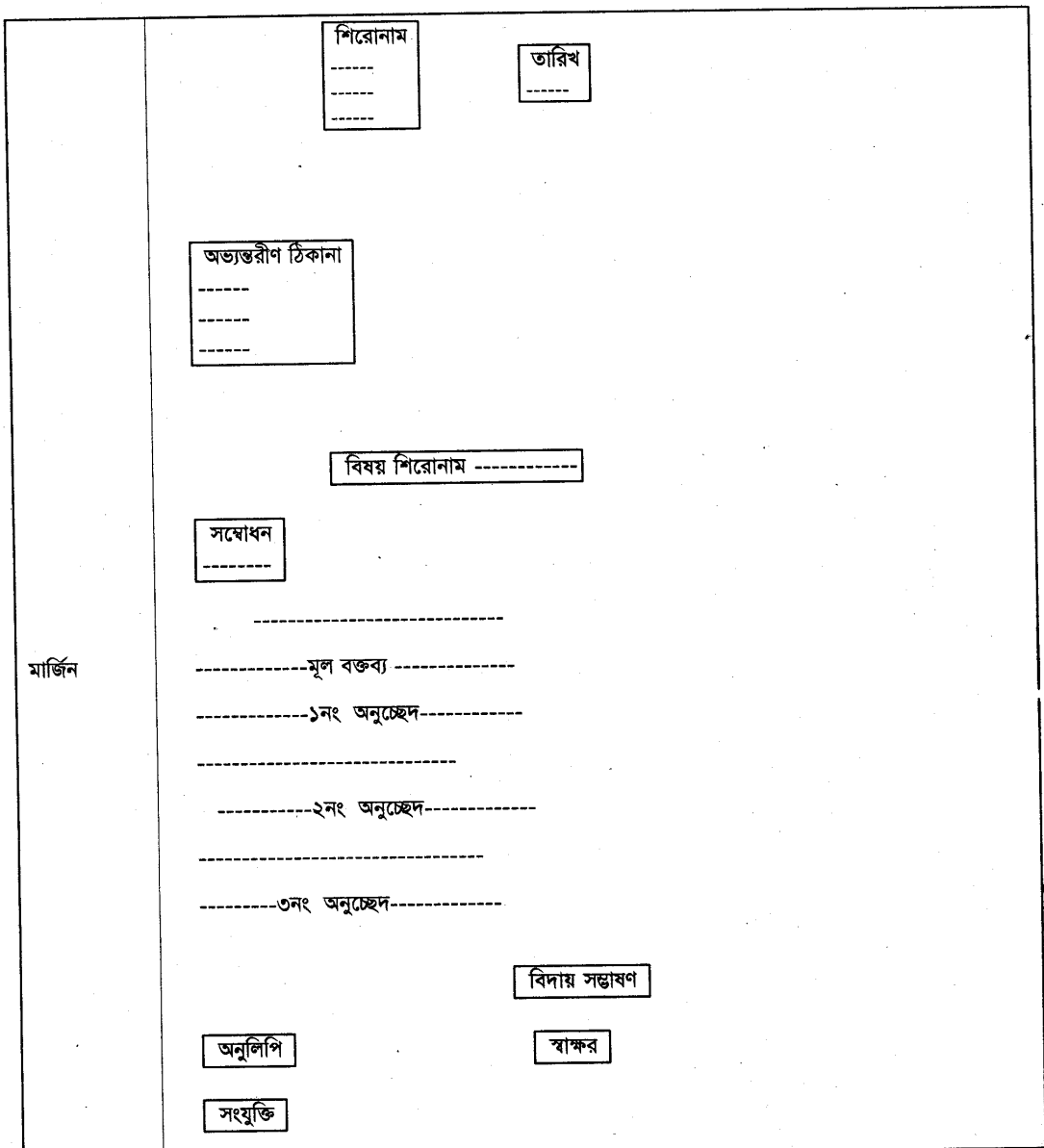


**৫। পরিমার্জিত পার্শ্বসমান পদ্ধতি (Modified blocked style) ঃ** এ পদ্ধতিটিও খাঁজকাটা ও পার্শ্বসমান পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত। এ বিন্যাস পদ্ধতিতে পত্রের তারিখ, সূত্র নম্বর, বিদায় সম্ভাষণ ও স্বাক্ষর ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় বা অংশগুলোকে বাম পার্শ্ব বরাবর উপরে নিচে সমান্তরালভাবে লেখা হয়। আধুনিক কারবারি জগতে এ পদ্ধতির যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

**নিম্নের চিত্র থেকে এ পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে ঃ**

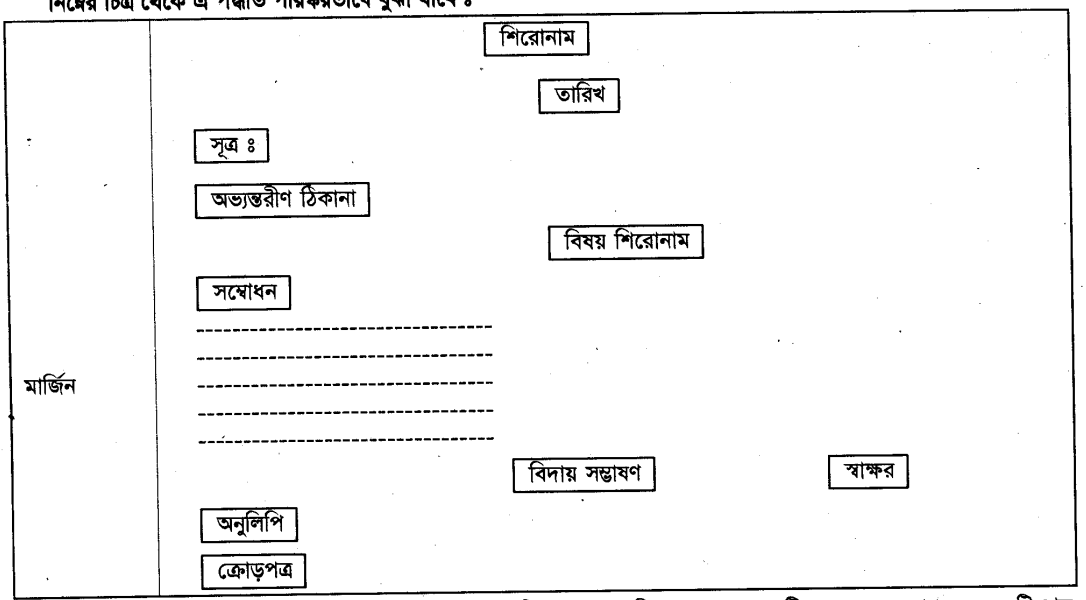


**৬। ঝুলন্ত পদ্ধতি (Hanging style) ঃ** এ বিন্যাস পদ্ধতিতে পত্রের বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের প্রথম কয়েকটি শব্দ পাঠকের নিকট বিশেষভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনকে পরবর্তী লাইনগুলো হতে একটু বামে সরিয়ে লেখা হয়। পরবর্তী লাইনগুলো বাম পার্শ্বে উপর নিচে সমান্তরালভাবে লেখা হয় এবং পত্রের অন্যান্য অংশগুলো খাঁজকাটা বা পার্শ্বসমান যে কোন পদ্ধতিতে লেখা যায়।

**নিম্নে ঝুলন্ত পদ্ধতির নমুনা দেয়া হল ঃ**

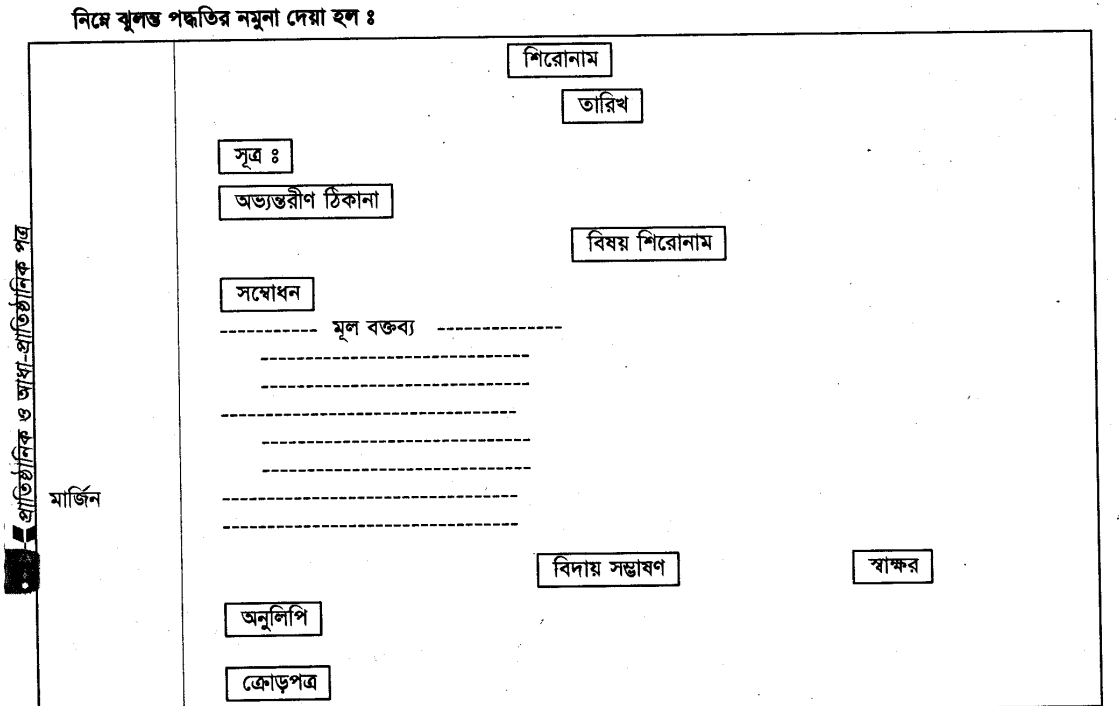

## ১২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের সংজ্ঞা (Definition of Official and Semi-official Letter) ঃ

**প্রাতিষ্ঠানিক পত্র (Official letter) ঃ** সাধারণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ অফিসিয়াল বিষয় সম্পর্কে লিখিত পত্রই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল পত্র। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অফিস সংক্রান্ত খবরাখবর আদান-প্রদান করা। সুতরাং বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি নিয়ে দুটি অফিস বা দু'জন অফিস কর্মচারী অথবা দুটি বিভাগের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় তাকে বলা হয় প্রাতিষ্ঠানিক পত্র।

প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক আদবকায়দা, রীতিনীতি ও আইনকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এ জাতীয় পত্রে লেখকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও আবেগ অনুভূতিজনিত ভাষা ব্যবহারের অবকাশ থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বলতে শুধু সরকারি অফিসের পত্রকেই বুঝায় না। এক্ষেত্রে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি ইত্যাদি যে কোন অফিসের পত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

**আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র (Semi-official letter) ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল পত্রে ব্যক্তিগত সংবাদের সংযুক্তি করা হলে তাকেই আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা ডেমি-অফিসিয়াল পত্র বলে। এ পত্র কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক ও কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণে যে পত্র রচনা করা হয়, তাকে বলা হয় আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা ডেমি-অফিসিয়াল পত্র।

আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লেখার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লেখার আদাবকায়দা, রীতিনীতি ও আইনকানুনসমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয় না। এ জাতীয় পত্রে ব্যক্তিগত বিষয় স্থান পেলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অফিস সংক্রান্তই হয়ে থাকে। সাধারণত সমপর্যায়ের কর্মচারী বা যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও জানাশোনা আছে, তাদের মধ্যে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

## ১২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Official and Semi-official Letters) ঃ

পত্রের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, লিখন পদ্ধতি, বক্তব্য, ভাষা, সম্ভাষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের পার্থক্যসমূহ পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হল ঃ

| পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য | প্রাতিষ্ঠানিক পত্র | আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র |
|---|---|---|
| ১। উদ্দেশ্য | প্রতিষ্ঠানেই এরূপ পত্র লিখিত হয়। | প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এখানে স্থান পায়। |
| ২। প্রকৃতি | প্রাতিষ্ঠানিক পত্র একেবারেই অফিস ভিত্তিক। | এরূপ পত্রের প্রকৃতি মিশ্র। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু এখানে থাকে। |
| ৩। কাঠামো | সুপ্রতিষ্ঠিত পত্র লিখন কাঠামো এক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয়। | একেবারে বাঁধাধরা কোন কাঠামো এক্ষেত্রে নেই। লেখকের ইচ্ছামত কাঠামো সৃষ্টি করা চলে। |
| ৪। ভাষা | একেবারে গদবাঁধা নিয়মতান্ত্রিক ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লিখিত হয়ে থাকে। | পত্র লেখকের ইচ্ছানুসারে আবেগাপ্লুত ভাষাও ব্যবহার করা চলে। |
| ৫। ব্যক্তি ও পদমর্যাদা | প্রাতিষ্ঠানিক পত্রে পত্রলেখক একে বারেই গুরুত্বহীন, শুধুমাত্র তার পদ মর্যাদাই এখানে গুরুত্ব লাভ,করে। | আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রে পত্র প্রাপকের নিকট পত্রলেখকই অধিক গুরুত্ব বহন করে। |
| ৬। প্রকারভেদ | পত্রের প্রকৃতি অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বিভিন্ন শ্রেণীর হয়। যেমন– জরুরি, অতি জরুরি, গোপনীয়, অতি গোপনীয়, সাধারণ ইত্যাদি। | আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে এরূপ কোন শ্রেণিবিন্যাস নেই। |

| পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য | প্রাতিষ্ঠানিক পত্র | আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র |
|---|---|---|
| ৭। ব্যবহৃত ব্যাকরণ | উত্তম বা নাম পুরুষে এরূপ পত্র লিখা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বহু বচনের ব্যবহার দেখা যায়। | পত্র লেখক ও প্রাপকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যে কোন পুরুষে এরূপ পত্র লেখা চলে, তবে এটি অবশ্যই এক বচনে হয়। |
| ৮। অনুলিপি ব্যবহার | অন্যান্যদের অবগতির জন্য এরূপ পত্রের অনুলিপি প্রদান করা চলে। | আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের অনুলিপি কাউকে দেয়া চলে না। |
| ৯। পারস্পরিক সম্পর্ক | প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সম্পর্ক এ ধরনের পত্রের মূল দিক। | ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্কের জন্যই এরূপ পত্র লিখিত হয়। |
| ১০। রচনা পদ্ধতি | রচনা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয়বিদই হতে পারে। | শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতেই এটি রচিত হয়। |
| ১১। সম্বোধন ও বিদায় ভাষণ | এ পত্রে প্রারম্ভিক সম্বোধন ও বিদায় ভাষণ নাও থাকতে পারে। | এ পত্রে প্রারম্ভিক সম্বোধন ও বিদায় ভাষণ থাকে। |
| ১২। ক্রোড়পত্র | এ পত্রের সাথে ক্রোড়পত্র সংযুক্ত থাকে। | এক্ষেত্রে ক্রোড়পত্র নাও থাকতে পারে। |

## ১২.৫ সাক্ষাৎকার, নিয়োগ, চাকরিতে যোগদান ও চাকরির জন্য আবেদন পত্র, অভিযোগ পত্র এবং দরপত্র বিজ্ঞাপ্তি (Interview, Appointment, Joining Letter and Application for Employment complain letter, tender notice) ঃ

### ১২.৫.১ সাক্ষাৎকার পত্র কাকে বলে (What is a letter of Interview) ঃ

চাকরি প্রার্থীকে কোন চাকরিতে নিয়োগ করার পূর্বে চাকরিদাতা বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে থাকেন। যে পত্রের মাধ্যমে চাকরিদাতা বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান চাকরি প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকেন বা আহ্বান জানান তাকেই সাক্ষাৎকার পত্র (Interview letter) বলা হয়।

নিয়োগকারী বা চাকরিদাতা সংবাদপত্রে বা অন্য কোন মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কর্মখালির কথা ঘোষণা করলে চাকরি প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট পদের জন্য আবেদন পেশ করে। অতঃপর নিয়োগকারী আবেদনপত্রগুলো বাছাই করে উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ডাকেন। আবেদনকারীকে বিভিন্ন পরীক্ষায় বা সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পত্র লেখা হয়। এ পত্রই সাক্ষাৎকার পত্র নামে অভিহিত হয়। সাধারণত লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদেরকে মৌখিক নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ডাকা হয়ে থাকে।

**অধ্যাপক এল. রহমান**-এর ভাষায়, "যে পত্রের দ্বারা প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হবার নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়া হয় তাকে সাক্ষাৎকার পত্র বলে।"

সুতরাং বলা যায় যে, চাকরির আবেদন পত্র পাওয়ার পর নিয়োগকর্তা চাকরি প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদে মনোনয়ন দানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য হাজির হওয়ার নিমিত্তে যে পত্র লেখেন তাকে সাক্ষাৎকার পত্র বলে। সাক্ষাৎকার পত্রের মাধ্যমে চাকরি প্রার্থীকে, নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট দিনে, নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জ্ঞাপন করা হয়। এ পত্রে চাকরি প্রার্থীর আবেদনপত্রের সূত্র, পদের নাম, সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় ও স্থান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। তাছাড়া সাক্ষাৎকারে হাজির হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (মূল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য দলিলপত্র) সঙ্গে নিয়ে আসার কথা এবং ইন্টারভিউতে হাজির হওয়ার জন্য কোন ভ্রমণ ভাতা ও অবস্থান ভাতা (T.A/D.A) দেয়া হবে কিনা তাও উল্লেখ করা হয়।

## ১২.৫.২ সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্য (Objects of Writing of a Interview Letter) ঃ

চাকরির জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে মূলত সাক্ষাৎকার পত্র রচনা করা হয়। এরূপ পত্র রচনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **চাকরি প্রার্থী সম্পর্কে সম্যক ধারণা (Knowledge about interviewer)** ঃ চাকরি প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার পত্র প্রেরণ করা হয়।

২। **শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই (Estimate educational qualification)** ঃ যে পদের জন্য আবেদন করেছে তারই প্রেক্ষিতে প্রার্থীর লেখাপড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য নিয়োগকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নিমিত্তে সাক্ষাৎকার পত্র রচনা করা হয়।

৩। **ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ (Concept about personaliti)** ঃ প্রার্থীর সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলে তার হাবভাব, চালচলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিয়ে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তা সাক্ষাৎকার পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হতে বলেন।

৪। **বিশেষ জ্ঞান ও আগ্রহ পরীক্ষা (Evaluation special knowledge & curisity)** ঃ সাক্ষাৎকার পত্রের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রার্থী যে পদে আবেদন করেছে সে পদের জন্য যে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা কোন্ প্রার্থীর মধ্যে কীরূপ আছে তা যাচাই এবং কাজের প্রতি তার ঝোঁক বা আগ্রহ কীরূপ তা পরীক্ষার জন্য প্রার্থীকে নিয়োগকর্তার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

৫। সর্বোপরি, নিয়োগকর্তা সাক্ষাৎকার পত্র প্রেরণ করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় অবগত হতে চান যা লিখিত বা অন্য কোন পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

## ১২.৫.৩ সাক্ষাৎকার পত্রের কতিপয় নমুনা (Sample of Interview Letter) ঃ

**১। একটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদের জন্য একজন প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ জানিয়ে সাক্ষাৎকার পত্র।**

হক পাবলিকেশনস্
(পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা)
৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সূত্র সংখ্যা ১৫৩/এ
জনাব মোঃ আবদুল মালেক
প্রযত্নে-জনাব আহমদ হোসেন
পলিটেকনিক স্টাফ কোয়ার্টার
তেজগাঁও শিল্প এলাকা।
ঢাকা-১২০৭।

ফোন ঃ ৭১২২৩৬৯
তারিখ ঃ ১৭ মার্চ ২০১৪

**বিষয় ঃ ব্যবস্থাপক পদে সাক্ষাৎকার।**

জনাব,

উপরোক্ত পদের জন্য আপনার প্রেরিত আবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে আপনাকে আগামী ২৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় আমাদের উল্লেখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুগ্রহপূর্বক সাক্ষাৎকারে কালে আপনার মূল সার্টিফিকেটগুলো সঙ্গে আনবেন। উল্লেখ থাকে যে, সাক্ষাৎকার উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে কোন প্রকার খরচ বা ভ্রমণ ভাতা দেয়া হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
এম. এন. হক
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

**২। একটি প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক পদে মনোনয়নের জন্য কোন একজন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারে মিলিত হবার জন্য সাক্ষাৎকার পত্র।**

প্রাইম এন্টারপ্রাইজ
৮৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

২১ মার্চ ২০১৪

সূত্র/নিয়োগ/০২ (১৩)
জনাব মোঃ ফজলুর রহমান
৬৭/এ, নিউ ইস্কাটন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১০০০।

**বিষয় ঃ সাক্ষাৎকার**

জনাব,

আপনার ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাবরক্ষক পদের জন্য প্রেরিত আবেদনপত্রটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আপনাকে আগামী ২৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১০টার সময় অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে আমাদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সাক্ষাৎকার কালে অনুগ্রহপূর্বক এ পত্রটি সঙ্গে আনবেন। প্রতিষ্ঠান আপনাকে কোন প্রকার টি. এ/ডি. এ. প্রদান করবে না।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
রাবেয়া রিতু
জেনারেল ম্যানেজার
(পার্সোনেল)।

## ১২.৫.৪ নিয়োগপত্র কী (What is an Appointment Letter) ঃ

নিয়োগকর্তা চাকরি প্রার্থীকে তার প্রার্থিত পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে যে পত্র লেখেন তাকে নিয়োগপত্র বলে। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকর্তা সংবাদপত্র বা অন্য কোন মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কর্মখালির সংবাদ দিলে আবেদনকারীরা (চাকরি প্রার্থীরা) উক্ত পদের জন্য আবেদন পেশ করে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিয়োগকর্তা সেগুলো বাছাই করে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে পাঠান এবং সাক্ষাৎকারের পর যে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তাকে চাকরিতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখা হয়। এ পত্রকেই নিয়োগপত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটা মূলত নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর নিকট চাকরিতে যোগদানের প্রস্তাব বিশেষ।

অনেক সময় নিয়োগকর্তা আবেদনকারীর কোনরূপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে তাঁর পছন্দমতো প্রার্থীকে নিয়োগ দান করতে পারেন। বিশেষ করে আবেদনকারীর সংখ্যা কম থাকলে কিংবা প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন সুর্নির্দিষ্ট নিয়মকানুন না থাকলে সে ক্ষেত্রে কোন প্রার্থীর আবেদনপত্র বিচার-বিবেচনা করে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়।

নিয়োগপত্রে চাকরির যাবতীয় শর্তাবলি, যেমন-বেতন, ভাতা, চাকরিকাল, যোগদানের তারিখ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্তাদি উল্লেখ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থিত পদের জন্য জামানত চাওয়া হয় এবং প্রার্থীকে উপযুক্ত জামানত দিয়ে কাজে যোগদান করতে বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কী পরিমাণ বা কীরূপ জামানত দিতে হবে তাও নিয়োগপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

তাছাড়া চাকরিতে যোগদানের পর কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে কিনা বা শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকতে হবে কিনা তার উল্লেখসহ উক্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদ, শিক্ষানবিশকাল কতদিন হবে এবং সে সময়ে তাকে কীরূপ বেতনাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে সে সম্পর্কীয় বিশদ বিবরণ নিয়োগপত্রে উল্লেখ থাকে।

## ১২.৫.৫ নিয়োগপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Appointment Letter) ঃ

নিয়োগপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে ঃ

**১। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম (Name) ঃ** নিয়োগপত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা উল্লেখ করতে হয়।

**২। পদের নাম (Position) ঃ** নিয়োগকারী যে পদে আবেদনকারীকে নিয়োগ করবে তার নাম উল্লেখ করতে হবে।

**৩। আবেদন সূত্র (Source) ঃ** নিয়োগকারীকে আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত আবেদন পত্রের কথা উল্লেখ করে প্রার্থিত পদে তাকে নিয়োগ দানের প্রস্তাব করতে হয়।

**৪। বেতন স্কেল (Scale) ঃ** নিয়োগকর্তা তাঁর নিয়োগ পত্রে সংশ্লিষ্ট পদে বেতনের স্কেল, অর্থাৎ প্রারম্ভিক বেতন ও বার্ষিক বৃদ্ধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিবেন।

**৫। অন্যান্য ভাতা (Others) ঃ** নিয়োগ পত্রে বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি থাকলে তার উল্লেখ করতে হয়।

**৬। প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা (Payable benefits) ঃ** উল্লেখিত ভাতাদি ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কিছু থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে।

**৭। চাকরির শর্ত (Condition) ঃ** নিয়োগপত্রে চাকরির শর্তাদি উল্লেখ করতে হয়।

**৮। চাকরির প্রকৃতি (Nature) ঃ** চাকরিটি স্থায়ী না অস্থায়ী তা নিয়োগপত্রে পরিষ্কারভাবে লিখতে হয়।

**৯। চাকরির মেয়াদকাল (Stability) ঃ** চাকরিটি অস্থায়ী হলে তা কতদিনের জন্য এবং ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে কিনা এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে।

**১০। পদ বর্ণনা (Description) ঃ** কখনো কখনো যে পদে নিয়োগ করা হবে তার প্রকৃতি উল্লেখ করে পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়।

**১১। জামানত (Security) ঃ** অনেক সময় প্রার্থীকে জামানত দিয়ে কাজে যোগদানের কথা বলা হয়। জামানত দিতে হলে নিয়োগপত্রে তার প্রকৃতি ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

**১২। যোগদানের স্থান (Place) ঃ** কোন্ অফিসে বা কোন্ স্থানে চাকরিতে যোগদান করতে হবে নিয়োগপত্রে তার উল্লেখ থাকবে।

**১৩। যোগদানের তারিখ (Joining data) ঃ** নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগদানের তারিখ বা কতদিনের মধ্যে প্রার্থীকে কাজে যোগদান করতে হবে তা উল্লেখ করতে হয়।

**১৪। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (Training) ঃ** চাকরিতে যোগদানের পর কোন প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হবে কিনা তা নিয়োগপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

**১৫। যোগদানের অনুরোধ (Request of joining) ঃ** নিয়োগকারী আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অথবা সত্বর যোগদান করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র শেষ করবে।

## ১২.৫.৬ নিয়োগপত্রের বিবেচ্য বিষয় (Considerations of Appointment Letter) ঃ

নিয়োগপত্র রচনাকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় ঃ

**১। নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ (Follow particular structure) ঃ** নিয়োগপত্র রচনাকালে নিয়োগকর্তাকে পত্রের সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক বা বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো অনুসরণে রচিত হতে পারে।

**২। বিষয় বিন্যাস (Orderly information) ঃ** নিয়োগপত্রের বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা উচিত।

**৩। প্রাঞ্জল ভাষা (Intellectual language) ঃ** নিয়োগ পত্র সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা করতে হবে।

**৪। চাকরির শর্ত (Job condition) ঃ** নিয়োগপত্রে চাকরির শর্তাদি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হতে হবে। কোন শর্ত অস্পষ্ট থাকলে নিয়োগ প্রাপক ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

**৫। সংক্ষিপ্ততা (Short-cut) ঃ** নিয়োগপত্র সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে অবাস্তব কোন বক্তব্য স্থান পাবে না।

**৬। উপসংহার (Conclusion) ঃ** নিয়োগকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অথবা অবিলম্বে চাকরিতে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র শেষ করতে হবে।

## ১২.৫.৭ নিয়োগপত্রের কয়েকটি নমুনা (Sample of Appointment Letter) ঃ

**১। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ দান করে একজন আবেদনকারীর নিকট একখানা নিয়োগপত্র।**

প্রাইম পাবলিকেশন্স
(পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা)
৩৮, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

ফোন ঃ ৭১২২১৬৭
তারিখ ঃ ২৮ মার্চ ২০১৪

সূত্র ঃ নিয়োগ/০৩
জনাব লুৎফর রহমান
প্রযত্নে ঃ জনাব আহমদ হোসেন
১৭৫/৩, পশ্চিম কাফরুল,
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

**বিষয় ঃ ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ**

জনাব,

আপনার ১ মার্চ ২০১৪ তারিখের আবেদন এবং সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে আপনাকে অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য আমরা মনস্থ করেছি।

অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী আপনাকে ৬ মাস শিক্ষানবিশ থাকতে হবে এবং এ সময়ে আপনাকে সর্বসাকুল্যে ১০,৫০০.০০ টাকা বেতন প্রদান করা হবে। সাফল্যের সাথে শিক্ষানবিশকাল অতিক্রম করতে পারলে আপনাকে ২৮০০-৭৫০০-৫০০-১০,৫০০ টাকা বেতন স্কেলে স্থায়ীভাবে বহাল করা হবে এবং তখন থেকে আপনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী মূল বেতনের ৩০% বাড়ি ভাড়া, ১০% মহার্ঘ ভাতা ও ১০% চিকিৎসা ভাতা পাবেন।

উপরোক্ত শর্তে চাকরি করতে রাজি হলে আগামী ৭ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের মধ্যে আপনাকে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। অন্যথায় এ নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে। আশা করি, উক্ত তারিখের মধ্যে কাজে যোগদান করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
এম. এন. হক
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

**২। একটি ব্যাংকে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ দান করে একখানা নিয়োগ পত্র।**

প্রাইম ব্যাংক
৮৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

ঢাকা
২৫ মার্চ ২০১৪

সূত্র ঃ নিয়োগ/০৩-১০৭

প্রতি,
সুলতান মাহমুদ
পিতা ঃ ইসমাইল হোসেন
গ্রাম ঃ দুয়াইর
পো ঃ মানাইর হাট
ভাংগা, ফরিদপুর।

**বিষয় ঃ নিয়োগপত্র।**

জনাব,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার প্রেরিত ১ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে আপনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে আপনাকে অত্র ব্যাংকের নোয়াখালী শাখার হিসাবরক্ষক পদে ৭৮০০-৫৬০-৮৯০০ ইবি-৬৫০-১০,১০০ টাকা বেতনের স্কেলে নিয়োগ করা হল এতদ্ব্যতীত, আপনি ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আপনাকে ১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বা তৎপূর্বে উক্ত পদে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত সময়ের মধ্যে যোগদান না করলে এ নিয়োগ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর
(মেহেদী হাসান)
নির্বাহী পরিচালক

প্রতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রতিষ্ঠানিক পত্র

**৩। প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দেখিয়ে একখানি নিয়োগপত্র।**

গ্ল্যাক্সো ( বাংলাদেশ ) লিঃ
ফৌজদারহাট শিল্প এলাকা
চট্টগ্রাম।

তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সূত্র ঃ নি/বিপ্র/০২-১০৩

প্রতি,
মোঃ মোতাহার হোসেন
১০২, রানীর বাজার
কুমিল্লা -৩৫০০।

**বিষয় ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।**

জনাব,

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী আপনাকে অত্র প্রতিষ্ঠানের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে আগামী ৬ মাস আপনাকে শিক্ষানবিশ হিসেবে সর্বমোট ১০,০০০/- টাকা বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে। সাফল্যজনকভাবে উক্ত কাল সমাপ্ত করতে পারলে আপনাকে কোম্পানির বিধি মোতাবেক স্থায়ীভাবে বহাল করা হবে।

আমাদের শর্তানুসারে কাজ করতে রাজি হলে আপনাকে আগামী ১০ মার্চ ২০১৪ ইং তারিখের মধ্যে অত্র অফিসে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় এ নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
নাহিদা আক্তারী নিশু
উপ-মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
গ্ল্যাক্সো (বাংলাদেশ) লিঃ

**৪। একটি সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনার প্রভাষক পদে নিয়োগ দান করে একখানা সরকারি নিয়োগপত্র।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং ২০১/২ (নিয়োগ) তারিখ ঃ ৪ এপ্রিল, ২০১৪

**প্রজ্ঞাপন**

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের স্মারক নং ১১০০/এডু-০৩ তাং-২০/৩/১৪ এর বরাত অনুযায়ী জনাব আব্দুল সাত্তার ভূঁইয়া, পিতা জনাব আবদুল রহমানকে অস্থায়ী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট , গাজীপুর-এ ব্যবস্থাপনার প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ করা হল।

জনাব আব্দুল সাত্তার ভূঁইয়া উক্ত পদে যোগদানের সময় থেকে এ আদেশ কার্যকরী হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এ আদেশ সম্পূর্ণ জনস্বার্থে জারি করা হল।

স্বাক্ষর
(মোঃ নূরুল হক)
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

**অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ**

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অধ্যক্ষ, বি. আই. টি. আই. গাজীপুর।
৩। তত্ত্বাবধায়ক, বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা-গেজেটে নিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রকাশের নিমিত্ত।
৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (শিক্ষা), সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৫। জনাব আব্দুল সাত্তার ভূঁইয়া, গ্রাম ঃ দিঘীর পাড়, ডাকঘর ঃ কমলাঘাট, জেলা ঃ মুন্সীগঞ্জ।
৬। অফিস নথি।

স্বাক্ষর
(মফিদুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক
পক্ষে, মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বাংলাদেশ, ঢাকা।

**৫। একটি কোম্পানির বিক্রয় ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে জানিয়ে প্রার্থীকে লেখা একটি নিয়োগপত্র।**

নাজনীন ভেবারেজ কোম্পানি লিঃ
[মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের একটি প্রতিষ্ঠান)
৪৭৪, বক্স নগর, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬।

স্মারক সংখ্যা ৩১/০৩ (নিয়োগ) তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জনাব আবু সাঈদ মিয়া
২৭/এ, নারিন্দা রোড
ঢাকা-১১০০।

**বিষয় ঃ বিক্রয় ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ।**

প্রিয় জনাব,

আপনার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে অত্র কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী আপনাকে কোম্পানির উত্তরাঞ্চলের জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

১। আপনাকে এক বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হবে।
২। শিক্ষানবিশকাল সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণের পর চাকরিতে স্থায়ীভাবে বহাল করা হবে।
৩। শিক্ষানবিশকালীন সময়ে আপনাকে মাসিক নির্ধারিত ৮,০০০/- টাকা দেয়া হবে।
৪। চাকরি স্থায়ী হলে আপনাকে মাসিক ৫৮০০-৪২৫-৭৪২৫/- টাকা বেতনক্রমে বেতন দেয়া হবে।
৫। বেতন ছাড়াও আপনাকে মূল বেতনের ৪০% বাড়ি ভাড়া, ২০% যাতায়াত ভাড়া, ১০% চিকিৎসা ভাতা এবং ভবিষ্যত তহবিলের জন্য ১৫% চাঁদা প্রদান করা হবে।
৬। আপনাকে সরকারি ছুটি বাদে বছরে ১৫ দিন নৈমিত্তিক ছুটি এবং ২২দিন অর্জিত ছুটি প্রদান করা হবে।
৭। কাজে যোগদানের প্রাক্কালে আপনাকে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার ডাক্তারি সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।
৮। আপনাকে আগামী ১ মার্চ ২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে।
৯। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কাজে যোগদান না করলে আপনার নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনাকে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কাজে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত
এজাব উদ্দিন মিয়া
সেক্রেটারী
(পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশক্রমে)

প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

## ১২.৫.৮ চাকরিতে যোগদান পত্র বলতে কী বুঝায় (What is meant by Joining Letter) ঃ

কোন চাকরিতে যোগদানকালে নিয়োগকর্তা বরাবরে যোগদান সংক্রান্ত সংবাদ জানিয়ে যে পত্র লেখা হয়, তাকে চাকরিতে যোগদান পত্র বলা হয়। এটি মূলত চাকরিতে যোগদানকারী ব্যক্তির কর্মে যোগদানের একটি স্বীকৃতিপত্র। এতে নিয়োগপত্রের সূত্র নম্বর ও তারিখ, যে পদে যোগদান করছে তার নাম, যোগদানের তারিখ, সময় ও স্থান ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। এরূপ পত্র সংক্ষিপ্তাকারে এক বা দুই অনুচ্ছেদে লেখা হয়।

সাধারণত চাকরি প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগকর্তা কোন ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগপত্র পাবার পর এতে উল্লেখিত শর্তাবলি তার নিকট গ্রহণযোগ্য হলে নিয়োগের সকল শর্ত মেনে নিয়ে তাকে চাকরিতে যোগদান করতে হয় এবং চাকরিতে যোগদানের এ বিষয়টি লিখিতভাবে নিয়োগকর্তাকে জানাতে হয়। যে পত্রের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদান করে এবং উক্ত যোগদানের খবর নিয়োগকর্তাকে অবহিত করে তাকেই চাকরিতে যোগদান পত্র বলে।

চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কার্যে যোগদানের সময় যোগদান পত্র বা যোগদান রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। যোগদান পত্র দাখিলের পরপরই কর্মীর উপর চাকরির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বর্তায় এবং চাকরির শর্তাবলি প্রযোজ্য হয়। যে কোন চাকরিতে যোগদানের তারিখ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যোগদানের তারিখ থেকেই একজন কর্মীর বেতনের হিসাব, সাংবাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, চাকরির জ্যেষ্ঠতা বা বয়স হিসেব করা হয়। চাকরিতে যোগদান পত্রই এক্ষেত্রে যোগদানের তারিখের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়।

## ১২.৫.৯ চাকরিতে যোগদান পত্রের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Joining Letter) ঃ

চাকরিতে যোগদান পত্র নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাকরির শর্তাবলির স্বীকৃতিস্বরূপ। যে কোন চাকরিতেই যোগদান পত্র দাখিল করা আবশ্যক। চাকরির ক্ষেত্রে যোগদান পত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে চাকরিতে যোগদান পত্রের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল ঃ

১। চাকরিতে যোগদান পত্র চাকরিদাতা ও চাকরি গ্রহীতার মধ্যে চুক্তিস্বরূপ। চাকরিদাতা নিয়োগপত্রের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চাকরিতে যোগদানের যে প্রস্তাব দেয়, চাকরি প্রার্থী বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি যোগদান পত্রের মাধ্যমে সে প্রস্তাব গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করে।

২। যোগদান পত্রের মাধ্যমে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মে যোগদানের সংবাদ অবহিত হতে পারে।

৩। এটি চাকরির অন্যতম রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষিত হয়।

৪। যোগদান পত্র চাকরিতে যোগদানকারী কর্মীর বেতন হিসাবের জন্য প্রয়োজন হয়। কেননা, চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকেই কর্মীর বেতন প্রদান শুরু করা হয়।

৫। এটি চাকরিজীবির জ্যেষ্ঠতা বা সিনিয়রিটি নির্ধারণে সহায়তা করে।

৬। চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগদান পত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

৭। যোগদান পত্র কর্মীর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির হিসাব নির্ধারণে সাহায্য করে।

৮। কর্মচারীর অর্জিত ছুটি ও অন্যান্য ছুটিছাটা ভোগের ক্ষেত্রেও যোগদান পত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

## ১২.৫.১০ চাকরিতে যোগদান পত্রের কতিপয় নমুনা (Sample of Joining Letter) ঃ

**১। কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদে যোগদান করে একটি যোগদান পত্র।**

ঢাকা
৪ এপ্রিল ২০১০

বরাবর,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ঝিংগেফুল প্রকাশনি
৩৮, বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

**বিষয় ঃ কর্মে যোগদান।**

জনাব,

আপনার ২৮ মার্চ ২০১৪ তারিখের লিখিত পত্র নং নিয়োগ/-০৩(১)-এর প্রেক্ষিতে আমি অদ্য ৪ এপ্রিল ২০১৪ রোজ মঙ্গলবার বেলা ৯.৩০ মিনিটে আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক পদে যোগদান করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত,
অজিত কুমার
ব্যবস্থাপক,
ঝিগেফুল প্রকাশনি
৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।

**২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে যোগদান করা সংক্রান্ত একটি কাজে যোগদান পত্র।**

ঢাকা

১৫ জানুয়ারি, ২০১৪

বরাবর,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

লাবন্য এন্টাপ্রাইজ লিঃ

৮৭, মতিঝিল বা/এ,

ঢাকা।

**বিষয় ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে যোগদান**

মহোদয়,

আপনার প্রেরিত পত্র নম্বর নিয়োগ/০৩/১০৭, তাং ১-০১-১৪ইং মোতাবেক আমি অদ্য ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪ শনিবার বেলা ৯ ঘটিকায় উল্লেখিত পদে যোগদান করলাম।

আশা করি আমার যোগদান পত্রটি গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

মমিন উল্লাহ্

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

আশা এন্টারপ্রাইজ লিঃ

ঢাকা।

**৩। অফিস সহকারী পদে যোগদান করে একটি যোগদান পত্র।**

চট্টগ্রাম

১ মার্চ ২০১৪

জেনারেল ম্যানেজার

বাংলাদেশ এরোমা টি লিঃ

ফৌজদারহাট শিল্প এলাকা,

চট্টগ্রাম।

**বিষয় ঃ যোগদান পত্র।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের লিখিত পত্র নং বিএটিএল/নিয়োগ/০৩(৩) মোতাবেক আমি আজ বুধবার ১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে পূর্বাহ্নে অত্র প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী পদে যোগদান করলাম।

অতএব, মহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমার যোগদান পত্রটি গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত,

শামীমা নাসরিন

অফিস সহকারী

বাংলাদেশ এরোমা টি লিঃ

ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম।

প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

## ১২.৫.১১ চাকরির জন্য আবেদনপত্র (Application for Employment) ঃ

সহজ কথায়, চাকরি লাভের জন্য যে আবেদনপত্র বা দরখাস্ত লেখা হয়, তাকে চাকরির আবেদনপত্র বলে। চাকরি হচ্ছে মানুষের জীবিকার্জনের একটি পন্থা। জীবিকার সংস্থানের জন্য কোন ব্যক্তি তার সেবা বা শ্রম বিক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নিকট এরূপ পত্র লিখে থাকে। এতে চাকরি প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে নিয়োগকর্তার নিকট পেশ করা হয়।

**মিঃ এইচ. আর. স্টল** চাকরির আবেদনপত্রের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"নিয়োগকারী বা চাকরিদাতার নিকট নিজেকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে চাকরিপ্রার্থী যে পত্র লেখে তাকে চাকরির আবেদনপত্র বলা হয়।"

**ডঃ এম. এ. মান্নান** বলেন, "কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কোন পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাসীন কর্মকর্তার নিকট লিখিত প্রস্তাবনাকেই চাকরির আবেদনপত্র বলে।"

চাকরির আবেদনপত্র মূলত মূল্যের বিনিময়ে শ্রম বিক্রয়ের একটি প্রস্তাব বিশেষ। চাকরিপ্রার্থী সাধারণত সংবাদপত্রের কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি দেখে বা অন্য কোন সূত্র থেকে খবর পেয়ে চাকরি পাবার আশায় আবেদনপত্র লিখে থাকে। এরূপ পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারী যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে তার শ্রম নিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে নিয়োগকারীও যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ করে উন্নতমানের সেবা বা শ্রম পেতে চায়।

মোট কথা, নিয়োগকারীর বিজ্ঞপ্তি দেখে বা অন্য কোন সূত্র থেকে খবর পেয়ে চাকরি লাভের আশায় চাকরিপ্রার্থী তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে নিয়োগকারীর নিকট যে পত্র লিখে থাকে, তাকেই চাকরির আবেদনপত্র বলে।

## ১২.৫.১২ চাকরির আবেদনপত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Consideration for writing an Application) ঃ

চাকরির আবেদনপত্রের রচনাকৌশল ও কৃতিত্বের উপর আবেদনকারীর চাকরি নির্ভর করে। তাই আবেদনপত্র অত্যন্ত যত্নসহকারে সুন্দরভাবে তৈরি করতে হয়। একটি সুন্দর আবেদনপত্র রচনার জন্য আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত ঃ

১। **স্পষ্ট ধারণা (Clear concept)** ঃ আবেদনপত্র রচনার পূর্বে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট পদ ও নিয়োগকর্তার শর্তাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। **সঠিক কাঠামো (Appropriate structure)** ঃ আবেদনপত্র রচনাকালে এর নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।

৩। **কর্মখালির সংবাদ সূত্র (Source of vacancy)** ঃ আবেদনকারীকে আবেদনপত্রে কর্মখালির সংবাদের উৎস উল্লেখ করতে হবে। এ উৎস বিশেষ সূত্র বা সংবাদপত্র হতে পারে।

৪। **বিষয় বিন্যাস (Orderly information)** ঃ আবেদনপত্রের প্রতিটি বিষয়কে পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য মূল বক্তব্যকে প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে সুন্দর করে সাজাতে হবে।

৫। **পদের নাম (Name of the post)** ঃ যে পদের জন্য আবেদন করা হচ্ছে তার নাম আবেদনপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬। **যোগ্যতার উল্লেখ (Mention Qualification)** ঃ আবেদনপত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকলে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে।

৭। **ঠিকানা (Address)** ঃ আবেদনপত্রে চাকরিপ্রার্থীকে বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানার উল্লেখ করতে হবে।

৮। **জামানত (Security)** ঃ আবেদনপত্রের সাথে পে-অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি কোন জামানত দিতে হলে তার ক্রমিক নম্বর তারিখসহ আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

৯। **বেতন (Salary)** ঃ প্রার্থিত পদের জন্য আবেদক কী পরিমাণ বেতন ও ভাতা পেতে চায় তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

১০। **নির্ভুলতা (Accuracy)** ঃ আবেদনপত্র সব রকম ভুল-ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

১১। **ভাষা (Language)** ঃ আবেদনপত্রে মিশ্র ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না, এর ভাষা মার্জিত হতে হবে।

১২। **আয়তন (Area)** ঃ আবেদনপত্রের আয়তন ও আকার ছোট হওয়া উচিত।

১৩। **সংযুক্তি (Included)** ঃ আবেদনপত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ ও প্রশংসাপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। **নিশ্চয়তা প্রদান (Assurance)** ঃ উপসংহারে চাকরিতে নিয়োগ করা হলে বিশ্বস্ততার সাথে কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা প্রদানের কথা উল্লেখ করতে হবে।

১৫। **স্বাক্ষর প্রদান (Signature)** ঃ সবশেষে আবেদনপত্রের শেষাংশে আবেদনকারীকে নিজ হাতে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

## ১২.৫.১৩ চাকরির আবেদনপত্রের কতিপয় নমুনা (Specimen of Application for Job) ঃ

**১। সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য একটি আবেদনপত্র।**

'শ্বেতরাণী'
মাস্টারপাড়া, মাইজদী কোর্ট
নোয়াখালী
১৫ জুন, ২০১৪

বরাবর,
ব্যবস্থাপক পরিচালক
ন্যাশনাল টিউবস্ লি ঃ
টঙ্গী, গাজীপুর।

**বিষয় ঃ সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য আবেদন ।**

মহোদয়,

অদ্যকার 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রদত্ত আপনাদের বিজ্ঞপ্তি হতে জানতে পারলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে একজন লোক নিয়োগ করা হবে। উক্ত পদের একজন প্রার্থীরূপে নিম্নে আমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ আপনার সুবিবেচনার জন্য পেশ করা হল ঃ

১। নাম ঃ মাহমুদা ফাতেমা
২। পিতার নাম ঃ ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন পাটওয়ারী
৩। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ মাস্টারপাড়া, ডাকঘর ঃ মাইজদী, থানা ঃ সুধারাম, জেলা-নোয়াখালী।
৪। বর্তমান ঠিকানা ঃ 'শ্বেতরাণী" মাস্টারপাড়া, মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী।
৫। বয়স ঃ ২২ বৎসর ৪ মাস।
৬। জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী।
৭। ধর্ম ঃ ইসলাম।
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

| পরীক্ষার নাম | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় | পাসের সন | গ্রেড/শ্রেণি |
|---|---|---|---|
| এস. এস. সি (বিজ্ঞান) | কুমিল্লা বোর্ড | ২০০১ | এ + (৫.০০) |
| এইচ. এস. সি. (বিজ্ঞান) | কুমিল্লা বোর্ড | ২০০৩ | এ + (৫.০০) |
| ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার) | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ২০০৭ | এ + (৪.০০) |

৯। ভাষা জ্ঞান ঃ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে, লিখতে ও পড়তে পারি।
১০। অভিজ্ঞতা ঃ বাতাড়ি রবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার) হিসেবে ২০১০ সালের জুন মাস থেকে কর্মরত আছি।
১১। চাকরি ত্যাগের কারণ ঃ অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির আশায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

১২। অনুসন্ধান সূত্র : (ক) জনাব শামীম ইবনে আমিন
ম্যানেজার
বাতাড়ি রবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।
(খ) এম. এ. হক
অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
তেজগাঁও, ঢাকা।

অতএব, উপরোক্ত তথ্যাবলির আলোকে আমাকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ করলে আমি আমার কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা চালাব।

আপনার বিশ্বস্ত,
মাহমুদা ফাতেমা

**সংযুক্তি ঃ**

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি
২। বর্তমান কর্মস্থলের অনাপত্তির সনদ
৩। দুই কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি
৪। নাগরিকত্ব সনদ
৫। চারিত্রিক সনদ

**২। একটি বিখ্যাত কনস্ট্রাকশন ফার্মে সুপারভাইজার আবশ্যক। প্রার্থীকে কমপক্ষে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) হতে হবে। আবেদন করুন, বক্স ২৯৫, দৈনিক ইত্তেফাক মতিঝিল, ঢাকা।**

**পৃষ্ঠা নং-১**

**বিজ্ঞাপনদাতা**
বক্স নং-২৯৫
দৈনিক ইত্তেফাক
মতিঝিল, ঢাকা-১১০০।

১০,নয়াপল্টন, ঢাকা
৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

**বিষয় ঃ সুপারভাইজার পদের জন্য আবেদন।**

জনাব,

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং তারিখে "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকার বিজ্ঞাপন মারফত জানতে পারলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন সুপারভাইজার প্রয়োজন। উক্ত পদের আমি একজন প্রার্থী। আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্য আমি আমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবরণী (Bio-data) পাঠালাম।

**পৃষ্ঠা নং-২**

## জীবন বৃত্তান্ত

১। নাম : মোহাম্মদ ইয়াসীন।
২। পিতার নাম : মোহাম্মদ নূরুল হক।
৩। জন্ম তারিখ : ১৫ই মার্চ ১৯৮৩ ।
৪। ঠিকানা : (ক) বর্তমান ঃ ১০, নয়াপল্টন, ঢাকা।
(খ) স্থায়ী ঃ ১২/সি কলেজ রোড, ময়মনসিংহ।
৫। জাতীয়তা : জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।
৬। ধর্ম : ইসলাম।
৭। ভাষা জ্ঞান : বাংলা, ইংরেজি লিখতে ও পড়তে পারদর্শী।

৮। পরিচয় সূত্র ঃ (ক) জনাব ইকবাল হাসান
উৎপাদন ব্যবস্থাপক
রানা ট্রেডার্স
৩০, শান্তিনগর, ঢাকা।
(খ) জনাব আম্বিয়া বেগম
সহকারী অধ্যাপক
তেজগাঁও কমার্স কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা।

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

| পরীক্ষার নাম | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় | বিভাগ/ শ্রেণি | পাসের সন |
|---|---|---|---|
| এস. এস. সি (বিজ্ঞান) | ঢাকা বোর্ড | ১ম বিভাগ | ১৯৯৮ |
| ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল) | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ১ম বিভাগ | ২০০২ |

১০। অভিজ্ঞতা ঃ একটি বেসরকারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হিসেবে চার বৎসর যাবৎ কর্মরত আছি।

দস্তখত
মোহাম্মদ ইয়াসীন

**৩। ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (বিদ্যুৎ) পদে নিয়োগের আবেদন পত্র।**

পরিচালক প্রশাসন
ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।

তারিখ ঃ ২১ মার্চ ২০১৪

**বিষয় ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) পদের জন্য আবেদন।**

জনাব,

২০ মার্চ ২০১৪ তারিখে "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় দেখতে পেলাম আপনার প্রতিষ্ঠানে ক'জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) (বিদ্যুৎ) প্রয়োজন। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী। আপনার সহৃদয় বিবেচনার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ অন্যান্য তথ্যাদি উপস্থাপিত করলাম।

১। নাম ঃ মোঃ হামিদুল হক।
২। পিতার নাম ঃ মোঃ নূরুল হক।
৩। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ নলুয়া, ডাকঘর ঃ আবদুল্লাহ মিয়ারহাট, সদর, নোয়াখালী।
৪। বর্তমান ঠিকানা ঃ ৪/বি, সিনিয়র স্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৫। জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী।
৬। ধর্ম ঃ ইসলাম।
৭। জন্ম তারিখ ঃ ২৫-২-৮৮।
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

| পরীক্ষার নাম | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় | শ্রেণী/গ্রেড | পাসের সন |
|---|---|---|---|
| এস.এস.সি (বিজ্ঞান) | ঢাকা বোর্ড | এ + | ২০০৩ |
| ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ) | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | এ + | ২০০৭ |

উপরোক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে আপনার প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) হিসেবে নিয়োগ করে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সাহায্য করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
মোঃ হামিদুল হক

## ১২.৫.১৩ অভিযোগ পত্রের কতিপয় নমুনা (Some models of Letter of Complaints) ঃ

**১। ত্রুটিপূর্ণ মাল প্রেরণের অভিযোগ জানিয়ে সরবরাহকারীর নিকট একখানা অভিযোগ পত্র।**

মেসার্স ফাতেমা ট্রেডিং
(বৃহত্তম সিমেন্ট ব্যবসায়ী)

সূত্র ঃ.....
প্রতি ঃ
বিক্রয় ব্যবস্থাপক,
ক্রাউন সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিঃ
১০২ ইমামগঞ্জ, ঢাকা।

১৪, পলিটেকনিক রোড
পটুয়াখালী
২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

**বিষয় ঃ ত্রুটিপূর্ণ মাল প্রেরণের অভিযোগ।**

প্রিয় মহোদয়,

আমাদের ১২/০২/১৪ তারিখের অর্ডার মোতাবেক আপনারা যে ৪০০ ব্যাগ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (হোয়াইট) প্রেরণ করেছেন তা গতকাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। আপনাদের ত্বরিত সরবরাহের জন্য ধন্যবাদ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মালগুলো খুলে দেখা গেল ৪০০টি ব্যাগের মধ্যে ১০০টি ব্যাগের সিমেন্ট ত্রুটি রয়েছে। উক্ত ১০০টি ব্যাগের গায়ে লেখা আছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (ব্ল্যাক)। এর দামও হোয়াইট সিমেন্টের চেয়ে প্রতি ব্যাগ ৩০.০০ টাকা করে কম। হয়তো ভুলক্রমে এরূপ হয়েছে। ইতোপূর্বে এরূপ ত্রুটি আপনাদের হয়নি।

আপনাদের অনুমতি পেলে সিমেন্টের ব্যাগগুলো সত্বর আপনাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেব। অনুগ্রহ করে উক্ত ১০০ ব্যাগ ত্রুটিপূর্ণ সিমেন্টের পরিবর্তে আমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (হোয়াইট) পুনরায় সরবরাহ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে–
আপনাদের বিশস্ত,
মনিকা দেবনাথ
ব্যবস্থাপক

**২। নিম্নমানের মাল প্রেরণের জন্য প্রতিবাদ জানিয়ে পরিবেশকের নিকট একটি পত্র।**

**ভাই-বোন ভ্যারাইটি স্টোর**
২ এইচ, ৯/৩৯ মিরপুর
ঢাকা-১২১৬।

তারিখ ঃ ১৭ মার্চ ২০১৪

ব্যবস্থাপক,
মেসার্স মমতাজ এন্টারপ্রাইজ
বুড়ির হাট, শরীয়তপুর।

**বিষয় ঃ নিম্নমানের মাল প্রেরণের অভিযোগ।**

প্রিয় মহোদয়,

আমাদের ২৩/২/১৪ তারিখের ফরমায়েশ অনুযায়ী আপনারা যে ৫০ পেটি চা প্রেরণ করেছেন তা গতকাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। আপনাদের ত্বরিত সরবরাহের জন্য ধন্যবাদ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালের প্যাকিং খুলে দেখা গেল যে, ৫০ পেটি চায়ের মধ্যে ৩০ পেটি চা-ই নিম্নমানের এবং সস্তা দামের। সম্ভবত অসাবধানতাবশত এরূপ হয়েছে, যা ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি।

আপনাদের অনুমতি পেলে চায়ের পেটিগুলো শীঘ্রই আপনাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিব। অনুগ্রহপূর্বক উক্ত ৩০ পেটি নিম্নমানের চা-এর পরিবর্তে অর্ডার মোতাবেক 'রাজঘাট আর ডি' চা সরবরাহ করবেন।

ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে আমরা আশাবাদী।

ধন্যবাদান্তে–
আপনাদের বিশ্বস্ত
রাজন কুমার
স্বত্বাধিকারী।

**৩। সময়মত পণ্য প্রেরণ না করার জন্য একটি অভিযোগ পত্র রচনা কর।**

**শামীমা অ্যান্ড ব্রাদার্স**
[পাইকারী ও খুচরা রড ও সিমেন্ট বিক্রেতা]
২৫, কোর্ট রোড
ফেনী

সূত্র .....
ব্যবস্থাপক,
মেসার্স খান ট্রেডিং
১৫, স্টেশন রোড,
চট্টগ্রাম-৪০০০

**বিষয় ঃ মাল প্রেরণে বিলম্ব করার অভিযোগ**

জনাব,

আপনারা আমাদের অর্ডার নং ৫২৩/০৩ (২) অনুযায়ী আমাদেরকে ১০ মার্চের মধ্যে ৫০ টন ঈগল ব্যান্ড সিমেন্ট সরবরাহের কথা দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন খুচরা কারবারিদের কাছ থেকে অর্ডারও সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অদ্যাবধি আমাদের নিকট উক্ত সিমেন্ট এসে পৌছেনি বা কোন পত্রও আমরা পাইনি। ফলে ক্রেতাদের কাছে আমাদের নাজেহাল হতে হয়েছে। এতে বাজারে আপনাদের ও আমাদের উভয়েরই সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং আমরা বাজার হারাতে বসেছি।

তাই আশাকরি আগামী ২৭ মার্চের মধ্যে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে ৫০ টন ঈগল ব্যান্ড সিমেন্ট সরবরাহ করে বাধিত করবেন।

শুভেচ্ছান্তে-
আপনাদের বিশ্বস্ত,
সামশন নাহার
স্বত্বাধিকারী

**৪। প্রেরিত মালের ওজন কম হয়েছে জানিয়ে সরবরাহকারীর নিকট একটি অভিযোগ পত্র।**

**মেসার্স শাহীন অ্যান্ড ব্রাদার্স**
১৭, দড়টানা রোড
খুলনা-৭৪০০

২৭ এপ্রিল ২০১৪

সূত্র ঃ .....
বরাবর,
ব্যবস্থাপক,
রহিম স্টীল মিলস লিঃ
ডেমরা, ঢাকা।

**বিষয় ঃ প্রেরিত মালের ওজন কম হওয়া প্রসঙ্গে।**

জনাব,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। গত ২৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে আপনাদের প্রেরিত ৫০ টন এম. এস. রড গতকাল আমাদের এখানে এসে পৌছেছে। ত্বরিত মাল সরবরাহের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনাদের প্রেরিত মাল ওজনে কম হয়েছে। মাল পৌছার সাথে সাথেই আমরা রডের বান্ডেলগুলো ওজন করে দেখতে পাই যে, প্রতি বান্ডেলে ৯৫ কেজি করে আছে। কিন্তু আপনাদের চালান অনুযায়ী প্রতি বান্ডেলে ১০০ কেজি থাকার কথা। তাই বিষয়টি জরুরিভিত্তিতে আপনাদের গোচরীভূত করলাম।

আপনাদের প্রেরিত ৫০ টন রডের মধ্যে মোট ২৫০ কেজি কম হয়েছে, যার মূল্য দাঁড়ায় ৫৫০০.০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশ') টাকা। অনুগ্রহপূর্বক চালানের মোট মূল্য হতে ৫,৫০০.০০ টাকা বাদ দিয়ে সংশোধিত চালান আমাদের কাছে পাঠাবেন।

আপনাদের নিকট থেকে সংশোধিত বিল পাওয়ার পর সমুদয় টাকা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব।

ধন্যবাদান্তে-
আপনাদের বিশ্বস্ত,
শফিউল আলম সেতু
ব্যবস্থাপক

প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

## ১২.৫.১৪ টেন্ডার বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির নমুনা (Specimen of Tender Notice) ঃ

**বিজ্ঞপ্তি ।। ১ ।।**

**কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট**
কুমিল্লা
**"দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"**

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণের জন্য ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি মালামাল সরবরাহের জন্য প্রকৃত ঠিকাদার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

**শর্তাবলি ঃ**

১। দরপত্রের সিডিউল অধ্যক্ষের দপ্তর থেকে ৫০০/ (পাঁচশত) টাকার (অফেরতযোগ্য) বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হবে।
২। আগামী ০৪-০৪-১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে সনদ মূল্যে তা ক্রয় করা যাবে।
৩। দরপত্র আগামী ০৫-০৪-১৪ ইং তারিখ বেলা ১২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত অত্র দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে গ্রহণ করা হবে এবং ঐদিন বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।
৪। দরপত্রের সাথে উদ্ধৃত দরের ৫% হারে আর্নেস্টমানি হিসেবে যে কোন সরকারি/সিডিউল ব্যাংক থেকে ডিডি/ পে-অর্ডার নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করতে হবে।
৫। দরপত্রের অন্য শর্তাবলি সিডিউলের সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।
৬। কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

আশরাফুল হক আলো
অধ্যক্ষ
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

**বিজ্ঞপ্তি ।। ২ ।।**

**টেন্ডার নোটিশ/দরপত্র বিজ্ঞপ্তি**
**বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড**
গুলশান টেলিফোন একচেঞ্জ ভবন, ঢাকা

নং-ডিবিসি নির্মাণ ঃ ১৮/০২ তারিখ, ঢাকা ১০-১০-১৪ / ৫-৬-১৪২০

এতদ্বারা বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের 'ক' শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত ২ (দুটি) কাজের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।

দরপত্র সিডিউল অত্র অফিসের বিভাগীয় প্রকৌশলীর কাছ থেকে অফিস চলাকালীন সময়ে ১৫-১১-১৪ থেকে ২৫-১১-১৪ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। দরপত্র সিডিউল নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আগামী ২৬-১১-০৭ তারিখ বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত নিজ অফিস কক্ষে গ্রহণ করা হবে। ঐ দিনই ১.৩০ মিনিটে উপস্থিত দরপত্র দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হবে। খামের উপরে কাজের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং দরপত্রের শর্তাবলি অনুযায়ী কাগজপত্র, নির্ধারিত আর্নেস্টমানি, ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | দরপত্র মূল্য টাকা (অফেরতযোগ্য) | কাজ সমাপ্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | গুলিস্তান একচেঞ্জ ভবনের (উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ) নির্মাণ কাজ, ঢাকা | ১৬০ লক্ষ (প্রায়) | ৪,০০০/- | ১৬০ দিন |
| ২। | মগবাজার একচেঞ্জ ভবনের (উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ) নির্মাণ কাজ, ঢাকা। | ১১৫ লক্ষ (প্রায়) | ২,০০০/= | ৪০ দিন |

নিয়াজ আদনান
প্রকল্প পরিচালক

## অনুশীলনী-১২

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। বাণিজ্যিক পত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭, পরি-১০]

**উত্তর** ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত পত্রকে বাণিজ্যিক পত্র বলে।

**২। বাণিজ্যিক পত্র কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়?**

**উত্তর** ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তথ্যাদির বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মূলত বাণিজ্যিক পত্র রচিত হয়।

**৩। ব্যক্তিগত পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** পারিবারিক বা ব্যক্তিগত খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য যে পত্র লেখা হয়, তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে।

**৪। কী উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত পত্র রচিত হয়?**

**উত্তর** ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবরাখবর ও সংবাদাদির আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত পত্র রচিত হয়।

**৫। সামাজিক পত্র কাদের উদ্দেশ্যে কেন রচিত হয়?**

**উত্তর** সামাজিক পত্র সমাজের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে সামাজিক কোন অনুষ্ঠান বা সমষ্টিগত কাজের জন্য রচিত হয়।

**৬। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোর কোন্ অংশকে পত্রের প্রাণস্বরূপ মনে করা হয়?**

**উত্তর** বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোর মূল বক্তব্য বা গর্ভাংশকে পত্রের প্রাণস্বরূপ মনে করা হয়। এ অংশে পত্রলেখক বক্তব্য বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরে।

**৭। বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন অংশের গুরুত্ব বেশি?**

**উত্তর** বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বাক্ষর বা দস্তখত অংশের গুরুত্ব অন্যান্য অংশ থেকে অনেকাংশে বেশি। কেননা স্বাক্ষরবিহীন পত্রের কোন মূল্য থাকে না।

**৮। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি কী?**

**উত্তর** এটি বাণিজ্যিক পত্রের একটি অতিরিক্ত অংশ। অনেক সময় পত্রের সাথে প্রামাণ্য দলিলাদি ও কাগজপত্র সংযোজিত করতে হয়। পত্রের নিচে এসব কাগজপত্রের নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করতে হয়। একেই ক্রোড়পত্র বলে।

**৯। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কী?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর** প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি নিয়ে দুটি অফিস বা দু'জন অফিস কর্মচারী অথবা দুটি বিভাগের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক আদব-কায়দা ও নিয়মনীতি অনুযায়ী যে পত্র লেখা হয় তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বলে।

**১০। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর** প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণে যে পত্র রচনা করা হয়, তাকে বলা হয় আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা ডেমি-অফিসিয়াল পত্র।

**১১। সাক্ষাৎকার পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** যে পত্রের মাধ্যমে চাকরিদাতা বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান চাকরি প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকেন বা আহ্বান জানান তাকে সাক্ষাৎকার পত্র বলে।

**১২। নিয়োগ পত্র কী?** [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর** নিয়োগকর্তা চাকরিপ্রার্থীকে তার প্রার্থিত পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে যে পত্র লেখেন তাকে নিয়োগ পত্র বলে।

**১৩। চাকরিতে যোগদান পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** যে পত্রের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদান করে এবং উক্ত যোগদানের খবর নিয়োগকর্তাকে অবহিত করে তাকে চাকরিতে যোগদান পত্র বলে।

**১৪। চাকরির আবেদনপত্র কী?**

**উত্তর** চাকরি লাভের আশায় চাকরি প্রার্থী তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে চাকরিদাতা বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে চাকরির আবেদনপত্র বলে।

**১৫। টেন্ডার নোটিশ কী?** [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১৩ পরি-১০]

**অথবা, টেন্ডার নোটিশ বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কাকে বলে?**

**উত্তর** কোন প্রতিষ্ঠান পণ্য দ্রব্য সরবরাহ বা বিশেষ কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন জারি করে তাকে টেন্ডার বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বলে।

**১৬। অভিযোগ বাক্স কী?** [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১০(R), ১২]

**উত্তর** ভুল-ত্রুটি জন্য অভিযোগ করে ক্রেতা, পণ্য সরবরাহকারী বা পরিবহন কর্তৃপক্ষের বরাবর পত্র লিখে যে বাক্সে জমা দেয় তাকে অভিযোগ বাক্স বলে।

**১৭। ফরমায়েশ পত্র কী?** [বাকাশিবো-২০১০ (R), ১১, ১৩]

**উত্তর** ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে চুক্তি হয় তাকে ফরমায়েশ পত্র বলে।

**১৮। ডেমি/সেমি অফিসিয়াল পত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর** অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণে যে অফিসিয়াল পত্র রচনা করা হয় তাকে ডেমি অফিসিয়াল বা আধা-প্রতিষ্ঠানিক পত্র বা আধা-সরকারি পত্র বলে।

**১৯। বাণিজ্যিক পত্র কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়?**

**উত্তর** ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তথ্যাদির বিনিময়ে বা যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পত্র সম্পর্কে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মূলত বাণিজ্যিক পত্র রচিত হয়।

**২০। পত্র যোগাযোগ কাকে বলে?**

**উত্তর** মানুষ একে অপরের সাথে লিখিতভাবে যে তথ্যের আদান-প্রদান করে তাকে পত্র যোগাযোগ বলে।

**২১। সামাজিক পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** সামাজিক কোন অনুষ্ঠান বা সমষ্টিগত কোন বিষয়ে যে সব পত্র লেখা হয় তাকে সামাজিক পত্র বলে।

**২২। একটি টেন্ডার নোটিশে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয়?** [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর** কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বা বিশেষ কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব আহবান করে সংবাদপত্র বা খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন জারি করে তাকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা টেন্ডার বলা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানতসহ সীলমোহরকৃত খামে প্রকৃত ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারীদের নিকট হতে এ টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। উক্ত সময়সীমার পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে টেন্ডার খোলা হয় এবং নিম্নতম দরপত্রটি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দরপত্র বা টেন্ডারদাতাকে কার্য সম্পাদনের বা পণ্য সরবরাহের জন্য বলা হয়।

**২৩। অভিযোগ পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করে ক্রেতা, পণ্য সরবরাহকারী বা পরিবহন কর্তৃপক্ষ বরাবর যে পত্র লিখে থাকে তাকে অভিযোগ পত্র বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

**১। বাণিজ্যিক পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** ব্যবসায় বা বাণিজ্যিক কার্যকলাপে লিপ্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুষ্ঠিত পত্রের আদান-প্রদানকে বাণিজ্যিক পত্র বলা হয়। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক তথ্যাদির আদান-প্রদান, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন, পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত নির্ধারণ, দেনা পাওনা নিষ্পত্তি, দাবি ও অভিযোগ পেশ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়।

**২। ব্যক্তিগত পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর ঃ** পারিবারিক বা ব্যক্তিগত খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য যে পত্র লেখা হয়, তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে। এ পত্রে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, আবেগ-উচ্ছ্বাস, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব,ছাত্র-শিক্ষক, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য বা ভাবের বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এ পত্র রচিত হয়।

**৩। সামাজিক পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** সামাজিক কোন অনুষ্ঠান বা সমষ্টিগত কাজে যেসব পত্র লেখা হয় সেগুলোকে সামাজিক পত্র বলে। সমাজের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে এ পত্র রচিত হয়ে থাকে। সামাজিক পত্র অনেকটা ব্যক্তিগত ধাঁচের। তবে এর লিখন পদ্ধতি সাধারণ পত্রের মত নয়। একটি বিশেষ পদ্ধতি বা কায়দায় এরূপ পত্র লিখতে হয়। নিমন্ত্রণ পত্র, অভিনন্দন পত্র, ধন্যবাদ জ্ঞাপন পত্র, শোক জ্ঞাপন পত্র, প্রতিবেদন প্রভৃতি সামাজিক পত্রের উদাহরণ।

**৪। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের বিষয়বস্তুকে একটি বিশেষ নিয়মে ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। যে বিশেষ নিয়মে ও পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক পত্রের বিষয়বস্তুকে সাজানো হয় তাকেই বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বলে। বাণিজ্যিক পত্রকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য এর বিষয়বস্তুকে কতকগুলো অংশে বিভক্ত করে, সেগুলোকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সাজানো হয়ে থাকে। এ সাজানোর প্রক্রিয়া বা কৌশলই হচ্ছে বাণিজ্যিক পত্রের গঠন কাঠামো।

**৫। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলো কী?** [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, পরি-১০, ১৩, ১৪]

**উত্তর ঃ** একটি বাণিজ্যিক পত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত অংশগুলো থাকে ঃ

১। শিরোনামা
২। সূত্র নম্বর
৩। তারিখ
৪। অভ্যন্তরীণ ঠিকানা
৫। সম্বোধন
৬। বিষয় শিরোনাম
৭। মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু
৮। বিদায় সম্ভাষণ
৯। স্বাক্ষর
১০। অনুলিপি
১১। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি।

**৬। বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনাম কাকে বলে?** [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের শীর্ষে বা উপরিভাগের যে অংশে পত্র প্রেরক প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায়ের স্বরূপ, টেলিফোন নম্বর, টেলিগ্রাফিক ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, সূত্র, পত্র নম্বর, তারিখ ইত্যাদি লেখা থাকে তাকে বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনামা বলে। সাধারণত পত্রের এ অংশটি পূর্ব থেকে মুদ্রিত থাকে এবং এটি পত্রলেখকের পরিচয় বহন করে।

**৭। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বিন্যাসের পদ্ধতিগুলো কী?**

**উত্তর ঃ** বাণিজ্যিক পত্রের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন রীতি বা পদ্ধতিতে সাজিয়ে উপস্থাপন করা যায়। এ পত্রের কাঠামো বিন্যাসের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসৃত হতে দেখা যায়।

১। খাঁজকাটা ব সিঁড়ি পদ্ধতি
২। পার্শ্বসমান বা ব্লক পদ্ধতি
৩। আধা-পার্শ্বসমান বা সেমি ব্লক পদ্ধতি
৪। পরিমার্জিত পার্শ্বসমান পদ্ধতি
৫। ঝুলন্ত পদ্ধতি।

**৮। খাঁজকাটা বা সিঁড়ি পদ্ধতি কী?**

**উত্তর** এ পদ্ধতিতে পত্রের বিভিন্ন অংশকে কতকগুলো লাইন বা প্যারা করে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয় এবং বিষয়বস্তুর প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দটি বাম দিকের মার্জিনের সামান্য ডান দিকে সরিয়ে লেখা হয়। এ রীতিতে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম লাইন একটু ডান দিকে সরে যাওয়ায় বাম দিকে সিঁড়ির মত কতকগুলো ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয়। তাই এ পদ্ধতিকে সিঁড়ি বা খাঁজকাটা পদ্ধতি বলে।

**৯। পার্শ্ব সমান বা ব্লক পদ্ধতি কাকে বলে?**

**উত্তর** যে পদ্ধতিতে পত্রের বিভিন্ন অংশগুলোকে বাম পার্শ্ব বরাবর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমান্তরালভাবে সন্নিবেশিত করা হয়, পত্রের মধ্যভাগে বা ডান পার্শ্বে কোন অংশ আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয় না, তাকে পার্শ্বসমান বা ব্লক পদ্ধতি বলে।

**১০। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** অফিসিয়াল বিষয়াদি নিয়ে লিখিত পত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বা Official letter বলে। সাধারণত দুটি অফিস বা দু'জন অফিস কর্মচারী অথবা দুটি বিভাগের মধ্যে এ পত্রের বিনিময় হয়। অফিস সংক্রান্ত খবরাখবর আদান-প্রদানই প্রাতিষ্ঠানিক পত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাতিষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল আদবকায়দা, রীতিনীতি ও আইনকানুন যথাযথভাবে মেনে এরূপ পত্র রচনা করতে হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বলতে শুধু সরকারি অফিসের পত্রকেই বুঝায় না; সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি ইত্যাদি যে কোন অফিসের পত্রকেই বুঝিয়ে থাকে।

**১১। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত পত্রের সংমিশ্রণে যে অফিসিয়াল পত্র রচনা করা হয় তাকে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা ডেমি-অফিসিয়াল পত্র বলে। এ পত্র কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক ও কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নিয়ে রচিত হয়। তবে ব্যক্তিগত বিষয় এতে স্থান পেলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অফিস সংক্রান্তই হয়ে থাকে। সাধারণত সমপর্যায়ের কর্মচারী বা যে সকল কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও জানাশোনা আছে তাদের মধ্যে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

**১২। সাক্ষাৎকার পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** চাকরির আবেদনপত্র পাওয়ার পর নিয়োগকর্তা চাকরি প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদে মনোনয়ন দানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য হাজির হওয়ার নিমিত্তে যে পত্র লেখেন তাকে সাক্ষাৎকার পত্র বলে। সাক্ষাৎকার পত্রের মাধ্যমে চাকরি প্রার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট দিনে, নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জ্ঞাপন করা হয়। এতে চাকরি প্রার্থীর আবেদনপত্রের সূত্র, পদের নাম, সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় ও স্থান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

**১৩। সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্যগুলো কী?**

**উত্তর** সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। চাকরি প্রার্থী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ।
২। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই।
৩। ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ।
৪। বিশেষ জ্ঞান ও আগ্রহ পরীক্ষা।
৫। এমন কিছু বিষয় অবগত হওয়া যা অন্য কোন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

**১৪। নিয়োগপত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর** নিয়োগকর্তা চাকরি প্রার্থীকে তার প্রার্থিত পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে যে পত্র লেখেন তাকে নিয়োগপত্র বলে। এটা মূলত নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর নিকট চাকরিতে যোগদানের প্রস্তাববিশেষ। এতে চাকরির যাবতীয় শর্তাবলি। যেমন– বেতন, ভাতা, চাকরিকাল, যোগদানের তারিখ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্তাদি উল্লেখ করা হয়।

**১৫। একটি নিয়োগপত্রে সাধারণত কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে?** [বাকাশিবো-২০১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর** একটি নিয়োগপত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ থাকে ঃ

১। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম
২। পদের নাম
৩। আবেদন সূত্র
৪। বেতন স্কেল
৫। বিভিন্ন ভাতা ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা
৬। চাকরির প্রকৃতি ও শর্তাবলি
৭। চাকরির মেয়াদকাল
৮। যোগদানের তারিখ ও স্থান
৯। যোগদানের অনুরোধ

**১৬। চাকরিতে যোগদান পত্র বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর** কোন চাকরিতে যোগদানকালে নিয়োগকর্তা বরাবরে যোগদান সংক্রান্ত সংবাদ জানিয়ে যে পত্র লেখা হয়, তাকে চাকরিতে যোগদান পত্র বলা হয়। এটি মূলত চাকরিতে যোগদানকারী ব্যক্তির কার্য যোগদানের একটি স্বীকৃতিপত্র। এতে নিয়োগপত্রের সূত্র নম্বর ও তারিখ যে পদে যোগদান করছে তার নাম, যোগদানের তারিখ, সময় ও স্থান ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে।

**১৭। চাকরির আবেদনপত্র কাকে বলে?**

**উত্তর** চাকরি লাভের আশায় চাকরিপ্রার্থী তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে চাকরিদাতা বা নিয়োগকারীর নিকট যে পত্র লেখে তাকে চাকরির আবেদনপত্র বলে। এটি মূলত মূল্যের বিনিময়ে নিয়োগকারীর নিকট শ্রম বিক্রয়ের একটি প্রস্তাব বিশেষ। চাকরি প্রার্থী সাধারণত সংবাদপত্রে কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি দেখে বা অন্য কোন সূত্র থেকে খবর পেয়ে চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে এ পত্র রচনা করে থাকে।

**১৮। অভিযোগ পত্র কী?**

**উত্তর** পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার ত্রুটি বা পরিবহণজনিত কোন ত্রুটি কিংবা অন্য কোন কারণে অভিযোগ উত্থাপন করে ক্রেতা-বিক্রেতা বা পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে অভিযোগ পত্র বলে। এরূপ পত্রের মাধ্যমে ক্রেতা সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে বিক্রেতা বা সরবরাহকারী বা পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে। সাধারণত প্রেরিত পণ্য নিকৃষ্ট মানের হলে বা অর্ডার অনুসারে না হলে বা পরিবহণকালে সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হলে তা উল্লেখ করে সরবরাহকারী বা বিক্রেতা বা পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ পত্র পেশ করা হয়।

**১৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা টেন্ডার বলতে কী বুঝায়?** [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর** কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বা বিশেষ কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে সংবাদপত্র বা খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন জারি করে, তাকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা টেন্ডার বলা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানতসহ সীলমোহরকৃত খামে প্রকৃত ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারীদের নিকট হতে এই টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। উক্ত সময়সীমার পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে টেন্ডার খোলা হয় এবং নিম্নতম দরপত্রটি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দরপত্র বা টেন্ডারদাতাকে কার্য সম্পাদনের বা পণ্য সরবরাহের জন্য বলা হয়।

**২০। আনুষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর** পত্র লেখার যাবতীয় নিয়মকানুন বা আনুষ্ঠানিকতা পালন করে যে পত্র লেখা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক পত্র বলে। এ ধরনের পত্র লেখার জন্য লেখককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক পত্র রচনার ক্ষেত্রে এরূপ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা আবশ্যক।

**২১। ব্যক্তিগত পত্র এবং বাণিজ্যিক পত্রের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য উল্লেখ কর।** [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর** ব্যক্তিগত পত্র ও বাণিজ্যিক পত্র উভয়ই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যাদির আদান-প্রদান করলেও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবর ও সংবাদ আদান-প্রদান ব্যক্তিগত পত্রের উদ্দেশ্য। আর বাণিজ্যিক পত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করা।

**২২। পত্র যোগাযোগকে সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলা হয় কেন?**

**উত্তর ঃ** আধুনিক জগতে যোগাযোগের সহজল মাধ্যমে হিসাবে পত্রের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পত্রের মাধ্যমে অতি সহজে দূর-দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। বার্তা প্রেরক ও বার্তা গ্রাহক উভয়ের জন্যই এ পদ্ধতিতে যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত সহজ ও সুবিধাজনক। তাছাড়া পত্রে যাবতীয় তথ্যের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। তাই পত্র যোগাযোগকে সবচেয়ে সহজ, নির্ভরযোগ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়।

**২৩। বাণিজ্যিক পত্রের সামরিক পদ্ধতি কী?**

**উত্তর ঃ** এ পদ্ধতি সহজ, বিজ্ঞানসম্মত ও উত্তম বলে সর্বত্রই জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে মাসের নাম, তারিখের সাথে উল্লেখ করতে হয়। ফলে সব বাংলা না ইংরেজি হবে তা সহজেই বুঝা যায়। ফলে শেষে বাংলা না ইংরেজি সাল লেখা হয়েছে তার উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। এ পদ্ধতিতে নিম্নোক্তভাবে লেখা হয় ঃ (i) ৬ জুলাই, ২০১৩; (ii) ৮ আগস্ট, ২০১৪।

**২৪। বাণিজ্যিক পত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ সারি কী?**

**উত্তর ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বা এর প্রধান নির্বাহীকে উদ্দেশ্য করে কোন ব্যবসায় পত্র লেখা হলেও অনেক সময় পত্র সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি, বিভাগ ও উপ-বিভাগের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রেরিত পত্রটি যাতে দ্রুত উক্ত ব্যক্তি, বিভাগ ও উপ-বিভাগে পৌঁছাতে পারে সেজন্য অভ্যন্তরীণ ঠিকানার নিচে উক্ত ব্যক্তি বা বিভাগের নাম উল্লেখ করতে হয়। এরূপ আকর্ষণের সারিকে দৃষ্টি আকর্ষণের সারি বলা হয়।

**২৫। একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী?** [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর ঃ** একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি নিম্নরূপ ঃ

(i) এতে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকতে হবে।
(ii) পত্র রচনার সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।
(iii) পত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় বা সূত্র উল্লেখ করতে হবে।
(iv) সঠিক সম্ভাষণ ব্যবহার করতে হবে।
(v) পত্র সংক্ষিপ্ত হতে হবে ও সহজ ভাষায় রচিত হতে হবে।

## ▶▶ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

১। বিভিন্ন ধরনের পত্র যোগাযোগ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। সাক্ষাৎকার পত্র কী? সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৫.১ ও ১২.৫.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে মনোনয়নের জন্য কোন একজন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারে মিলিত হবার জন্য ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পক্ষ হতে একখানি সাক্ষাৎকার পত্র রচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৫.৪ ও ১২.৫.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। নিয়োগ পত্র কাকে বলে? নিয়োগ পত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৫.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে জানিয়ে আবেদনকারীর নিকট একটি নিয়োগ পত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** ১২.৫.৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফেনী জনাব ফজলুল হককে একজন সহকারী হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ করেছে জানিয়ে কাল্পনিক তথ্যের সাহায্যে একখানি নিয়োগ পত্র রচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। চাকরিতে যোগদান পত্র বলতে কী বুঝায়? চাকরিতে যোগদান পত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.৮ ও ১২.৫.৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী যান্ত্রিক হিসাবে যোগদানের জন্য একটি যোগদান পত্র রচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১০ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। (ক) চাকরির আবেদনপত্র বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(খ) চাকরির আবেদনপত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২। সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ সুপারভাইজার আবশ্যক। সত্বর আবেদন করুন-বক্স নং-২৫৭৫, বাংলাদেশ অবজারভার, মতিঝিল, ঢাকা।"- উক্ত বিজ্ঞপ্তির উত্তরে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-২০১১]

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য একটি আবেদন পত্র রচনা কর। [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪। একটি প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন পত্র লেখ। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪]

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বিদ্যুৎ বিভাগের কাঁচামাল পত্রের একটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৬। বিদ্যুৎ/ টেলিফোন/পানি ও গ্যাসের ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৭। শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি দ্রব্য ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহের নিমিত্তে একটি 'টেন্ডার নোটিশ' প্রস্তুত কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৮। তোমার ইনস্টিটিউটের প্রকৌশল বিভাগে কাঁচামালপত্র সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক অধ্যক্ষের পক্ষ হতে একটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। নিম্নমানের মালামাল প্রেরণের জন্য অভিযোগ করে পরিবেশকের নিকট একটি পত্র লেখ। [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২০। সরবরাহকৃত মালামাল নমুনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের। এই মালামাল ফেরত নিয়ে নমুনামাফিক মাল প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একখানি অভিযোগ পত্র রচনা কর।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২১। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মানের মালামাল সময়মত না পাঠানোর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ঠিকাদারের নিকট একটি অভিযোগ পত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** ১২.৫.১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।



পলিটেকনিকের সকল বই ডাওনলোড করতে
ভিজিটঃ
www.BDeBooks.Com/polytechnic

# সুপার সাজেশনস্

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। কারবার কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩(T)]
অথবা, কারবারের সংজ্ঞা দাও।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
অথবা, ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ১১, ১২]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। কারবার কী কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। কারবারের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেগুলো কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। কারবার সংগঠন কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪(T)]
অথবা, কারবার সংগঠন বলতে কী বুঝায়?
অথবা, কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। উদ্যোক্তার কাজ কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। উৎপাদন কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। বিক্রয় কাকে বলে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। কারবারে গুদামজাতকরণের কাজ কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১। মালিকানার ভিত্তিতে কারবার সংগঠনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ১৩(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। অধ্যাপক হেনির মতে ব্যবসায় সংগঠন কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। কারবারি জোট কী? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। এক মালিকানা কারবার কাকে বলে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। এক মালিকানা কারবারের গঠন কীরূপ? [বাকাশিবো-২০০০, ০৬]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। এক মালিকানা কারবারে মূলধন কে সরবরাহ করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। "এক মালিকানা কারবারের দায় অসীম"– এ কথাটির অর্থ কী? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। এক মালিকানা কারবারের পৃথক কোন সত্তা আছে কী? [বাকাশিবো-২০০৮]
অথবা, একমালিকানা কারবারের পৃথক সত্তা নেই কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। এক মালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব কী রকম? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২১। অংশীদারি কারবার কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কী? [বাকাশিবো-২০০৩, ১২]
অথবা, অংশীদারি কারবার কী ভিত্তিতে গড়ে ওঠে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা কতজন হতে পারে? [বাকাশিবো-২০১২, ১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। অংশীদারি কারবারের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা কী? [বাকাশিবো-২০০৪, ১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। অংশীদারি কারবারের মুনাফা কীভাবে বণ্টিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৭। বাংলাদেশে অংশীদারি কারবার কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৮। যৌথ মূলধনী কারবার কী? [বাকাশিবো-২০০৫]
অথবা, যৌথমূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৯। যৌথ মূলধনী কারবারের সদস্য সংখ্যা কতজন হতে পারে? [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩০। যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক কে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩১। যৌথ মূলধনী কারবার কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩২। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কী? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ০৯]
অথবা, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৩। পাবলিক লিঃ কোং বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ১০, ১৩]
অথবা, পাবলিক লিঃ কোং এর সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৪। কোম্পানির গঠনতন্ত্র কাকে বলা হয়? [বাকাশিবো-২০০১, ২০০৩, ২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৫। সংঘ-বিধি কী? [বাকাশিবো-২০০৩]
অথবা, পরিমেল নিয়মাবলি কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৬। সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৬]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৭। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ কোন্ আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৮। সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮]
অথবা, সমবায় সমিতি কী লক্ষ্যে গড়ে ওঠে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৯। উৎপাদক সমবায় সমিতি কী? [বাকাশিবো-২০১০]
অথবা, উৎপাদক সমবায় সমিতি কাকে বলে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪০। ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪১। যৌথ মূলধনী কারবারে লিঃ শব্দটি দিয়ে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৬]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪২। নামে মাত্র অংশীদার কাকে বলা হয়? [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৩। শেয়ার বাজার কী? [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৪। শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৫। যৌথ মূলধনী কারবারে একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি স্থাপিত হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৬। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কী? [বাকাশিবো-২০০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৭। নিষ্ক্রিয় অংশীদার কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৮। বোনাস শেয়ার কী? [বাকাশিবো-২০০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৯। শেয়ার কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১০, ১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫০। "ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ" কত সালে কোথায় যাত্রা শুরু করে? [বাকাশিবো-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫১। ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০০৪, ২০১৩]
অথবা, ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০১০]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫২। ব্যাংকের প্রধান কাজ কী? [বাকাশিবো-২০১৩(১)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪(T)]
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৫। গ্রামীণ ব্যাংক কী? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৬। আন্তর্জাতিক ব্যাংক কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৭। ব্যাংক হিসাব কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৮। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত কয় প্রকার হিসাব সংরক্ষণ করে ও কী কী? [বাকাশিবো-২০০৫]
অথবা, হিসাব কত প্রকার ও কী কী? [বাকাশিবো-২০০২, ০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৯। চলতি হিসাব কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬০। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কয়টি ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬১। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কত সালে এ ব্যাংকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬২। গ্রুপ ব্যাংকিং কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৩। ব্যাংক ওভারড্রাফট বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৪। ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? [বাকাশিবো-২০০২, ০৫, ১০, পরি-১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৫। হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী?
অথবা, হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৬। চেক কী? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৭। ব্যাংক নোট কী? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৮। চেক প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৯। বাহক চেক কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭০। ফাঁকা চেক কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭১। ভ্রমণকারীর চেক কী? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭২। দাগ কাটা চেক কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০০, ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৯, পরি-২০১২, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৩। দাগ কাটা চেক কয় প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস

৭৪। প্রত্যয়পত্র কী? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১০, পরি-২০১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৫। চেকের অমর্যাদা কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৬। বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৭। বিনিময় বিল কী? [বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৮। বিনিময় বিলে কয়টা পক্ষ থাকে ও কী কী? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৯। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১৩(T)]
অথবা, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮০। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮১। বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-১০, ১২, ১৪(T)]
অথবা, বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮২। আমদানি বাণিজ্য কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৩। রপ্তানি ব্যবসায় কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৪। পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৬, ০৮, ০৯, ১৩]
অথবা, পুনঃরপ্তানী বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৫। সঠিক মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৬। পণ্যের স্থানগত উপযোগ কীসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৭। সঠিক সময়ে পণ্য ক্রয় করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৮। নিলামে ক্রয়নীতি কী? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৯। ফটকা ক্রয়নীতি কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯০। বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্য কী? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯১। ফড়িয়া কাদের বলা হয়? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯২। পাইকারি ব্যবসা বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৩। ইংরেজি Communication শব্দটি কোন্ দেশিয় শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৪। যোগাযোগ কী?
অথবা, যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০১৩]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৫। কীভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৬। যোগাযোগ কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে? [বাকাশিবো-২০১৩(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৭। যোগাযোগকারী বলতে কী বুঝায়?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৮। বাণিজ্যিক যোগাযোগে কয়টি পক্ষ থাকে উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০১২]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৯। যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০০। এনকোডিং (Encoding) কী? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৪]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০১। ডিকোডিং কী? [বাকাশিবো-২০০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০২। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১৪, ১৪(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৩। ব্যবসায়ের যোগাযোগের কার্যাবলি বলতে কী বুঝ? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৪। প্রত্যুত্তর/ফলাবর্তন কাকে বলে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৫। সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ কার্যসম্পাদনের জন্য কী কী মৌলিক পদক্ষেপ বা উপাদান থাকা প্রয়োজন? [বাকাশিবো-২০০৬]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান কয়টি ও কী কী? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৭। বাণিজ্যিক যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে? [বাকাশিবো-২০০৮, ১৩(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৮। যোগাযোগ মডেল কী? [বাকাশিবো-২০০৬, ১০, পরি-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৯। যোগাযোগ মডেলে কী সংবাদ বা তথ্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা থাকে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১০। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী? [বাকাশিবো-২০১৩(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১১। ফলাবর্তনের ইংরেজি "Feedback" শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১২। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৮, ১২]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৩। ফলাবর্তন সাধারণত কয় ধরনের হয় এবং কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশন্স

১১৪। ফলাবর্তন কীভাবে যোগাযোগের পরিপূর্ণতা দান করে? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৫। উত্তম যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৬। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কী জানা যায়? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৭। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৮। সমান্তরাল যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৯। নিম্নগামী যোগাযোগে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কী কী বিষয় নিয়ে অধস্তনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২০। নিম্নগামী যোগাযোগে কেন কর্তৃত্ব ডিঙ্গানো যায় না? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২১। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন? [বাকাশিবো-২০০৯, ২০১৩(T), ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২২। কোন্ ধরনের যোগাযোগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়? [বাকাশিবো-২০০৬, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৩। নিম্নগামী যোগাযোগ নির্দেশ সূচক হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-২০১০, ২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৪। উল্লম্ব যোগাযোগের সংজ্ঞা লিখ? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৫। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে সংঘটিত হয়? [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৬। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৭। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগকে স্বৈরাচারী বা প্রভুত্বব্যাঞ্জক যোগাযোগ বলা হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৮। 'অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংবাদ বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব'- এ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৯। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩০। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ক্ষেত্রে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি লংঘন করতে পারে না কেন? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩১। খোলা দরজা নীতি কী? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩২। কোন ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৩। যোগাযোগ পদ্ধতি কী? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৪। শব্দগত যোগাযোগ কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৫। আক্ষরিক যোগাযোগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৬। অনাক্ষরিক যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৭। আজকাল কারবারি যোগাযোগে কোন্ পদ্ধতির ব্যবহার অধিক?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৮। লিখিত যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৯। লিখিত যোগাযোগের প্রধান প্রধান উপায়গুলো কী? [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪০। অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন যোগাযোগ পদ্ধতি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪১। লৈখিক যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪২। মৌখিক, লিখিত ও চাক্ষুস যোগাযোগ পদ্ধতি সংমিশ্রণে কোন যোগাযোগ সৃষ্টি হয়? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৩। দৃশ্যমান বা চাক্ষুস যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৪। স্পর্শ যোগাযোগ বলতে কী ঝুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৫। শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৬। শব্দগত যোগাযোগ কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৭। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৮। লিখিত যোগাযোগ বেশি গ্রহণযোগ্য কেন? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৯। যোগাযোগের উদ্দেশ্য কখন ব্যর্থ হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫০। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পূর্ণ হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫১। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার কীভাবে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫২। যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ কী? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৩। উত্তর যোগাযোগের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা কী? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৪। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৫। উত্তম যোগাযোগ বলতে কী বুঝ? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস্

১৫৬। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৭। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৮। প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৬, ২০০৭, ২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫৯। কারবার প্রতিবেদন কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬০। একটি আদর্শ প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোন্‌টি?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬১। একটি প্রতিবেদনের মূল অংশে কী কী থাকে? [বাকাশিবো-২০০৭, পরি-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬২। কারিগরি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৩। ফরম রিপোর্ট কিভাবে তৈরি করা উচিত? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৪। টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্ট কে প্রণয়ন করতে পারে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৫। টেকনিক্যাল বা কারিগরি রিপোর্টের তথ্য কোথা হতে সংগ্রহ করতে হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৬। স্মারক রিপোর্ট কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১০(R), ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৭। স্মারক রিপোর্টের বিশেষত্ব কী? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৮। স্মারক রিপোর্ট কেন লেখা হয়? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬৯। প্রতিবেদন কখন পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হয়? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭০। রুটিন প্রতিবেদন কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭১। অফিস কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭২। অফিস কার্যের প্রকৃতিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৩। আধুনিক অফিসের কার্যাবলিকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৪। নথিবদ্ধকরণ কী? [বাকাশিবো-২০০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৪(T)]

অথবা, নথীকরণ কী?

অথবা, নথিবদ্ধকরণ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৫। সূচিকরণ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৬। সাধারণ সূচি কয় প্রকার হয় এবং কী কী?
অথবা, সূচিকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৭। বর্ণানুক্রমিক সূচি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৮। ডেমি অফিসিয়াল পত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭৯। নথিবদ্ধকরণের ৪টি আধুনিক পদ্ধতি লিখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮০। বাণিজ্যিক পত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮১। ব্যক্তিগত পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮২। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৩। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কী? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৪। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কী? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৫। সাক্ষাৎকার পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৬। নিয়োগ পত্র কী? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৭। চাকরিতে যোগদান পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৮। চাকরির আবেদনপত্র কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮৯। টেন্ডার নোটিশ কী? [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১৩ পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯০। অভিযোগ বাক্স কী? [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১০(R), ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯১। ফরমায়েশ পত্র কী? [বাকাশিবো-২০১০ (R), ১১, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯২। ডেমি অফিসিয়াল পত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯৩। সামাজিক পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯৪। একটি টেন্ডার নোটিশে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয়? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯৫। অভিযোগ পত্র বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশন্স

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। কারবারের সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ১৩, ১৪(T)]

অথবা, কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে লেখ। [বাকাশিবো-২০০৯, ১১, ১২]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। কারবার সংগঠন বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। কারবার সংগঠনের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০১১, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। কারবার সংগঠনকে একটি সামাজিক আন্দোলন বলা হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। কারবার সংগঠনের মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। এক মালিকানা কারবার বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। এক মালিকানা কারবার কীভাবে গঠিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৬, ২০০৭]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। এক মালিকানা কারবারের প্রধান অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১। অংশীদারি কারবার বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

অথবা, অংশীদারি কারবার কাকে বলা হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। অংশীদারি কারবার কীভাবে গঠিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। অংশীদারি চুক্তিপত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭]

অথবা, অংশীদারি কারবারের চুক্তিনামা কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৩, ২০১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। যৌথ মূলধনী কারবারের কৃত্রিম সত্ত্বা কী? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮]

অথবা, যৌথ মূলধনী কারবারের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে “সসীম দায়” বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রাইভেট লিঃ কোং এবং পাবলিক লিঃ কোং বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৭]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। যৌথ মূলধনী কারবারের ২টি সুবিধা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। যৌথ মূলধনী কারবার কীভাবে গঠিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১১]
অথবা, যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি লেখ।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ-স্মারক কী?
অথবা, পরিমেল বন্ধ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৯, ১০]
অথবা, যৌথমূলধনী কারবারের স্মারকলিপি বলতে কী বুঝায়?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২১। বিবরণপত্র কী? [বাকাশিবো-২০০৭]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। সমবায় সমিতির মূলনীতি বা আদর্শসমূহ কী কী? বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ১০]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। আধুনিক যুগেও একমালিকানা কারবার এত জনপ্রিয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"– বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪(T)]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। শেয়ার বাজারে সদস্যপদ লাভের পদ্ধতি কী? [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৭। শেয়ার লেনদেনের ডাক পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৮। অংশীদারি কারবার ও যৌথ মূলধনী কারবারের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৯। শেয়ার বাজারের গুরুত্ব আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১০]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩০। শেয়ার ও ঋণপত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও। [বাকাশিবো-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩১। উৎপাদক সমবায় সমিতি ও ভোক্তা সমবায় সমিতির মাঝে পার্থক্য লেখ। [বাকাশিবো-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩২। অংশীদারি কারবারের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৩। শেয়ার বাজারের ৪টি উদ্দেশ্য লেখ। [বাকাশিবো-২০১১]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৪। ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ১০]
অথবা, ব্যাংক কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৮]
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৫। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৬। ব্যাংকের গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৭। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? [বাকাশিবো-২০১০, ১২, ১৪(T)]
অথবা, বাণিজ্যিক বাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস্

৩৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, পরি-১১(R), ১২, পরি-১২, ১৩, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৯। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪০। সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪১। ডিপোজিট পেনশন স্কীম কী? [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪২। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯]
অথবা, গ্রামীণ ব্যাংক কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৩। দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা কী? [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৪। বাসি চেক কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৫। প্রত্যয়পত্র বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, পরি-১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৬। প্রত্যয়পত্রের গুরুত্ব লিখ। [বাকাশিবো-২০০৪, ১১, ১৩]
অথবা, প্রত্যয়পত্র কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৭। দাগকাটা চেক নমুনাসহ বুঝিয়ে দাও। [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৭, পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৮। পাঁচটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৯। এটিএম (ATM) বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫০। ক্রেডিট (Credit) কার্ড বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫১। অন-লাইন (On-line) ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫২। বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৩। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৪। বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৫। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৬। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৭। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী?
অথবা, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৮। পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-২০১০, ২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৯। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬০। আমদানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়?
অথবা, আমদানি বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬১। রপ্তানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬২। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কী? [বাকাশিবো-২০০৯, ১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৩। মুক্ত বাণিজ্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৫। প্রত্যয়পত্র কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে। [বাকাশিবো-২০০৫, ১৩]
অথবা, প্রত্যয়ন পত্রের গুরুত্ব লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৬। বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪টি সুবিধা লিখ। [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৭। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৬, ০৯, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৮। পাইকারি ব্যবসায়ের কার্যাবলি উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৯। খুচরা ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭০। পণ্য ক্রয়ের পঞ্চ 'R' নীতিগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭১। ক্রয় বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭২। যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৩। কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, পরি-২০১০, ০৯, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৪। যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে? [বাকাশিবো-২০০৮, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে যোগাযোগ কী ভূমিকা পালন করে? [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশন্স

৭৬। বাণিজ্যিক যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৭। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপ কী কী? [বাকাশিবো-২০০১, ০৫, ০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৮। যোগাযোগ মডেল কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৯। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৫]
অথবা, যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী? [বাকাশিবো-২০১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮০। ফলাবর্তন (Feedback) বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০১, ০৪, ০৫, ০৭, পরি-২০১০, ১১]
অথবা, ফলাবর্তন কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮১। চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দেখাও। [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮২। কার্যকর ফলাবর্তনের উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ কী? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৩। যোগাযোগের আধুনিক মডেলটির চিত্র দেখাও। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৪। নিম্নগামী যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৫। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৬। সমান্তরাল যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৭, পরি-১০, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৭। দ্বি-মুখী যোগাযোগ কী? [বাকাশিবো-২০০৭, পরি-২০১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৮। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়-এর কারণ কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৯। দ্বি-মুখী যোগাযোগ পৃথক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়-কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯০। অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়ে থাকে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯১। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৫, ২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯২। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৩। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে তথ্যের বিকৃতি বা গুজবের জন্ম দেয়? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৪। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৫। দ্বি-মুখী যোগাযোগের পাঁচটি সুবিধা লেখ। [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৬। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ পদ্ধতিগুলো কী? [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৭। লম্বিক যোগাযোগ এবং সমান্তরাল যোগাযোগ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৮। আজকাল অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন? [বাকাশিবো-২০০৫, ১১, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯৯। আজকাল দ্বি-মুখী যোগাযোগের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন? [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০০। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধাগুলো লেখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০১। মৌখিক যোগাযোগের উপায়গুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, পরি-১০, ১১, ১২, ১৪]
অথবা, মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০২। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৩। নীরবতা কী যোগাযোগ হতে পারে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৪। লিখিত যোগাযোগের তিনটি সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৫। লিখিত যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৬। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম বা কৌশলগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৭। উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি কী? [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৩(T) ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৮। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০৯। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে প্রধানত কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১০। যোগাযোগের সাংগঠনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো কী? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১১। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো কী? বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১২। লালফিতার দৌরাত্ম্য কী? [বাকাশিবো-২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৩। উত্তম যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ অপরিহার্য– ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৪। যোগাযোগের ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৫। যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানের কী অসুবিধা হয়? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপগুলো কী কী? [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস্

১১৭। যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো লেখ। [বাকাশিবো-২০১০, ১১, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৮। প্রতিবেদন কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১৯। প্রতিবেদনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১১, ২০১৩(T)]
অথবা, প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২০। প্রতিবেদন প্রস্তুতে লেখক কাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২১। 'মুখবন্ধ' ও 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৬, পরি-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২২। গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কারিগরি রিপোর্টের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [বাকাশিবো-২০১১, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৩। সময়ের দিক থেকে টেকনিক্যাল রিপোর্ট কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৪। প্রাথমিক রিপোর্ট কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৫। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট কী? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৬। টেকনিক্যাল রিপোর্টের স্টাইল কত প্রকার ও কী কী? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৭। স্মারক রিপোর্ট কী? [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৮। চূড়ান্ত রিপোর্ট কখন লেখা হয়? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২৯। উত্তম প্রতিবেদনের অত্যাবশ্যকীয় চারটি গুণাবলি লেখ। [বাকাশিবো-২০১২(R)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩০। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩১। স্মারক রিপোর্ট ও পত্র রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩২। টেকনিক্যাল রিপোর্টের কার্যকালগত শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৩। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে কী কী বিষয় উল্লেখ করা হয়? [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৪। অফিস বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৫। অফিস কার্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৬। অফিসকে একটি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৭। একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো কী? [বাকাশিবো-২০১২, ২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৮। নথিকরণ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩৯। সূচিকরণ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪, ২০১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪০। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪১। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলো কী? [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, পরি-২০১০, ১৩, ১৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪২। বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনাম কাকে বলে? [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৩। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বিন্যাসের পদ্ধতিগুলো কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৪। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৫। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৬। নিয়োগপত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৭। একটি নিয়োগপত্রে সাধারণত কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে? [বাকাশিবো-২০১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৮। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা টেন্ডার বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪৯। আনুষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫০। ব্যক্তিগত পত্র এবং বাণিজ্যিক পত্রের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫১। একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী? [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। কারবারের সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। কারবার বলতে কী বুঝ? কারবারের মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। কারবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। আধুনিক অর্থনীতিতে কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। কারবার সংগঠন কাকে বলে? কারবার সংগঠনের কার্যাবলি আলোচনা কর। [বাকাশিবো ২০১০, ১১, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। এক মালিকানা কারবার কাকে বলে? এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১১, ১২]

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস্

৭। এক মালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১২R]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা দাও। অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ২০০৭]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। অংশীদারি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও। এ কারবারের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১১। বিভিন্ন প্রকার যৌথ মূলধনী কারবারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ১০, ১১, ১২(R)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। যৌথ মূলধনী কারবারের সংঘ স্মারক কী? স্মারকলিপির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। যৌথমূলধনী কারবার কাকে বলে? যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো- ২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৭, ০৮, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। সমবায় সমিতির সংজ্ঞা দাও। সমবায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। সমবায় সমিতির গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর। সমবায় সমিতির মূল নীতিগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ১১]
অথবা, সমবায়ের মৌলিক নীতি ও আর্দশগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। উৎপাদক সমবায় সমিতি কাকে বলে? বাংলাদেশে উৎপাদক সমবায় সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। ভোক্তা সমবায় সমিতি কী? বাংলাদেশে ভোক্তা সমবায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ২০০৬, ২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২১। ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ব্যাংক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ১০, ১১]
অথবা, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর। [বাকামিবো-২০০৯, ১৩, ১৪(T)]
অথবা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে শিল্প ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৭। সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে? বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয়ী হিসাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৮। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০০৪, পরি-১০, ১৩(T)]
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৯। হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে কী বুঝায়? হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩০। বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩১। চেক বলতে কী বুঝ? চেকের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩২। পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ২০০৫, ২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৩। পাইকারী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পার্থক্য দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৫। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৬। বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝ? বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৭। বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৮। যোগাযোগের কার্যাবলি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫, ২০০৯, পরি-২০১০, ২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩৯। যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও। যোগাযোগের আওতা নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ২০০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪০। ব্যবসায়িক বা কারবার যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো চিত্রের সাহায্যে দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪২। কারবার যোগাযোগ কী? কারবার যোগাযোগের অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০১৩]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৩। কারবার যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১৩(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৪। ফলাবর্তনের সংজ্ঞা দাও। তুমি কী মনে কর সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য?
অথবা, "পরিপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য – ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৫। ফলাবর্তন কী? চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৬। কার্যকর ফলাবর্তনের নীতিমালা আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৭। যোগাযোগ কী কী ধরনের হতে পারে? বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১০, ০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৮। চিত্রের সাহায্যে যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১২]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪৯। দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫০। নিম্নগামী যোগাযোগ ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৫, পরি-১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫১। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে? আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫২। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৩। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৪। 'অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ তথ্যের গুজব, অসত্য ও বিকৃতি ছড়ায়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ০৯]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামুলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৫। যোগাযোগ পদ্ধতি কাকে বলে? যোগাযোগ পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৬। মৌখিক যোগাযোগ কাকে বলে? মৌখিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৭। মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৮। লিখিত যোগাযোগের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ১০, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫৯। মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১৩, ১৩(T), ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬০। মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে অধিক গ্রহণীয় বলে মনে কর এবং কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬১। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্তসমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, ১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬২। সার্থক যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৫]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৩। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য গুণাবলি বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৪। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্ধারণ কর। [বাকাশিবো-২০০৬

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৫। ফলপ্রসূ যোগাযোগের বাধাসমূহ আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৬। উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের উপায়সমূহ লিখ। [বাকাশিবো-২০০৬, ২০০৭, পরি-২০১:

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৭। প্রতিবেদনের সংজ্ঞা দাও। একটি উত্তম প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় গুণাবলি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, ১৩(T), ১৪(

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৮। কারবার প্রতিবেদন কী? প্রতিবেদন প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬৯। একটি রিপোর্টের প্রধান প্রধান অংশসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, টেকনিক্যাল রিপোর্টের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। [বাকাশিবো-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭০। কোন একটি কারখানায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান উল্লেখপূর্বক কারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের নিকট একটি প্রতিবেদন লেখ। [বাকাশিবো-২০০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭১। কারিগরি প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭২। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও সাধারণ রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য কী? [বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৩। একটি কারিগরি প্রতিবেদন তৈরি কর। [বাকাশিবো-২০০৬]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৪। নথিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, পরি-১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৫। সূচিকরণ বলতে কী বুঝায়? সূচিকরণের পদ্ধতি আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৬। তথ্য সংরক্ষণে নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৭। নথিকরণ ও সূচিকরণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ১৪(T)]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৮। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭৯। সাক্ষাৎকার পত্র কী? সাক্ষাৎকার পত্র রচনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮০। (ক) চাকরির আবেদনপত্র বলতে কী বুঝায়?
(খ) চাকরির আবেদনপত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮১। সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ সুপারভাইজার আবশ্যক। সত্বর আবেদন করুন-বক্স নং-২৫৭৫, বাংলাদেশ অবজারভার, মতিঝিল, ঢাকা।"- উক্ত বিজ্ঞপ্তির উত্তরে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [বাকাশিবো-২০০৬, পরি-২০১১]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮২। সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য একটি আবেদন পত্র রচনা কর। [বাকাশিবো-পরি-২০১০]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৩। একটি প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন পত্র লেখ। [বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৪। শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি দ্রব্য ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহের নিমিত্তে একটি 'টেন্ডার নোটিশ' প্রস্তুত কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮৫। নিম্নমানের মালামাল প্রেরণের জন্য অভিযোগ করে পরিবেশকের নিকট একটি পত্র লেখ। [বাকাশিবো-২০০৯, ১৪]

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

********

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৮

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘন্টা | পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবার সংগঠন কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। "এক মালিকানা কারবারের দায় অসীম"- এ কথাটির অর্থ কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। নামে মাত্র অংশীদার কাকে বলা হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। সঠিক মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। গ্রামীণ ব্যাংক কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। শেয়ার বাজার কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। পণ্যের স্থানগত উপযোগ কীসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। বীমাযোগ্য স্বার্থ কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। একজন কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে কী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে?

**উত্তর সংকেত ঃ** সিলেবাস বহির্ভূত।

### খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। অংশীদারি কারবার কাকে বলা হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। আধুনিক যুগেও এক-মালিকানা কারবার এত জনপ্রিয় কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"- বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। যৌথ মূলধনী কারবারের কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। সঠিক সময়ে পণ্য ক্রয় করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। ব্যাংক কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণ দানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশের মুদ্রা বাজারের মুরুব্বি বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। বীমা চুক্তিকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তির বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। সমর্পণ মূল্য কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। পণ্য ক্রয়ের 'পঞ্চ R' নীতিগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়তাদানে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান এবং শর্তগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৮

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

## [বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]

সময় ঃ ৩ ঘন্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবারি জোট কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। এক-মালিকানা কারবারের পৃথক সত্তা নেই কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। পরিমেল নিয়ামাবলি কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। নিলামে ক্রয় নীতি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। পুনঃরপ্তানিকরণ বাণিজ্য কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। বাসি চেক কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। অক্ষমতাজনিত পেনশন কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। খুচরা ব্যবসায়ের সুবিধা কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। যৌথ মূলধনী কারবার কীভাবে গঠন করা হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। ক্রয়ের মূলনীতি বা ক্রয়ের 'পঞ্চ R' বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। শেয়ার বাজারে সদস্য পদ লাভের পদ্ধতি কী? লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। বীমাকে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৭। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। জীবন-বীমা ও নৌ-বীমার মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। শেয়ার লেন-দেনের ডাক পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)

২১। অংশীদারি কারবার ও যৌথ মূলধনী কারবারের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যাংক প্রদত্ত সেবাগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

। কারবার সংগঠনের মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলাদেশের কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘন্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

**ক–বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)**

১। কারবারের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। যৌথ-মূলধনী কারবারে একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি স্থাপিত হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। ফটকা ক্রয় নীতি কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। গ্রামীণ ব্যাংক কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। দাগকাটা চেক কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)**

১১। "চুক্তি অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি"- ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। কারবার সংগঠনকে একটি সামাজিক আন্দোলন বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশের সমবায় সমিতির ভূমিকা লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। ক্রয়ের "পঞ্চ R" নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকে প্রদত্ত সেবাগুলো সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। পরিমেল বন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ ও অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। বাংলাদেশে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। একমালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। অংশীদারি ও যৌথ-মূলধনী কারবারের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান বা শর্তগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ষষ্ঠ ও অষ্টম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবার বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। নিষ্ক্রিয় অংশীদার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। বোনাস শেয়ার কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। গ্রামীণ ব্যাংক কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। প্রত্যয় পত্র কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। শেয়ার বাজার বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্য কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। বীমাযোগ্য স্বার্থ কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

### খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"-ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। যৌথ মূলধনী কারবারের স্মারকলিপি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। ক্রয়ের 'পঞ্চ R' নীতিগুলো সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। বিনিময় বিল কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। আমদানি বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। মুক্ত বাণিজ্য কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। প্রিমিয়াম কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। আধুনিক অর্থনীতিতে কারবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। ক্রয় বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। অংশীদারি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১০

টেকনোলজি ঃ ৫ম পর্ব-সকল টেকনোলজি (২০০০ প্রবিধান)

৬ষ্ঠ পর্ব-সার্ভেয়িং (২০০৫ প্রবিধান)

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

**ক–বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)**

১। কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। বিনিময় বিল বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। উৎপাদক সমবায় সমিতি কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

৮। নামে মাত্র অংশীদার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। ফটকা ক্রয়নীতি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। শেয়ার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)**

১১। স্মারক লিপি ও পরিমেল নিয়মাবলি বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ ও অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। এক মালিকানা কারবারের জনপ্রিয়তার কারণ কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। সমবায় সমিতির মূলনীতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি" আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। ক্রয় কার্যের "পঞ্চ R" গুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। চেক কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। শেয়ার বাজারের গুরুত্ব আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। অংশীদারি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্ত বা উপাদান আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৫ম পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১১

টেকনোলজি ঃ সকল (সার্ভেয়িং, অ্যারোস্পেস ও এভিউনিক ব্যতীত)

৫ম পর্ব ঃ সার্ভেয়িং (২০০০)

৬ষ্ঠ পর্ব ঃ সার্ভেয়িং (২০০৫)

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবার সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। শেয়ার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। বিনিময় বিলের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। চেকের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কত সালে এই ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। বিনিময় বিলে কয়টা পক্ষ থাকে ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। "ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ" কত সালে কোথায় যাত্রা শুরু করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮ ফড়িয়া কাদের বলা হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। প্রত্যয় পত্র বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। বীমাযোগ্য স্বার্থ কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

## খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। শেয়ার ও ঋণপত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। ফটকা ক্রয়নীতি বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির নিয়মগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। পাইকারী ব্যবসায়ের কার্যাবলি উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। নৌ বীমার ক্ষেত্রে পেরিল কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। পরিমেল নিয়মাবলি কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। উৎপাদক সমবায় সমিতি ও ভোক্তা সমবায় সমিতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)

২১। কারবার সংগঠন কাকে বলে? সংগঠনের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। সমবায়ের মৌলিক নীতি ও আদর্শগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। বিনিময় বলতে কী বোঝায়? বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪২ ও সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বীমার সংজ্ঞা দাও বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১১

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৫২]**

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। পরিমেল নিয়মাবলি কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। একমালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব কীরূপ?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। ফট্‌কা ক্রয় কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। গ্রামীণ ব্যাংকের সংজ্ঞা লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। ফাঁকা চেক কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। অংশীদারি কারবার বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। পাইকারি ব্যবসা বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। বীমা চুক্তিতে সাধারণত কয়টি পক্ষ থাকে?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০ ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

### খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। কারবার সংগঠনের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। অংশীদারি কারবারের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৩০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রত্যয়পত্র কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যকে সহায়তা করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। শেয়ার বাজারের ৪টি উদ্দেশ্য লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ৩১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। পাইকারি ব্যবসায়ের প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪টি সুবিধা লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। বীমা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। একটি যৌথ মূলধনী কারবার কিভাবে গঠন করা যায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। যৌথ মূলধনী কারবারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। ক্রয় এর 'পঞ্চ R' নীতিগুলোর বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৮

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস কমিউনিকেশন

**[বিষয় কোড ঃ ১৫৬১]**

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪(চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। কারবার বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের সংজ্ঞা লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ফলাবর্তন (Feed back) বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। এনকোডিং বা প্রেরণযোগ্য করে সাজানো বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান কয়টি ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। বাণিজ্যিক যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। সমান্তরাল যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে তথ্যের বিকৃতি বা গুজবের জন্ম দেয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। কারিগরি প্রতিবেদনের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স্ (MIS) বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

### খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। বাণিজ্যিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধাগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামূলক ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। সাধারণ রিপোর্ট ও কারিগরি রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উৎসগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। প্রতিবেদনের বিষয় বিন্যাস বা বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। চাকুরির আবেদন পত্র রচনার বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১১ (খ) নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। স্মারক রিপোর্ট ও পত্র রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। নথিবন্ধকরণের ৪টি আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানের কী অসুবিধা হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। লিখিত যোগাযোগের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্তগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। কোন একটি কারখানায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান উল্লেখপূর্বক কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের নিব একটি প্রতিবেদন পত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

টেকনোলজি ঃ সকল

## বিষয় ঃ বিজনেস কমিউনিকেশন

## বিষয় কোড ঃ ১৫৬১

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ = ১০)

১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কী জানা যায়? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কী কী? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি লংঘন করতে পারে না কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ কী? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট কী? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। নথিকরণ কাকে বলা হয়? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। আনুষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। প্রতিবেদন কখন পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হয়? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। এনকোডিং বলতে কী বুঝায়? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

### খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক ধাপ বা উপাদানগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। কার্যকর ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। লিখিত যোগাযোগ বেশি গ্রহণযোগ্য কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রতিবেদন প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও সাধারণ রিপোর্টের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। সূচিকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)**

২১। প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। "অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অতি দ্রুত তথ্যের গুজব অসত্য ও বিকৃতি ছড়ায়"-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? চিত্রের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম বা কৌশলগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। নিচু মানের মাল প্রেরণের জন্য সরবরাহকারীর নিকট একটি অভিযোগ পত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

---

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৭ম পর্ব সমাপনী, ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক এবং ৮ম পর্ব অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১০

**টেকনোলজি ঃ ৬ষ্ঠ পর্ব/৭ম পর্ব ঃ** সকল (অ্যারোস্পেস ও এভিয়োনিক্স ব্যতীত) (২০০০ ও ২০০৫ প্রবিধান)

**৮ম পর্ব ঃ** অ্যারোস্পেস ও এভিয়োনিক্স

**বিষয় ঃ বিজনেস কমিউনিকেশন**

**বিষয় কোড ঃ ১৫৬১**

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

**ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ =১০)**

১। বাণিজ্যিক যোগাযোগ কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ফলাবর্তন কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। দ্বি-মুখী যোগাযোগ কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। ফরমায়েশ পত্র কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। নথিবদ্ধকরণ কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। বাণিজ্যিক পত্র কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। টেন্ডার নোটিশ বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। স্মারক রিপোর্ট কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। যোগাযোগের আধুনিক মডেলটির চিত্র দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। সমান্তরাল যোগাযোগ কাকে বলে? কখন সংগঠিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। নিম্নগামী যোগাযোগ প্রায়শই নির্দেশসূচক হয়"- ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। টেকনিক্যাল রিপোর্টের কার্যকালগত শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। বাণিজ্যিক পত্রের শিরোনাম অংশ কাকে বলে? পত্রের কোথায় এর অবস্থান?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)

২১। যোগাযোগ এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামূলক ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য গুণাবলি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোতে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) পদে কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। কাল্পনিক নাম ঠিকানা ব্যবহার করে মহাপরিচালক বরাবরে একখানা পত্র রচনা কর। (অবশ্যই এক পৃষ্ঠায় হবে)

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৪ নং অনুরূপ।

২৫। টেকনিক্যাল রিপোর্টের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক, ৭ম পর্ব সমাপনী ও ৮ম পর্ব অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১১

**টেকনোলজি ঃ ৬ষ্ঠ পর্ব ঃ** সকল টেকনোলজি (অ্যারোস্পেস ও এভিওনিক্স ব্যতীত) (২০০০ ও ২০০৫ প্রবিধান),

**৭ম পর্ব ঃ** সার্ভেয়িং (২০০৫ প্রবিধান) **৮ম পর্ব ঃ** অ্যারোস্পেস ও এভিওনিক্স (২০০০ ও ২০০৫ প্রবিধান)

## বিষয় ঃ বিজনেস কমিউনিকেশন

**বিষয় কোড ঃ ১৫৬১**

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-১০ × ১ =১০)

১। যোগাযোগ মডেল কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ফরমায়েশ পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। এনকোডিং (প্রেরণযোগ্য) করে সাজানো বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে তথ্যের বিকৃতি বা গুজবের জন্ম দেয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে কী কী বিষয় উল্লেখ করা হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। ফলাবর্তন কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। মৌখিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম বা কৌশলগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। নিম্নগামী যোগাযোগ নির্দেশসূচক হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। মুখবন্ধ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। কারবার যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## খ-বিভাগ (মান-১০ × ২ = ২০)

১১। যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। একটি টেন্ডার নোটিশে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। 'পরিপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য'- ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। চাকরির আবেদনপত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১১ (খ) নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। নথিবদ্ধকরণের ৪টি আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। তথ্য ও উপাত্তের মাঝে পার্থক্য কী?

**উত্তর সংকেত** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। প্রতিবেদনের প্রধান অংশগুলোর নাম লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। আজকাল কেন অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। লম্বিক ও সমান্তরাল যোগাযোগ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## গ-বিভাগ (মান-৪ × ৫ = ২০)

২১। উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর রচনামূলক ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী টেকনিক্যাল রিপোর্টের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি আধুনিক মডেল প্রস্তুত করে দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। লিখিত যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। কোনো একটি কারখানায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান উল্লেখপূর্বক কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের নিকট একটি প্রতিবেদন লিখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

## ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১২

**টেকনোলজি ঃ** আর্কিটেকচার, সিভিল, সিভিল (উড), আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল, মাইন অ্যান্ড মাইন সার্ভে, টেলিকমিউনিকেশন, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, সিরামিক, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপবিল্ডিং, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল (২০১০ প্রবিধান)।

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন

**( বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১)**

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান-৮০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান-২ × ১০ = ২০)

১। কারবার কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। বাণিজ্যিক যোগাযোগের কয়টি পক্ষ থাকে, উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। কোন ধরনের যোগাযোগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। কারিগরি রিপোর্ট কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## খ-বিভাগ (মান—৩ × ১০ = ৩০)

১১। কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"– ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। বাণিজ্যিক বাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। দ্বি-মুখী যোগাযোগের পাঁচটি সুবিধা লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

## গ-বিভাগ (মান—৬ × ৫ = ৩০)

২১। এক মালিকানা কারবার কাকে বলে? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। পাইকারি ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। যোগাযোগের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। চিত্রের সাহায্যে যোগাযোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। একটি প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

## ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১৩

**টেকনোলজি ঃ** ৪র্থ পর্ব ঃ আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, আর.এ.সি. সিরামিক, সার্ভেয়িং মেরিন, শিপবিল্ডিং, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্ট, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং ও গ্রাফিক ডিজাইন (২০১০ প্রবিধান)।

**৫ম পর্ব ঃ** গ্লাস, অ্যারোস্পেস, এভিওনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, মেকাট্রনিক (২০১০ প্রবিধান)।

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন

**( বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১)**

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান-৮০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

### ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। কারবার সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। দাগ কাটা চেক কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। ফরমায়েশ পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। টেন্ডার নোটিশ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। সমান্তরাল যোগাযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। নথিকরণ কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)**

১১। কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি– ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রত্যয়ন পত্রের গুরুত্ব লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে যোগাযোগ কী ভূমিকা পালন করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কারিগরি রিপোর্টের শ্রেণিবিভাগ কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। চিত্রের সাহায্যে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া দেখাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। আজকাল কেন অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)**

২১। যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। একটি প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট টেকনোলজি ও গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি
৬ষ্ঠ পর্ব (২০১০ প্রবিধান) নিয়মিত সমাপনী পরীক্ষা-২০১৩

## বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন

**(বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১)**

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান-৮০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

**ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)**

১। কারবার কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। মালিকানা ভিত্তিতে কারবার সংগঠনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। অংশীদারি কারবারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কয়জন?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যাংকের প্রধান কাজ কী? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। যোগাযোগ কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে? **উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। লিখিত যোগাযোগের প্রধান প্রধান উপায়গুলো কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। অফিস কাজের প্রকৃতিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান—৩ × ১০ = ৩০)**

১১। কারবার সংগঠনের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ কর।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। 'চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি– ব্যাখ্যা কর।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। পাইকারি ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৪ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। উত্তম যোগাযোগের আবশ্যকীয় শর্তাবলি কী কী?
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রতিবেদনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। একটি নিয়োগপত্রে সাধারণত কী কী বিষয় উল্লেখ থাকে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)**

২১। কারবার সংগঠনের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের বর্ণনা দাও।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৪ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। কারবার যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। একটি উত্তম প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় গুণাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

---

## বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট টেকনোলজি ও গার্মেন্টস্ ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি**

**৬ষ্ঠ পর্ব (২০১০ প্রবিধান) অনিয়মিত সমাপনী পরীক্ষা–২০১৪ (পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৫/০৭/১৪)**

**বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন**

**(বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১)**

**সময় ঃ ৩ ঘণ্টা** **পূর্ণমান ঃ ৮০**

**ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।**

**ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)**

১। কারবার সংগঠন কাকে বলে? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। অংশীদারি কারবারের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কতজন হওয়া প্রয়োজন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। FEED BACK বলতে কী বোঝায়? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। সমান্তরাল যোগাযোগ কাকে বলে? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। অনাক্ষরিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। কারিগরি প্রতিবেদন কাকে বলে? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। নথিকরণ কী? **উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)**

১১। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"- ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। যোগাযোগকারী কী কী মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধা লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। নথিকরণ ও সূচিকরণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর সংক্ষিপ্ত ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। কারিগরি প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রতিবেদনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। নিয়োগপত্রের সংজ্ঞাসহ এতে কী কী বিষয় উল্লেখ থাকে, লেখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)**

২১। অংশীদারি কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ২ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৩ এর রচনামূলক ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। লিখিত যোগাযোগ ও মৌখিক যোগাযোগের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর রচনামূলক ৭ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। আজকাল দ্বিমুখী যোগাযোগের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয় কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। একটি উত্তম প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় গুণাবলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং**

**৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা–২০১৪ (পরীক্ষার তারিখ ঃ ২০/০৭/১৪)**

**টেকনোলজি ঃ ৪র্থ পর্ব ঃ** আর্কিটেকচার, এআইডিটি, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড) কন্সট্রাকশন, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, মেকানিক্যাল, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, আরএসি, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, সিরামিক, গ্রাফিক ডিজাইন, মেরিন শিপবিল্ডিং ও সার্ভেয়িং (প্রবিধান-২০১০); **৫ম পর্ব ঃ** আইপিসিটি, মেকাট্রনিক, গ্লাস, এরোস্পেস ও এভিওনিক্স (প্রবিধান-২০১০); **৬ষ্ঠ পর্ব ঃ** কম্পিউটার, পাওয়ার, কম্পিউটার সায়েন্স ও ডাটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক (প্রবিধান-২০১০)

**বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন**

**(বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১)**

**সময় ঃ ৩ ঘণ্টা** **পূর্ণমান ঃ ৮০**

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

## ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কী জানা যায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর সংক্ষিপ্ত ১২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। নথিকরণ কাকে বলা হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। আনুষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২০ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৯। প্রতিবেদন কখন পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হয়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। এনকোডিং বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)**

১১। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক ধাপ বা উপাদানগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর সংক্ষিপ্ত ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। কার্যকর ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৬ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। লিখিত যোগাযোগ বেশি গ্রহণযোগ্য কেন?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত ২৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৫। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৯ এর সংক্ষিপ্ত ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রতিবেদন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৭। টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও সাধারণ রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১০ এর রচনামূলক ৮ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৮। সূচিকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১১ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

১৯। একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ২৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২০। বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর সংক্ষিপ্ত ৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)**

২১। প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২২। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী, চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৫ এর রচনামূলক ৬ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৩। মৌখিক যোগাযোগের কৌশলগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৮ এর সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৪। নীচু মানের মাল প্রেরণের জন্য সরবরাহকারীর নিকট একটি অভিযোগপত্র লিখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৯ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৫। ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ৭ এর সংক্ষিপ্ত ২২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

২৬। প্রধান প্রকৌশলী ডেসা বরাবর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে নিয়োগের জন্য একটি চাকরির আবেদনপত্র লিখ।

**উত্তর সংকেত ঃ** অনুশীলনী ১২ এর রচনামূলক ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

********

# বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী এবং ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১৪ **পরীক্ষার তারিখ ঃ ০১/০১/২০১৫**

**টেকনোলজি ঃ ৪র্থ পর্ব ঃ** আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, আর.এ.সি, সিরামিক, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপবিল্ডিং, ইলেকট্রো-মেডিকেল, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টিরিয়র ডিজাইন, কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং ও গ্রাফিক ডিজাইন (২০১০ প্রবিধান)

**ষষ্ঠ পর্ব ঃ** কম্পিউটার, পাওয়ার, কম্পিউটার সায়েন্স ও ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক (২০১০ প্রবিধান)

**৫ম পর্ব ঃ** গ্লাস, এরোস্পেস, এভিয়োনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল ও মেকাট্রনিক (২০১০ প্রবিধান)

**বিষয় ঃ বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন**

**বিষয় কোড ঃ ৫৮৪১**

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৮০

ক ও খ-বিভাগের **সকল** প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

## ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। অধ্যাপক হেনির মতে ব্যবসায় সংগঠন কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১নং দ্রষ্টব্য।

২। আচরণে অনুমিত অংশীদার বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর** কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও কথাবার্তা ও আচরণের দ্বারা নিজেকে অংশীদার হিসেবে পরিচিতি দিলে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।

৩। লম্বিক যোগাযোগ কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯নং দ্রষ্টব্য।

৪। নিয়োগপত্র কাকে বলে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২নং দ্রষ্টব্য।

৫। পণ্যের ট্রেড মার্ক কী?

**উত্তর** পণ্যের উপর মালিকের একচ্ছত্র অধিকার নির্দেশক চিহ্ন।

৬। হুন্ডি বাট্টাকরণ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪০নং দ্রষ্টব্য।

৭। একজন নাবালককে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১নং দ্রষ্টব্য।

৮। উপাত্ত কাকে বলে?

**উত্তর** অনুসন্ধান কার্যের মাধ্যমে গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত যা কিছু সংগ্রহ করা হয়।

৯। L.C বা Letter of credit বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯নং দ্রষ্টব্য।

১০। বার্তা গ্রাহকের নিকট হতে অনেক সময় কেন প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫নং দ্রষ্টব্য।

## খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১। শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ এর শেয়ার অংশ দ্রষ্টব্য।

২। চেক ও বিনিময় বিলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ ও ৪২নং দ্রষ্টব্য।

১৩। নীরবতা কি যোগাযোগ হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫নং দ্রষ্টব্য।

১৪। নথিকরণের চারটি সনাতন পদ্ধতির নাম লেখ।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১১ এর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ৫নং দ্রষ্টব্য।

১৫। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করে?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬নং দ্রষ্টব্য।

১৬। কারবার সংগঠনের মৌলিক নীতিগুলো কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮নং দ্রষ্টব্য।

১৭। বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮নং দ্রষ্টব্য।

১৮। "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি"—ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২নং দ্রষ্টব্য।

১৯। চেক কয় প্রকার ও কী কী?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯নং দ্রষ্টব্য।

২০। টেন্ডার কাকে বলে? কী কারণে টেন্ডার আহ্বান করা হয়?

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯নং দ্রষ্টব্য।

**গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)**

২১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

**উত্তর সংকেত** ৩.৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ৪নং দ্রষ্টব্য।

২৩। কারিগরি প্রতিবেদনের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ৮নং দ্রষ্টব্য।

২৫। বর্তমান কারবারি জগতে বৃহদায়তন কারবারের পাশাপাশি এক-মালিকানা কারবার টিকে থাকার কারণগুলো আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১নং দ্রষ্টব্য।

২৬। তোমার ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার বিভাগে কাঁচামালপত্র সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উল্লেখ করে অধ্যক্ষের পক্ষ হতে একটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন কর।

**উত্তর সংকেত** অনুশীলনী-১২ এর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ১৮নং দ্রষ্টব্য।

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com